ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নানা বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার ইতিহাস

তারাপদ লাহিড়ী

প্রথম প্রকাশ

২৩শে জানুয়ারী ১৯৮৩

প্রচ্ছদ

প্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক

স্বরাজ মিত্র

প্রত্যয়

২৪/১, গ্রীক রো

কলিকাতা-৭০০ ০১৪

মুদ্রক

প্রত্যয়

২৪/১, গ্রীক রো

কলিকাতা-৭০০ ০১৪

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নানা বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার ইতিহাস

সূচী

প্রথম পর্যায়

(১৯০৮—১৯১৮)

পৃষ্ঠা

সূচী

দ্বিতীয় পর্য্যায়

(১৯২৩—১৯৩৫)

পৃষ্ঠা

উৎসর্গ

স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ও
নিপীড়িত মানুষের শৃঙ্খলমুক্তির সংগ্রামে
যাঁরা সুখ, স্বাস্থ্য, সম্মান ও জীবন
বিসর্জন দিয়েছেন
দুঃসহ ক্লেশ ও লাঞ্ছনা হাসিমুখে বরণ করেছেন
প্রাজ্ঞতাগর্বী মূঢ়জনের—
অবজ্ঞা, অপবাদ ও নির্মম উপহাস
পরমক্ষমায় তুচ্ছ করেছেন
সেই সব জ্ঞাত ও অজ্ঞাত, জীবিত ও প্রয়াত
মহাপ্রাণগণের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বরূপে
এই পুস্তক উৎসর্গীকৃত হল।

—তারাপদ লাহিড়ী

ভূমিকা

ভারতবর্ষের শতাব্দীব্যাপী স্বাধীনতা-সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী বীরযোদ্ধৃবর্গের অসমসাহসিক কর্মধারা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক সুবর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছে। স্বাধীন ভারতের শাসকমণ্ডলী এই অধ্যায়কে সমুচিত মর্য্যাদা দান করেন নি এবং এই ইতিহাস সংগ্রহ ও সংরক্ষণের দিকে কোন সরকারী উদ্যোগ নিয়োজিত হয় নি। বে-সরকারী পর্যায়ে কিছু কিছু কাজ হয়েছে। সেগুলি পর্যাপ্ত নয় এবং অনেক ক্ষেত্রে অনেক ভ্রান্ত তথ্য ও অপ্রকৃত এবং কল্পিত কাহিনী এই সব রচনার মধ্যে স্থান লাভ করেছে। অনেক ক্ষেত্রেই এই সকল রচনা একদেশদর্শী এবং টুক্‌রো টুক্‌রো জীবনী বা ঘটনার বিবৃতি। সাবিক ও ধারাবাহিক ইতিহাস খুব কমই লিখিত হয়েছে। অনুশীলন সমিতির প্রাক্তন সভ্যদের উদ্যোগে কিছুদিন আগে Freedom Struggle and Anushilan Samiti নামে একখানি প্রামাণিক ইতিহাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড এখন যন্ত্রস্থ। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা পরিচালিত Institute of Historical Studies বৈপ্লবিক সংগ্রামের একখানি প্রামাণিক ইতিহাস সঙ্কলনে মনোনিবেশ করেছেন। তাঁদের এই উদ্যোগ প্রশংসার্হ।

ভারতের সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টার অনেকাংশ বিধৃত রয়েছে নানা বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার বিবরণীর মধ্যে। আমি সংক্ষেপে এই সকল ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার ইতিহাস ও বিবরণী পাঠক সমাজের গোচরে আনতে চেষ্টা করছি।

এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই একটু ভূমিকা প্রদানের প্রয়োজন। তৎকালীন সাম্রাজ্যবাদী শাসকদল কোন্ প্রয়োজনে এবং কোন্ অভিসন্ধি মূলে ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা স্থাপনের দ্বারা বৈপ্লবিক সংগ্রাম দমনের পন্থা গ্রহণ করেন, সেটা আগে জেনে নেওয়া দরকার।

বিপ্লবীদের কর্মপন্থার প্রাথমিক স্তরের কার্য্যক্রম ছিল Sporadic violence এর মাধ্যমে দেশকে জাগানো ও অত্যাচারী শাসকবর্গকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলা। সরকারী কাগজপত্রে এই কার্য্যক্রমকেই terrorism বা "সন্ত্রাসবাদ" বলে আখ্যাত করা হয়েছে। এই কার্য্যক্রমের প্রধান অংশ ছিল অত্যাচারী শাসকদেরকে হত্যা ও রাজনৈতিক ডাকাতি। দেশব্যাপী বৈপ্লবিক সংগঠনকে চালু রাখতে, তাকে সর্বস্তরে প্রসারিত করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হ'ত। এ জন্য বিপ্লবীদেরকে বাধ্য হয়ে রাজনৈতিক ডাকাতির পথ ধরতে হয়। এ বিষয়ে প্রথমে বিপ্লবীদের মনে দ্বিধা সঙ্কোচ ছিল। ১৯০৬ সালে, ডাকাতি করা উচিত হবে কিনা এ সম্বন্ধে কর্তব্য স্থির করবার জন্য রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ীতে এক গোপন বৈঠক হয়। অনুশীলন সমিতির সভাপতি, ভারতের সশস্ত্র বিপ্লব পথের অগ্রপথিক ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র ঐ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন—শ্রীঅরবিন্দ, রাজা সুবোধ মল্লিক, বারীন ঘোষ, সমিতির সম্পাদক সতীশ বসু, ঢাকা অনুশীলন সমিতির নেতা পুলিনবিহারী দাস ও নরেন্দ্র মোহন সেন প্রমুখ। প্রমথনাথ প্রথমে ডাকাতির কার্য্যক্রম গ্রহণে সম্মত ছিলেন না। অরবিন্দ দৃঢ়ভাবে ডাকাতি-কার্যক্রম সমর্থন করেন। পরে সর্বসম্মতিক্রমে কতকগুলি সর্তাধীনে ডাকাতির কার্যক্রম অনুমোদিত হয়। সর্তগুলি ছিল : যারা অসাধু উপায়ে অর্থ অর্জন করেছে, যারা সুদখোর, অসচ্চরিত্র, অত্যাচারী শুধু এই শ্রেণীর লোকের বাড়ীতে ডাকাতি করা হবে। ডাকাতি করতে গিয়ে অকারণ নরহত্যা করা হবে না, স্ত্রীলোকের

অস্পর্শ করা চলবে না। ডাকাতি-লব্ধ অর্থের একটি পয়সা কেউ নিজের জন্য গ্রহণ করতে পারবেন না ইত্যাদি। এই সকল নিয়ম কঠোরভাবে পালন করা হ'ত। ১৯০৭ থেকে ১৯১৭ এই এগারো বছরে সারা ভারতে ডাকাতি, গুপ্তচর, সরকারী সাক্ষী, অত্যাচারী সরকারী কর্মচারীদের হত্যা বা হত্যার প্রচেষ্টা, অস্ত্রসংগ্রহ ইত্যাদি ব্যাপারে ৩৮৫টি বৈপ্লবিক Action অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে বেশীর ভাগ Action হয়েছে বঙ্গদেশে। কিন্তু সরকারের গুপ্ত ও প্রকাশ্য পুলিশ এর বারো আনা Action-এর হদিস পান নাই অথবা হদিস্ পেলেও তাদেরকে আদালতের বিচারে দণ্ডিত করবার মত প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেন নাই। সেই জন্য সরকারকে 'ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার' পথ ধরতে হ'ল। এই সব ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় অভি-যোগ থাকতো—"রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র" (Conspiracy to wage war against the king) অথবা তদুদ্দেশ্যে অস্ত্র ও লোকবল সংগ্রহ করা (ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ ও ১২১ ক ধারা)। কোন বিশেষ অপরাধে (যেমন হত্যা, ডাকাতি প্রভৃতিতে) শুধু যে ব্যক্তি ঐ কার্য্যে লিপ্ত ছিল তাকেই দণ্ডিত করা যায়। কিন্তু ষড়যন্ত্রের অভিযোগে, যারা প্রত্যক্ষতঃ ঐরূপ কার্য্যে যোগদান করে নাই অথচ তলে তলে কাজ করেছে, তাদেরকেও দণ্ডিত করা যায়। তাই সরকার প্রত্যক্ষ কর্ম সম্বন্ধে প্রমাণাদি সংগ্রহে অসমর্থ হয়ে বিপ্লব-প্রচেষ্টাকে দমন করবার জন্য 'ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার' হাতিয়ারটিকেই সবচেয়ে উপযুক্ত ও ধারালো হাতিয়ার বলে মনে করলেন।

সুতরাং একে একে ১৯০৮ থেকে ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত প্রথম এবং ১৯২৩ থেকে ১৯৩৫ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় পর্য্যায়ের বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র মোকাদ্দমাগুলির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃতি করছি।

আলিপুর ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা, ১৯০৮

১৯০৭ সালে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় একটি রাজদ্রোহকর প্রবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে পত্রিকার সম্পাদক অরবিন্দের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মোকর্দ্দমা স্থাপিত হয়। ঐ মোকর্দ্দমায় সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য অপর সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পালকে সমন করা হয়। কিন্তু বিপিনচন্দ্র সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করে আদালত অবমাননার জন্য ছয় মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কিংস্‌ফোর্ড সাহেবের আদালতে যখন ঐ মোকর্দ্দমা চলছিল তখন বালক সুশীল সেন আদালতে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করলে সেই অপরাধে কিংস্‌ফোর্ড সুশীলকে ১৫ ঘা বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করেন। বালকের উপরে ঐরূপ পৈশাচিক দণ্ডাদেশ দেওয়ার জন্য অনুশীলন সমিতি স্থির করেন জীবননাশের দ্বারা ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটের অমানুষিকতার প্রতিশোধ নিতে হবে। ইতিমধ্যে সাহেব বদলী হয়ে যান মজঃফরপুরে। সেখানে তাঁকে হত্যা করবার জন্য ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীকে প্রেরণ করা হয়—এবং তারা যাত্রা করবার সময়ে অরবিন্দ তাদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেন। ৩০শে এপ্রিল ১৯০৮, ওরা কিংস্‌ফোর্ডের গাড়ী মনে করে একখানা ঘোড়ার গাড়ীর আরোহীর উপরে বোমা ফেলে। ঐ গাড়ীতে কিংস্‌ফোর্ড ছিলেন না। আরোহী মিস্টার ও মিসেস্ কেনেডি বোমার আঘাতে নিহত হন। ১লা মে ক্ষুদিরাম ধরা পড়ে। ২রা মে ক্ষুদিরামের সহকারী প্রফুল্ল চাকী মোকামা ষ্টেশনে গ্রেপ্তারের সম্মুখীন হয়ে তার নিজের পিস্তল দিয়ে আত্মহত্যা করে। প্রচণ্ড অত্যাচারের ফলে বালক ক্ষুদিরাম একটি স্বীকারোক্তি প্রদান করে এবং সেই স্বীকারোক্তি অনুসরণ করে পুলিশ ২রা মে কলিকাতায় ৩২ নং মুরারিপুকুর রোডস্থিত ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষের *

* ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ ছিলেন অরবিন্দ ও বারীন্দ্রের পিতা।

বাগানবাড়ীসহ আটটি স্থানে খানাতল্লাসী করে। ৩২ নং মুরারী-পুকুর রোড ছাড়া আর যে সকল স্থান খানাতল্লাসী করা হয় সেগুলি হল—২৩ নং স্কট্‌স্ লেন, ৪৮ নং গ্রে-স্ট্রীট (এখানে অরবিন্দ বাস করতেন এবং 'নবশক্তি' পত্রিকার কার্য্যালয় ছিল), ৪নং, ৩০/২ নং ও ১৩৪ নং হ্যারিসন্ রোড, ৩৮/৪ নং রাজা নবকিষেণ ষ্ট্রীট ও ১৫নং গোপীমোহন দত্ত লেন। খানাতল্লাসের সাথে সাথে মুরারীপুকুরের বাগানবাড়ী থেকে বারীন্দ্রকুমার, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত ও নলিনীকান্ত গুপ্ত সহ ১৪ জন ৪৮ নং গ্রে-ষ্ট্রীট থেকে অরবিন্দ সহ তিনজন, ১৩৪ নং হ্যারিসন রোড থেকে ৫জন, রাজা নবকিষেণ স্ট্রীট থেকে হেমচন্দ্র দাস কানুনগো, গোপীমোহন দত্ত লেন থেকে কানাই-লাল দত্ত সহ দুই জন গ্রেপ্তার হন। এ'র পরে ঐ মে মাসের মধ্যেই নরেন গোঁসাই ও আরও আট জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৩৪ নং হ্যারিসন রোড থেকে পুলিশ প্রচুর পরিমাণে বোমা তৈরীর মাল মসলা ও সাজ সরঞ্জাম উদ্ধার করে। এ ছাড়া মুরারীপুকুরের বাগানবাড়ী থেকে মাটির তলায় পোঁতা কতিপয় ট্রাঙ্ক উদ্ধার করে—যার মধ্যে ৬টি তাজা বোমা, কতকগুলি বোমা তৈরীর খোল, বৈপ্লবিক পুস্তক পুস্তিকা ও চিঠিপত্র পাওয়া যায়। পুলিশ কিছু ডিনামাইট এবং একটি রিভলভারও পেয়েছিল।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আলিপুর ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা স্থাপিত হয়। ক্ষুদিরামকে এই মোকর্দ্দমায় জড়ানো হয় না। তার বিরুদ্ধে মজঃফরপুরে পৃথক মোকর্দ্দমা স্থাপিত হয়। আসামীদের মধ্যে অরবিন্দ ও বারীন্দ্র ছাড়া হুগলী জেলার বাসিন্দা ছিলেন ৪ জন, যশোহর জেলার ৪ জন, ঢাকা, নদীয়া, খুলনা, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট ও ২৪ পরগণা—এদের প্রত্যেক জেলার ৩ জন করে মেদিনীপুর ও ফরিদপুরের ২ জন করে, এবং রাজসাহী, মালদহ ও চন্দনগরের একজন করে অধিবাসী ছিলেন।

মোট ৩৭ জনকে বিচারের জন্য চালান দেওয়া হয়। আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ বীচ্‌ক্রফটের এজলাসে ১৯০৮ সালের ১৯শে অক্টোবর শুনানী শুরু হয়। ১৯০৯ এর ১৪ই এপ্রিল শুনানী শেষ হয়। দায়রা জজ রায় ঘোষণা করেন ৬ই মে। বারীন ঘোষ ও উল্লাসকর দত্ত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন, উপেন ব্যানার্জী, বিভূতি সরকার, বীরেন সেন, সুধীর সরকার, ইন্দ্রনাথ নন্দী, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য, শৈলেন বসু হেমচন্দ্র দাস কানুনগো, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল ও ইন্দুভূষণ রায়—এঁদের সাজা হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। পরেশ মৌলিক, শিশির ঘোষ ও নিরাপদ রায়—এঁদের প্রত্যেকের হয় দশ বছর করে দ্বীপান্তর দণ্ড। অশোক নন্দী, সুশীল সেন ও বালকৃষ্ণ হরিকানে—এঁদের সাজা হয় সাত বছরের দ্বীপান্তর। কৃষ্ণজীবন সান্যালের উপর এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। অরবিন্দ সহ বাকী ১৭ জনকে মুক্তি দেওয়া হয়।

হাইকোর্টের আপীলে বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে তাঁদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। হেম কানুনগো ও উপেন্দ্র ব্যানার্জীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বহাল থাকে। বিভূতি সরকার, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল— এঁদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের বদলে ১০ বছরের দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হয়। সুধীর সরকার, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য, পরেশ মৌলিক ও বীরেন সেন—এঁদের দণ্ড হ্রাস করে ৭ বছর করে দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়। শিশির ঘোষ, নিরাপদ রায় ও শৈলেন বসু এঁদেরও সাজা হ্রাস করে প্রত্যেককে ৫ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। নলিনী-কান্ত গুপ্ত সহ বাকী আট জনকে হাইকোর্ট মুক্তি দান করেন। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত ৩৭ জন আসামীর মধ্যে ১২ জন দণ্ডিত হন ও ২৫ জন খালাস পান।

সারা ভারতের মধ্যে এইটিই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা। সিডিসন কমিটির রিপোর্টে লিখিত হয়েছে

যে এই ষড়যন্ত্র কলিকাতা অনুশীলন সমিতি কর্তৃক আয়োজিত হয়েছিল। *

মহারাষ্ট্রের চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয় বৈপ্লবিক মোকর্দ্দমায় সর্বাগ্রে শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে শুধু সাধারণ হত্যার মোকর্দ্দমা করা হয়েছিল। ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার পরিকল্পনা তখনও কর্তৃপক্ষের মাথায় আসে নি।

নাসিক ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা, ১৯০৯

১৮৯৯ সাল থেকেই বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত নাসিক সহরে 'মিত্র-মেলা' বলে একটি সংগঠন ছিল। গণেশ দামোদর সাভারকর ও তাঁর ভ্রাতা বিনায়ক দামোদর সাভারকর ঐ সমিতির নেতা ছিলেন। এঁরা শিবাজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের স্বাধীনতার কথা মানুষকে শোনাতেন। ১৯০৭ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি গুপ্ত বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং পরিবর্তিত নাম দেওয়া হয় 'অভিনব ভারত সংঘ'। ছোট ভাই বিনায়ক দামোদর সাভারকর পুণার কার্ডসন কলেজে ভাল ছাত্র ছিলেন। তিনি একদল ছাত্রকে তাঁর বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানে টেনে এনেছিলেন। নাসিকের 'মিত্র-মেলা' ১৯০৭ সালে এই 'অভিনব ভারত সংঘে'র সাথে মিশে যায়। শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা

* সিডিশন কমিটি কলিকাতা অনুশীলন সমিতি ও ঢাকা অনুশীলন সমিতিকে দুটি পৃথক প্রতিষ্ঠান মনে করেছিল। প্রকৃত পক্ষে অনুশীলন সমিতি একটিই ছিল—কলিকাতায় ছিল তার কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় এবং ঢাকা অনুশীলন সমিতি ছিল তার শাখা। বারীন্দ্রকুমারের নেতৃত্বে যাঁরা immediate action এর দাবীতে dissedent group করেছিলেন তাঁরাও অনুশীলন সমিতি হিসাবেই কার্য্য করেছেন। 'যুগান্তর' বলে কোন দলের তখনও জন্ম হয় নাই।

ভারতের ভালো ছাত্রগণকে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত করবার জন্য লণ্ডনে 'ইণ্ডিয়া হাউস' নামে একটি বোর্ডিং হাউস স্থাপন করেছিলেন। ভারতবর্ষ থেকে যে সকল ছাত্র উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাতে যেতো শ্যামজী তাদের মধ্য থেকে বেছে বেছে দেশপ্রেমিক ছাত্রদের নিয়ে এসে ইণ্ডিয়া হাউসে তাদের আবাসনের স্থান করে দিতেন এবং সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের পরাধীনতা দূর করবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতেন। 'ইণ্ডিয়া হাউস' প্রকৃত পক্ষে ছিল বিপ্লবীদের দীক্ষাকেন্দ্র। শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ভারতবর্ষের লেখক, সাংবাদিক ও দেশপ্রেমিক লোকেরা যা'তে ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি ভ্রমণ করে জ্ঞানার্জন করতঃ দেশে ফিরে গিয়ে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করতে পারেন তদুদ্দেশ্যে ১০০০৲ টাকা মূল্যের ছয়টি বার্ষিক বৃত্তি দানের প্রস্তাব ঘোষণা করেন। ১৯০৬ সালের মাঝামাঝি বিনায়ক সাভারকর এরই একটি বৃত্তি নিয়ে বিলাত যাত্রা করেন ও ইণ্ডিয়া হাউসে অবস্থান করতে থাকেন। ইতোমধ্যে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গনেশ দামোদর সাভারকর ১৯০৮ সালে একখানি দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পুস্তক প্রকাশ করেন। এই সঙ্গীত পুস্তক প্রকাশের জন্য তাঁকে রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। তার বাড়ী তল্লাসী করে একখানি সাইক্লোস্টাইল করা Bomb Manual পাওয়া যায়। এটা কোনো ফরাসী বিপ্লবীর লেখা পুস্তক—হেমচন্দ্র কানুনগো যখন বোমা প্রস্তুতকরণ শিখবার জন্য ফ্রান্সে যান তখন তথায় অবস্থানকারী এস. আর. রাণাকে দিয়ে এই বই ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়ে ভারতে নিয়ে আসেন। এরই এককপি পুলিশ হস্তগত করে মুরারীপুকুরের বাগানবাড়ী তল্লাসীর সময়ে। (পরবর্তী কালে এই পুস্তকের আর একটি সাইক্লোস্টাইল করা কপি পাওয়া যায় লাহোর ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত ভাই পরমানন্দের বাড়ী তল্লাসীর সময়ে। গনেশ দামোদর সাভারকরকে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করবার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় এবং বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

লণ্ডনে ইণ্ডিয়া হাউসে অবস্থান কালে বিনায়ক সাভারকর তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এইরূপ কঠোর কারাদণ্ডের সংবাদ পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি ইণ্ডিয়া হাউসের অপর বিপ্লবী মদনলাল ধিংড়াকে নিযুক্ত করেন। ধিংড়া ১৯০৯ সালের ১লা জুলাই লণ্ডনে ভারত সচিবের এডিকং স্যার উইলিয়াম কার্জন উইলিকে হত্যা করেন। ধিংড়ার প্রাণদণ্ড হয়। তাঁকে গ্রেপ্তার করবার সময়ে তাঁর পকেট থেকে একটি লিখিত বিবৃতি পাওয়া যায়। এতে ব্রিটিশ বিরোধী বহু কথার মধ্যে এটাও লেখা ছিল—

"I attempted to shed English blood intentionally and of purpose as an humble protest against the inhuman transportations and hangings of Indian youth". বৃটিশ সরকার সন্দেহ করেন যে ঐ বিবৃতিটি বিনায়কের রচনা।

বিনায়ক ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইণ্ডিয়া হাউসের পাচক চতুর্ভুজ আমিনের মারফতে কুড়িটি ব্রাউনিং পিস্তল প্রেরণ করেন এবং তাঁর উপদেশ মত ঐ পিস্তলগুলি জি. কে. পটঙ্কর নামক এক ব্যক্তিকে ডেলিভারী দেওয়া হয়।

গণেশ সাভারকর তাঁর দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করলে হাইকোর্ট ১৯০৯ সালের ১৮ই নভেম্বর ঐ আপীল ডিস্‌মিস্ করেন। গণেশের অনুগামীরা ২২শে ডিসেম্বর তারিখে (অর্থাৎ প্রায় এক মাসের মধ্যে) নাসিকের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে হত্যা করে গনেশের প্রতি প্রদত্ত দণ্ডাদেশের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। গুলী করেন অনন্ত লক্ষণ কানাড়ে নামক এক বিপ্লবী—আর. কার্ভে এবং দেশপাণ্ডে নামক দুই জন সহকারী ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই হত্যায় ব্রাউনিং পিস্তল ব্যবহৃত হয়েছিল। তিনটি পৃথক মোকর্দ্দমা স্থাপিত হয়, একটি মোকর্দ্দমা হয় পূর্বোক্ত তিনজন বিপ্লবীর বিরুদ্ধে। তিনজনেরই ফাঁসি হয়। দ্বিতীয় মোকর্দ্দমাটি হল—নাসিক ষড়যন্ত্র

মোকর্দ্দমা। (Nasik conspiracy)। এতে ৩৭ জনের বিচার হয় স্পেসাল ট্রাইব্যুনালে। ১১ জন মুক্তি লাভ করে। অবশিষ্ট ২৬ জন সর্বোচ্চ ১৫ বছর থেকে শুরু করে বিভিন্ন মেয়াদের দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়। বিনায়ক সাভারকরকে লণ্ডন থেকে ধরে এনে পৃথক মোকর্দ্দমায় তাঁর বিচার করা হয়। বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।

নাসিক ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার পরে অভিনব ভারত সংঘ কার্য্যতঃ ভেঙ্গে যায়। ভি. ভি. এস্. আয়ার, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা) ও নিরঞ্জন পাল (বিপিন চন্দ্র পালের পুত্র) মাত্র কয়েক মাস ঐ সংঘকে কোন রকমে জীবিত রাখেন। তারপরে তাঁরা দেশত্যাগ করে বিদেশে চলে যান। বিদেশে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ও পরে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য বৈপ্লবিক কার্য্যাবলী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে।

৩ গোয়ালিয়র ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা—১৯১০

এই মোকর্দ্দমাটিকে নাসিক ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার একটি Supplementary case বলা যেতে পারে। অভিনব ভারত সংঘের অনুকরণে গোয়ালিয়র রাজ্যে 'নব ভারত সোসাইটি' নামে একটি বৈপ্লবিক সংস্থা গঠিত হয়। এই মোকর্দ্দমায় ঐ সমিতি কর্ত্তৃক কোন হিংসাত্মক কার্য অনুষ্ঠিত হওয়ার অভিযোগ ছিল না। শুধু হিংসাত্মক কার্য্যের প্রস্তুতির অভিযোগ ছিল। ঐ মোকর্দ্দমায় উক্ত সমিতির উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলীর কিছু অংশ মোকর্দ্দমার রায়ে উদ্ধৃত করা হয়। উদ্ধৃতাংশের মধ্যে ছিল ঃ—

"Now there are two ways for carrying out the advice of attaining liberty :—Education and agitation. There will be thorough consistancy between the two. Education includes swadeshi, boycott, national

education, entire abstinence from liquor, religious sermons, lectures, kathas, establishment of institutions, libraries, different occasions of pan supari (Social gathering) etc. while agitation comprises in target shooting; sword exercise, preparation of bombs, dynamite, procuring revolvers, taking gymnastic exercises, learning and teaching the use of weapons and missiles, travelling in different provinces and getting information thereof.". ১

এই মোকর্দ্দমায় ২২ জনকে অভিযুক্ত করা হয়। ২০ জন দণ্ডিত হয়। তাদের মধ্যে জি. এস. দেশাই ও টি. সি. সদাব্রত ওয়ালাকে ৭ বছর করে দীপান্তর দণ্ড দেওয়া, অন্যদের স্বল্পতর দণ্ড হয়।

৪. হাওড়া ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা—১৯১০

১২টি বিভিন্ন ডাকাতিকে একত্র করে ৩৯ জনের বিরুদ্ধে স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে এই মোকর্দ্দমার বিচার হয়। সরকার পক্ষ স্বীকার করেন বিভিন্ন ডাকাতিতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের কোন প্রমাণ নাই। সরকার পক্ষ আসামীগণকে কতকগুলি গ্রুপ্ (group) এ ভাগ করেন। ট্রাইব্যুনালের প্রধান বিচারপতি নির্দ্দেশ দেন যে ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে শুধু একটি ষড়যন্ত্রের বিচারের জন্য। এতগুলি ষড়যন্ত্র বিচারের এক্তিয়ার ট্রাইব্যুনালের নাই। এতে সরকার পক্ষ শুধু হলুদবাড়ী ডাকাতিকে কেন্দ্র করে ছয় জন আসামীর বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা চালানো স্থির করেন। সুতরাং, ৩৩ জন সরাসরি খালাস পায়। ছয় জনের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা চলে এবং তারা দণ্ডিত হয়। তবে তারা প্রত্যেকে পূর্বেই হলুদবাড়ী ডাকাতির জন্য কেউ সাত

বছর কেউ ছয় বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। সেই জন্য ট্রাইব্যুনাল ১২১/ক ধারায় কারও প্রতি দুই বছর কারও প্রতি এক বছর দণ্ডাদেশ দান করেন। এই ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমাটি যুগান্তর দলের। দণ্ডিতদের নাম—সুশীল বিশ্বাস, বিজয় চক্রবর্তী, গণেশ দাস, শৈলেন দাস ও অতুল মুখার্জী।

৫. ঢাকা ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা—১৯১০

বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইতিহাসে এই মোকর্দ্দমাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সিডিসন কমিটির রিপোর্টে সমগ্র অনুশীলন সমিতি সম্পর্কেই "ঢাকা সমিতি" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশকে 'পশ্চিমবঙ্গ' এবং 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' এই দুটি পৃথক প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। ঢাকা অনুশীলন সমিতির নেতা পুলিন-বিহারী দাসকে সমিতির সভাপতি প্রমথনাথ মিত্র সমগ্র পূর্ববঙ্গের শাখাসমিতিগুলির অধিনায়ক পদে নিযুক্ত করেন। পুলিনবাবুর অতুলনীয় কর্মদক্ষতা ও সংগঠন শক্তির প্রভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র পূর্ববঙ্গে অনুশীলন সমিতির ৫০০ শাখা ছড়িয়ে পড়ে। ১৯০৮ সালের ১৬ই ডিসেম্বর শ্রদ্ধেয় নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, সুবোধ মল্লিক প্রভৃতির সাথে অনুশীলন সমিতির পুলিনবাবু ও ভুপেশ নাগকেও ১৮১৮ সালের ৩ নং রেগু-লেশন অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পুলিনবাবুকে পাঞ্জাবের মণ্টগোমারী জেলে আটক করা হয়। এর পর প্রায় একমাসের মধ্যে পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট অন্যান্য কয়েকটি সমিতির সাথে ঢাকা অনুশীলন সমিতিকেও "বে-আইনী সংস্থা" বলে ঘোষণা প্রচার করেন। পুলিনবাবুর গ্রেপ্তারের পরেও ঢাকা সমিতির বৈপ্লবিক কার্য্যক্রম পূর্ণবেগে অগ্রসর হতে থাকে এবং পুলিশের তৎপরতাও বেড়ে যায়। ঢাকা অনুশীলন সমিতির নেতৃস্থানীয় কর্মীগণ অনেকেই কলকাতায় চলে আসেন। ঐ দিকে আলিপুর

ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার পর অনুশীলনের কলকাতা কেন্দ্রের বিশিষ্ট কর্মীরা অনেকেই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। সভাপতি প্রমথনাথ মিত্রের সতর্ক ও ধৈর্য্যশীল কর্মপন্থার প্রতি অশ্রদ্ধাবশতঃই বারীন ঘোষ আশু কোন বড় কাজ করবার দাবী নিয়ে সমিতির মধ্যে একটি বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী গড়ে তোলেন—যদিও পি. মিত্রই সভাপতি পদে আসীন থাকেন। কলকাতা কেন্দ্রর বিশিষ্ট কর্মীরা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বার ফলে প্রমথনাথ মিত্র পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্যমশীল যুবকদের উপরেই কলকাতা কেন্দ্রের ভার অর্পণ করেন। বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর লোকেরা অন্যান্য বিচ্ছিন্ন আঞ্চলিক দলগুলির সাথে মিলে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে শ্রদ্ধেয় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি ফেডারেশন গঠন করেন। এই ফেডারেশনই সরকারী কাগজ পত্রে যুগান্তর দল বলে চিহ্নিত হয়। যেহেতু ঢাকা সমিতির কর্মীদল এসে কলকাতার মূল সমিতির পরিচালনাভার গ্রহণ করেন সেই-হেতু সিডিসন কমিটির রিপোর্টে মূল অনুশীলন সমিতিকেই পুনঃ-পুনঃ ঢাকা সমিতি নামে উল্লেখ করা হয়েছে। যুগান্তর দলের কর্মধারা শুধু বঙ্গদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। অনুশীলন সমিতি ছিল সর্বভারতীয় বৈপ্লবিক সংস্থা এবং একমাত্র সর্বভারতীয় বিপ্লবী দল।

এই দলের কার্য্যাবলী ভারত সরকারকে খুবই বিচলিত করে তুলেছিল। সিডিসন কমিটির রিপোর্টে এই দল সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

"The Dacca Samiti was, throughout the whole period, the most powerful of these associations. The existence of this body alone even if there had been no other, would have constituted a public danger '......In after years it spread itself over all Bengal and extended its operations to other provinces. While its organisation was most compact

in Mymensing and Dacca, it was active from Dinajpur in the northwest to Chittagong in the southeast, and from Coochbehar in the northeast to Midnapore in the southwest. Outside Bengal we found its members working in Assam, Bihar, the Punjab, the United Provinces, the Central Provinces and Poona. [২]

১৯১০ খৃষ্টাব্দের প্রথমে পুলিনবাবু মুক্তি লাভ করে কলকাতায় প্রমথনাথ মিত্র ও অরবিন্দের সাথে সাক্ষাৎ করে ঢাকায় ফিরে আসেন।

অনুশীলন সমিতির দ্বারা যে সব বৈপ্লবিক কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, সরকার প্রায় তার ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে অপরাধীর সন্ধান লাভ করতে অসমর্থ হন। তারফলে ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার জাল বিস্তার করে বহু সংখ্যক সন্দেহভাজনকে জালবদ্ধ করে সমিতিকে উৎখাত করবেন বলে স্থির করেন। তারই ফলে খাড়া করা হয় ঢাকা ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা।

এখানেও যথারীতি অভিযোগ হয়—Conspiracy to wage war against the King (ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ ক, ১২২ ও ১২৩ ধারা) পুলিনবাবু সহ ৪৭ জনের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা দায়ের করা হয়। নিম্ন-আদালত তিন জনকে ছেড়ে দিয়ে ৪৪ জনকে দায়রায় সোপর্দ্দ করেন। মাণিক ব্যানার্জী, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ও সারদা চক্রবর্তী আত্মগোপন করেন। পুলিশ তাঁদের ধরতে পারে না। দায়রা আদালত ৩৬ জনকে দোষী সাব্যস্ত করেন। পুলিনবাবু, আশু দাশগুপ্ত ও জ্যোতির্ম্ময় রায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৩ জনকে দশ বছরের দ্বীপান্তর ও ১০ জনকে সাত বছরের দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়। বাকী কয়েকজনকে দেওয়া হয় ৫ বছরের দ্বীপান্তর। ভূপেশ নাগ সহ ১২ জন খালাস পান। একজন রাজসাক্ষী হয়েছিলেন—নাম গিরীন্দ্র দাশগুপ্ত।

দণ্ডিতদের মধ্যে ৩৫ জন আপীল করেন। আপীলেট বেঞ্চে সিনিয়র বিচারপতি ছিলেন সর্বজনমান্য আশুতোষ মুখার্জী। তিনি ২২ জনকে খালাস দেন ও ১৪ জনের সাজা যথেষ্টরূপে হ্রাস করেন। পুলিনবাবু প্রভৃতি কয়েকজনের সাজা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে ৭ বছরের দ্বীপান্তরে দাঁড়ায়, অন্যদের সাজা কমিয়ে দণ্ড দেওয়া হয় ৫, ৩ ও ২ বছরের।

ঢাকা ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল—পুলিশ তল্লাসী করে প্রচুর কাগজপত্র উদ্ধার করে, তার ফলে সমিতির নিয়মাবলী, সভ্যদের শপথ গ্রহণ পদ্ধতি, সাংগঠনিক বিধিবিধানসমূহ সমস্তই পুলিশের হস্তগত হয়। দায়রা আদালত ও হাইকোর্ট উভয়েই তাঁদের রায়েতে এই সব কাগজপত্র থেকে প্রচুর পরিমাণে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেন। রায়ে এটাও স্বীকার করা হয় যে সন্ত্রাসবাদ (terrorism) সমিতির উদ্দেশ্য ছিল না—ব্যাপক ও সশস্ত্র গণ-বিদ্রোহের জন্যই সমিতি কাজ করছিল। সমিতির কাজকর্মে গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে হাইকোর্ট মন্তব্য করেন—"The Samiti had a jealously guarded secret and every effort was made to preserve it inviolate. The secret was such that it was not even to be discussed amongst the members themselves." ৩

ঢাকা ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা যখন শুরু হয়, প্রমথনাথ মিত্র তখন গুরুতর পীড়ায় শয্যাগত। রোগশয্যা থেকেই তিনি আসামীদের ডিফেন্সের জন্য চিত্তরঞ্জন দাশকে অনুরোধ করেন এবং হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে ঢাকায় প্রেরণ করেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাঁর শেষ কথা—"Tell my dear Pulin and the Dacca boys now undergoing trial that my last thoughts are with them."

৬ নাংলা ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা—১৯০৯

নাংলা খুলনা জেলার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। ১৯০৯ সালের ১৬ই আগস্ট তারিখে ঐ গ্রামে একটি রাজনৈতিক ডাকাতি হয়। এই সম্পর্কে ১৫ নং জোড়াবাগান স্ট্রীট ও ১৬৫ আহিরীটোলা স্ট্রীট তল্লাসী করে 'মুক্তি কোন্ পথে' নামক পুস্তক ও কিছু কাগজপত্র পাওয়া যায়। ১৬ জন আসামীকে দায়রায় সোপর্দ্দ করা হয়। ৩ জন খালাস পায়। বাকী ১৩ জনকে হাইকোর্টের স্পেসাল বেঞ্চের সমক্ষে বিচারার্থ প্রেরণ করা হয়। প্রায় ৩০০ সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়। নগেনচন্দ্র, বিধুভূষণ দে, কালিনাথ ঘোষ, অবনী চক্রবর্তী, অশ্বিনী বসু ও শচীন্দ্র মিত্রের ৭ বৎসর, সুধীর দে ও নগেন সরকারের ৫ বছর ও সতীশ চ্যাটার্জির ৩ বৎসর কারাদণ্ড হয়। স্যার জেমস্ ক্যাম্বেল কার এদের মধ্যে অশ্বিনী ও অবনী ছাড়া আর সকলকে অনুশীলন সমিতিভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন।[৪]

৭. বরিশাল ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা—১৯১৬

বরিশাল ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার ছোট একটি ইতিহাস আছে। রায় বাহাদুর যামিনী দাস নামে একজন অ্যাডিসনাল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ী ছিল ঢাকা শহরে। তিনি কর্মস্থলে থাকতেন। ঢাকার বাড়ীতে তাঁর পত্নী এবং সত্যেন্দ্র ও গিরীন্দ্র নামে দুই পুত্র বাস করতেন। দুই পুত্রই অনুশীলন সমিতির বিশ্বস্ত সভ্য ছিল। রায় বাহাদুরের বাড়ী সন্দেহমুক্ত স্থান মনে করে ঐ বাড়ীতে একটি ট্রাঙ্কের মধ্যে কতক অস্ত্র-শস্ত্র, রাজনৈতিক ডাকাতিতে প্রাপ্ত কিছু অলঙ্কার ও সমিতির বহুতর গোপন কাগজপত্র গিরীন্দ্রের জিম্মায় ঐ বাড়ীতে রাখা হ'ত। গিরীন্দ্রের মাতা সেটা জানতে পেরে অবিলম্বে বাড়ী আসবার জন্য স্বামীকে টেলিগ্রাম করেন। এই টেলিগ্রামের কথা গিরীন্দ্র শেষ মুহূর্তে জানতে পারে এবং তৎক্ষণাৎ দলের গোপন কেন্দ্রে সংবাদ প্রেরণ করে। মদন ভৌমিককে

পাঠানো হয় ট্রাঙ্কটি ফেরৎ আনবার জন্য। কিন্তু ততক্ষণ রায় বাহাদুর বাড়ীতে এসে গিয়েছেন। তিনি মদন ভৌমিককে আটক রেখে পুলিশে সংবাদ পাঠান। পুলিশ এসে ট্রাঙ্কটি হস্তগত করে এবং মদন ভৌমিক ও গিরীন্দ্র উভয়কেই গ্রেপ্তার করে ও অস্ত্র আইনে উভয়ের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা রুজু হয়। গিরীন্দ্র তখনও সাহস দেখায় এবং মদনবাবুকে জড়ানোর মত কোন প্রমাণ গিরীন্দ্রের কাছ থেকে পুলিশ সংগ্রহ করতে পারে না। মদনবাবু খালাস পান। গিরীন্দ্রের আড়াই বছর কারাদণ্ড হয়। কিন্তু ঐ ট্রাঙ্ক থেকেই বরিশাল ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার সূত্রপাত। ট্রাঙ্কের মধ্যে পাওয়া জিনিষপত্রের বনিয়াদে কলারগাঁও ডাকাতি (১৯১০) দাদপুর ডাকাতি (ঐ) পণ্ডিতসার ডাকাতি (১৯১১), সুকাইর ডাকাতি (১৯১১), কাওয়াকুরি ডাকাতি (১৯১২) পানাম ডাকাতি (১৯১২)—প্রভৃতি ১৩টি ডাকাতিকে জড়িয়ে ১৯১৩ সালের মে মাসে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজনের অভিযোগে ৪৪ জনের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা স্থাপন করে। প্রতুল গাঙ্গুলী, মদন ভৌমিক, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ), রমেশচন্দ্র চৌধুরী ও খগেন্দ্র চৌধুরী আত্মগোপন করেন। পুলিশ তাঁদের ধরতে পারে না। ৩৭ জনকে বিচারার্থ উপস্থিত করা হয়। দুইজন রাজসাক্ষী হয়। এ'র মধ্যে একজন পর্বোক্ত গিরীন্দ্র দাস ও অপর জন ছিল রজনী দাস নামে আর এক যুবক। গিরীন্দ্র অস্ত্র আইনের মোকর্দ্দমায় জেলখানায় থাকবার সময়ে তার পরিবারের লোকদের ও পুলিশের সমবেত চাপে মনোবল হারিয়ে ফেলে ও এই মোকর্দ্দমায় রাজসাক্ষী হয়। মোকর্দ্দমা কিছুদিন চলবার পর আসামীপক্ষ সমর্থনকারী বিখ্যাত ব্যারিষ্টার বি. সি. চ্যাটার্জ্জি ও সরকারপক্ষের উকীলের প্রচেষ্টায় একটা আপোষ হয় এবং স্থির হয় আসামীদের মধ্যে ১২ জন অপরাধ স্বীকার করবে—অবশিষ্ট আসামীদেরকে আদালত মুক্তি দেবেন। তদনুসারে ১২ জন অপরাধ স্বীকার করেন। রমেশচন্দ্র আচার্য্য ও

যতীন রায় (ফেগু রায়) এই দুই বিখ্যাত বিপ্লবীকে ১২ বছরের দীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। যতীন ঘোষ, রোহিনী গুহ ও নিবারণ কর এই ৩ জনের হয় ১০ বছরের দীপান্তর এবং প্রিয়নাথ আচার্য্য ও গোপাল মিত্রের ৭ বছরের দীপান্তর দণ্ড হয়। অন্য ৫ জনের লঘুতর দণ্ড হয়। নরেন্দ্রমোহন সেন, গোপাল মুখার্জি, দেবেন ঘোষ প্রভৃতি সহ ১৪ জনকে খালাস দেওয়া হয়। স্যর জে. ক্যাম্বেল কার লিখেছেন—

"While the case was being heard, the Government of Bengal, having regard to the unsatisfactory result of the Dacca case, took the unusual course of making a compromise with the accused in consequence of which 12 of them pleaded guilty to the charge and the remaining 14 were discharged",

৮. দিল্লী ষড়যন্ত্র মোকার্দ্দমা—১৯১৪

এই মোকর্দ্দমাটি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই মোকর্দ্দমাতেই ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ব্যাপকতা এবং অনুশীলন সমিতির সর্বভারতীয় সংগঠনের কথা সরকারের ও ভারতের জনগণের সামনে সর্বপ্রথম উদ্ঘাটিত হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে চন্দনগরের বিপ্লবী গোষ্ঠী অনুশীলন সমিতির সঙ্গে একত্রিত হয়ে যায় এবং ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী রাসবিহারী বসু অনুশীলন সমিতির সর্বাধিনায়ক পদে বৃত হন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বারাণসীর শচীন্দ্র সান্যালের গোষ্ঠীও অনুশীলন সমিতির সাথে একত্রিত হয়ে যায়। ১৯০৮ সালে মুরারীপুকুরের বাগানবাড়ী খানাতল্লাসী হওয়ার সময়ে রাসবিহারীর দ্বারা লিখিত দুখানি পত্র পুলিশের হস্তগত হয়। বন্ধুবর্গের পরামর্শে রাসবিহারী বঙ্গদেশ ছেড়ে দেরাদুনে গিয়ে সেখানে Imperial Forest

Institute এ চাকুরী গ্রহণ করেন। পুলিশ রাসবিহারী সম্পর্কে আর বিশেষ কোন মনোযোগ দেয় না।

লাহোর ও দিল্লীতে লালা হরদয়ালের নেতৃত্বাধীনে একটি বিপ্লবী গোষ্ঠী ছিল। হরদয়াল ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে দেশত্যাগ করবার সময়ে তাঁর দলভুক্ত জিতেন্দ্রমোহন চ্যাটার্জির হস্তে দলের ভার অর্পণ করে যান। ঘটনাচক্রে জে. এম. চ্যাটার্জির সাথে রাসবিহারীর ঘনিষ্ঠতা জন্মে এবং চ্যাটার্জি ব্যারিষ্টারী পড়বার জন্য বিলাত চলে যান ও যাওয়ার সময়ে দলের কর্তৃত্ব রাসবিহারীর হস্তে ন্যস্ত করে যান। সার জে. ক্যাম্বেল কার বলেছেন, ১৯১০ খৃষ্টাব্দে রাসবিহারী লাহোর যান এবং হরদয়াল গোষ্ঠীর বিপ্লবীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন (On his visit to Lahore in 1910, he found the remnants of Hardayal's party ready to his hand)। এই ভাবে অনুশীলন সমিতির কর্মধারা সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। ভারত সরকার স্থির করেন ঐ বছরের ২৩শে ডিসেম্বর বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ রাজকীয় শোভাযাত্রা সহকারে দিল্লী প্রবেশ করবেন এবং মোগল বাদশাহদের অনুকরণে দরবার করবেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে অনুশীলন সমিতির গোপন কেন্দ্র ২৯৬/১ নং আপার সার্কুলার রোডে নরেন্দ্রমোহন সেন, অমৃত ওরফে শশাঙ্ক হাজরা প্রভৃতির সাথে পরামর্শ করে রাসবিহারী স্থির করেন—এবার একটা বড় রকমের কাজ করা হবে—যা দেখে সারা পৃথিবী চমকিত হবে—অর্থাৎ ঐ রাজকীয় শোভাযাত্রার মধ্যে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপরে বোমা নিক্ষেপ করা হবে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী বড়লাটের উপরে বোমা নিক্ষেপের আয়োজন চলতে থাকে। ইতোমধ্যে রাসবিহারী চন্দননগর থেকে বসন্ত বিশ্বাস নামক সপ্তদশ বর্ষীয় এক যুবককে নিজের কাছে নিয়ে যান। পরে ভাই পরমানন্দের সহযোগিতায় তাকে লাহোরের একটি

ডাক্তারখানায় কম্পাউণ্ডাররূপে নিযুক্ত করা হয়। Sedition Committee র রিপোর্টে বসন্তকে রাসবিহারীর ভৃত্য (Servant) বলে বর্ণনা করা হ:য়েছে। ২৩শে ডিসেম্বর ১৯১২--রাজকীয় সমারোহে, অশ্বারোহী দেশীয় রাজন্যবর্গ, অভিজাত শ্রেণীর খ্যাত-নামা ব্যক্তিগণ, উচ্চপদাধিকারী সামরিক ও অসামরিক কর্মচারীবৃন্দ-সহ সুবিশাল শোভাযাত্রা সহকারে সুসজ্জিত হস্তীপৃষ্ঠে আসীন লর্ড হার্ডিঞ্জ ও লেডি হার্ডিঞ্জ দিল্লীর "চাঁদ্‌নী চক্" এর প্রশস্ত রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছেন। লালকেল্লা থেকে যখন ঐ শোভাযাত্রা মাত্র ২০c গজ দূরে—তখন লর্ড হার্ডিঞ্জের উপরে বোমা পড়ে। লর্ড হার্ডিঞ্জ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তাঁর রক্ষী নিহত হয়। ঠিক কোন্ স্থান থেকে বোমা ছোঁড়া হয় সে সম্পর্কে জেম্‌স্ ক্যাম্বেল কার লিখেছেন—

"The evidence of eye witnesses as to the point from which the bomb was thrown, including the statements of highest officials was confusing and cotradictory, and it was for a long time supposed that it came from the roof of the Punjab National Bank. The most detailed enquiry failed to confirm this theory, and it now appears equally likely, that it may have been thrown from the pavement which ran down the wide street".

দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত সরকারী গোয়েন্দা বাহিনী এই কার্য্যের অনুষ্ঠাতা কে বা কারা সে সম্বন্ধে কোন সূত্র আবিষ্কার করতে পারেন না। ইতোমধ্যে আরও দুটি ঘটনা ঘটে। ১৯১৩ খৃণ্টাব্দের ২৭ মার্চ শ্রীহট্টের অন্তর্গত মৌলবী বাজারের আই. সি. এস. মহকুমা হাকিম মিঃ জি. গর্ডনকে হত্যা করবার জন্য অনুশীলন সমিতি কর্তৃক যোগেন্দ্র চক্রবর্তী, অমৃত সরকার ও আরও একজনকে প্রেরণ করা হয়। গর্ডন কিছুতেই বাড়ীর বাইরে আসছেন না দেখে

বিপ্লবীরা স্থির করেন কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে গর্ডনের ঘরে গিয়ে তাঁকে হত্যা করা হবে। কাঁটাতারের বেড়া ডিঙানোর সময়ে যোগেন্দ্র চক্রবর্তী পড়ে যান ও তাঁর কাছে যে বোমা ছিল সেই বোমা ফেটে তাঁর দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় অপর দুইজনকে পালিয়ে যেতে হয়। এরপর গর্ডনকে লাহোরে বদলী করা হয়। তিনি সাময়িকভাবে লাহোরের লরেন্স গার্ডেনে অবস্থিত Montogomery Hall এ বাস করছিলেন। অনুশীলন সমিতি লরেন্স গার্ডেনে গর্ডনের যাতায়াতের পথের উপরে একটি বোমা রেখে আসেন। উদ্দেশ্য ছিল গর্ডনকে হত্যা। কিন্তু গর্ডন আসবার আগেই রামপদ রথ নামে এক চাপরাসী সেই পথ দিয়ে বাইসাইকেল চড়ে যাচ্ছিল। সাইকেলের চাকায় লেগে বোমা ফেটে যায় এবং রামপদ নিহত হয়।

মৌলবী বাজারে, দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রতি আক্রমণে, এবং লয়েন্স গার্ডেনে—এই তিন জায়গায় বোমা— সবগুলিই একই ধরণের বোমা এবং একই জায়গায় প্রস্তুত বলে বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করেন। সুতরাং কোথা থেকে এই বোমাগুলি তৈরী হচ্ছে তাই নিয়ে গোয়েন্দা বিভাগের তদন্ত সুরু হয়। কার সাহেব লিখেছেন—

"It led to enquiries in Moulvibazar and neighbourhood pointing to the source of all these bombs".

এই তদন্তের সূত্রেই গোয়েন্দা পুলিশ কলকাতা রাজাবাজার অঞ্চলে ২৯৬/১ নং আপার সার্কুলার রোডে অবস্থিত অনুশীলনের গোপন শেলটার ও বোমার কারখানার সন্ধান পায়। ১৯১৩ সালের ২১শে নভেম্বর এই বাড়ী খানাতল্লাস হয়। এখানে বাস করতেন অমৃতলাল ওরফে শশাঙ্ক হাজরা। শশাঙ্ক গ্রেপ্তার হন। পরে রাজাবাজার বোমার মোকর্দ্দমায় তাঁর ১৫ বৎসরের দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। তল্লাসীর পূর্বদিন রাত্রে রাসবিহারী বসু এখানে এসেছিলেন

এবং রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত এখানে ছিলেন। তিনি এখানে বসে দিল্লীর সেণ্ট ষ্টিফেন্‌স্ মিশন স্কুলের শিক্ষক আমীর চাঁদ এবং তাঁর সহকর্মী দীননাথ তলোয়ারের নামে দুই খানা চিঠি লেখেন এবং ঠিকানা লেখা লেফাফা ব্লটিং প্যাডের উপরে চেপে কালি শুকান। ফলে প্যাডের উপরে উল্টো হয়ে আমীর চাঁদ ও দীননাথ তলোয়ারের নাম ঠিকানার ছাপ পড়ে। পুলিশ তল্লাসীর সময়ে এই ব্লটিং প্যাড্ হস্তগত করে। ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের এক প্রত্যূষে আমীর চাঁদের বাড়ীতে পুলিশ হানা দেয়। প্রচুর পরিমাণে বৈপ্লবিক কাগজপত্র হস্তগত করে। আমীর চাঁদ গ্রেপ্তার হন। দীননাথকেও গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি স্বীকারোক্তি করেন। একই দিনে আউধবিহারীর বাড়ী তল্লাসী করে ৫৭ কপি 'লিবার্টি' ইস্তাহার পাওয়া যায়। যুগান্তর পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে অনুশীলন সমিতি কর্তৃক ইংরাজী 'লিবার্টি' ও বাংলা 'স্বাধীনতা' ইস্তাহারের প্রকাশ ও সারা ভারতে তার বিতরণ ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত অব্যাহত ভাবে চলেছে।

এই ঘটনাবলীর উপরেই দিল্লী ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা স্থাপিত হয়। রাসবিহারী বসু, আমীর চাঁদ, আউধবিহারী, বালমুকুন্দ, বসন্ত বিশ্বাস প্রভৃতি ১১ জনের নামে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজনের অভিযোগ আনা হয়। রাসবিহারী আত্মগোপন করেন। দীননাথ রাজসাক্ষী হয়। দায়রা বিচারে আমীর চাঁদ, আউধবিহারী ও বালমুকুন্দের ফাঁসীর হুকুম হয় এবং বসন্ত বিশ্বাস ও অন্য দুই জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয় ও ৫ জন আসামী খালাস পায়। সরকারের তরফ থেকে বসন্ত বিশ্বাসের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রার্থনা করে ও চরণদাস নামক আর এক আসামীর মুক্তির আদেশ নাকচের প্রার্থনা করে হাইকোর্টে আপীল করা হয়। হাইকোর্ট দুটি প্রার্থনাই মঞ্জুর করেন। ফলে অন্য তিনজনের সাথে বসন্ত বিশ্বাসেরও ফাঁসী হয়। একটি ১৭ বছর বয়স্ক

কিশোরের প্রাণনাশের জন্য সরকার পক্ষ পিশাচের ন্যায় উৎসাহ দেখিয়েছেন। এটি ইতিহাসের পাতায় সভ্য ইংরাজ জাতির পৈশাচিক আচরণের চিরস্থায়ী নজির হয়ে থাকবে।

রাসবিহারীকে কিছুতেই পুলিশ ধরতে পারে না। তাঁকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধ'রে দেওয়ার জন্য ভারত সরকার সাড়ে বারো হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেন। হাইকোর্টে সরকার পক্ষের উকীল রাসবিহারী সম্পর্কে মন্তব্য করেন—

"Rashbehari floats down from Lahore into the Presidency of Bengal. He goes down with a moustage and comes up clean shaven – he goes down a Punjabi and comes a Bengalee." ৮

এখানে উল্লেখযোগ্য যে আলিপুর ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার পরে যেখানে যে বোমা ব্যবহৃত হয়েছে– সবই অনশীলন সমিতির চন্দনগর কারখানায় অথবা রাজাবাজার কারখানায়, সরকারী রিপোর্টে এগুলিরই নাম—Rajabazar bomb। সরকারী বিশেষজ্ঞদের মতে এই বোমা ছিল অতিশয় শক্তিশালী। শশাঙ্ক হাজরা বোমার খোল প্রস্তুত করতেন। সেগুলিতে মাল মসলা ভরে শক্তিশালী বোমায় পরিণত করতেন চন্দনগরের মনীন্দ্রনাথ নায়েক।

৯. বরিশাল ষড়যন্ত্র অতিরিক্ত মোকর্দ্দমা—১৯১৫

বরিশাল ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমায় ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, মদন ভৌমিক, খগেন্দ্র চৌধুরী, প্রতুল গাঙ্গুলী ও রমেশ চৌধুরী –অনুশীলন সমিতির এই পাঁচ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ফেরার (absconding) ছিলেন। পূর্বোক্ত Compromise বা চুক্তি অনুসারে বরিশাল ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা মিটে গেলে পুলিশ ক্রমে ক্রমে ধরে এনে তাঁদের বিরুদ্ধে Barisal Conspiracy (Supplementary) case স্থাপন করে। মূল বরিশাল ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমায় আসামীদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল, এঁদের বিরুদ্ধেও সেই একই অভিযোগ। ব্যারিস্টার বি. সি. চ্যাটার্জী

প্রাথমিক আপত্তি উত্থাপন করে বলেন যে, ১২ জন দোষ স্বীকার করলে সরকার বাকী সব আসামীর বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা প্রত্যাহার করে নেবেন—এইরূপ চুক্তির ভিত্তিতেই মূল মোকর্দ্দমায় ১২ জন আসামী দোষ স্বীকার করেছে। সুতরাং এখন এদের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা চলতে পারে না। সরকারপক্ষ বলেন—'চুক্তি হয়েছিল বিচারাধীন আসামীদের সম্পর্কে, ফেরারীদের সম্পর্কে চুক্তি হয় নাই।' এই কথায় মিঃ চ্যাটার্জি তাঁর গায়ের কালো কোট খুলে ফেলে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হলফ নিয়ে বলেন যে সকল আসামীদের সম্পর্কেই চুক্তি হয়েছিল। আসামী মদন ভৌমিক আত্মপ্রকাশ করবার পূর্বে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছিল এবং তিনি মদনকে বলেছিলেন সকল আসামীর বিরুদ্ধেই মোকর্দ্দমা প্রত্যাহৃত হয়েছে। কিন্তু সেসন জজ ঐ জবানবন্দী সত্বেও প্রাথমিক আপত্তি নাকচ করে দেন। ফলে এঁদের বিচার হয়। বিচারে ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর ১৫ বছর এবং খগেন ওরফে সুরেশ চৌধুরী, প্রতুল গাঙ্গুলী, রমেশ চৌধুরী ও মদন ভৌমিক এঁদের প্রত্যেকের ১০ বছর করে দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। চণ্ডীচরণ কর নামে আর একজন ফেরারী আসামী দোষ স্বীকার করেন। তাঁর এক বছর কারাদণ্ড হয়। হাইকোর্টে আপীল করা হলে হাইকোর্ট দুই জনের দণ্ড হ্রাস করেন, এবং প্রতুল গাঙ্গুলী ও রমেশ চৌধুরীর মুক্তির আদেশ দেন। ফলে ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর ১০ বছর ও খগেন চৌধুরীর ৭ বছর দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। মদন ভৌমিকের আপীল ডিস্‌মিস্‌ হয়। ফলে তাঁর নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ১০ বছর দ্বীপান্তর দণ্ড বহাল থাকে।

১০. প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা ও আনুসঙ্গিক মোকর্দ্দমা সমূহ

এবার আমরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বৈপ্লবিক অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শৌর্য্য সমুজ্জ্বল ও তাৎপর্য্যপূর্ণ অংশে প্রবেশ করছি।

দিল্লী ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমায় দীননাথের স্বীকারোক্তির কথা প্রকাশ হয়ে পড়বার সাথে সাথেই রাসবিহারী চাকুরী ছেড়ে দিয়ে এবং দেরাদুনের বাস উঠিয়ে দিয়ে আত্মগোপন করে বিপ্লবের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। রাসবিহারী ছিলেন 'পথের দাবী'র সব্যসাচীর মত ছদ্মবেশ-বিশারদ। পুলিশ কিছুতেই তাঁকে ধরতে পারে না। সিডিসন কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে যে—"Early in 1914 the notorious Rashbebari Basu...arrived in Benares and parctically took charge of the movement. Although a reward had been offered for his arrest and his photographs had been widely circulatea, he succeeded in residing in Benares throughout the greater part of the year 1914 apparently without knowledge of the police"[১] ১৯১৪ সালের শেষের দিকে প্রথম মহাযুদ্ধ সুরু হয়ে যায়। বিদেশে যে সব ভারতীয় বিপ্লবী ছিলেন তাঁরা অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে জার্মান সরকারের সাথে বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন যে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদের জন্য জার্মান গভর্নমেণ্ট অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ সাহায্য দেবে। লালা হরদয়াল অনেক পূর্ব থেকেই সান্ফ্রান্সিস্কোতে 'গদর পার্টি' স্থাপন করে প্রবাসী শিখদেরকে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষান্তে তাদেরকে সামরিক শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছিলেন। আগেই বলা হয়েছে যে পাঞ্জাবে হরদয়াল গোষ্ঠীর যে সব বিপ্লবী ছিলেন তাঁরা হরদয়ালের নির্দ্দেশেই রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বাধীনে কাজ করতে থাকেন ও তাঁরা অনুশীলন সমিতির সাথে একত্রিত হয়ে যান।

বিদেশে ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে অনুশীলন, যুগান্তর, হরদয়ালের গদর পার্টি প্রভৃতি সকল দলের লোকই ছিলেন। (স্মরণ রাখতে হবে যে সারা ভারতে শুধু বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোথাও যুগান্তর গোষ্ঠীর কোন সংগঠন ছিল না)।

প্রবাসী বিপ্লবীরা সকলে মিলে জার্মানী থেকে সাহায্য সংগ্রহ করে ভারতে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান সংঘটনের জন্য একটা সংস্থা গড়ে তুললেন। এই সংস্থাকে সাধারণভাবে 'বার্লিন কমিটি' বলা হয়—প্রকৃত নাম ছিল Indian Independence Committee (I. I. C)। এতে সব দলের লোকই ছিলেন। অনুশীলনের রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, তারক দাস, ধীরেন সরকার, জ্ঞানেন্দ্র দাশগুপ্ত, সুরেন কর, বীরেন দাশগুপ্ত প্রভৃতি; যুগান্তর গোষ্ঠীর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য, জিতেন লাহিড়ী প্রভৃতি এবং গদর পার্টির লালা হরদয়াল, তাঁর দলের সেক্রেটারী রামচন্দ্র ও আরও অনেকে, তাছাড়া বিলুপ্ত অভিনব ভারত সংঘের বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা) টিনেভ্যালী ষড়যন্ত্রে দণ্ডিত নীলকণ্ঠ আয়ার এবং হেরম্বলা গুপ্ত, চম্পকরমন পিল্লাই, চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী, প্রতিবাদী আচার্য্য প্রভৃতি প্রবাসী বিপ্লবীগণ (যাঁরা শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ও মাদাম কামা প্রভৃতির সাথে যুক্ত ছিলেন)—এঁরা I. I. C'র সভ্য হন। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করবার জন্য জার্মান গভর্নমেণ্ট তিনটি পৃথক পরিকল্পনা রচনা করেন। তার মধ্যে ব্যাঙ্কক পরিকল্পনার কর্তৃত্ব ন্যস্ত হয় লালা হরদয়ালের উপরে, বাটাভিয়া পরিকল্পনা যুগান্তর গোষ্ঠীর সাথে সংযুক্ত হয় এবং আফগান পরিকল্পনার কর্তৃত্ব লাভ করেন রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ।

হরদয়ালের পরিকল্পনা ছিল সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত গদর সভ্য-গণকে কিছু কিছু অস্ত্রশস্ত্রসহ পাঞ্জাবে প্রেরণ করা এবং রাসবিহারীর নেতৃত্বাধীনে ব্যাপক সশস্ত্র গণবিদ্রোহে সহায়তা করা।

এই পরিকল্পনা অনুসারে প্রথমে জার্মানীর সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনার সংবাদ নিয়ে আমেরিকা থেকে ভারতে আসেন কেদারেশ্বর গুহ। অনুশীলন সমিতির নেতা নরেন সেন তাঁকে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন। বিনয় সরকারের ভ্রাতা ধীরেন সরকার ও

পুলিনবাবুর সহপাঠী তারকনাথ দাস— গদর পার্টির শিখবিপ্লবীরা যে জাহাজে আসছিল সেই জাহাজে কেদারবাবু ও ভূপেন মুখার্জীকে তুলে দেন। তখন দলের পরিচিত কর্মীরা অনেকেই কারারুদ্ধ হয়েছেন। অনেকে আত্মগোপন করেছেন। কেদারেশ্বরবাবু বহু চেষ্টা ক'রে সমিতির তৎকালীন নেতা অনুকূল চক্রবর্তীর সাথে দেখা করেন। অনুকূলবাবু পরিচিতিপত্র দিয়ে কেদারবাবু ও ভূপেন মুখার্জিকে রাসবিহারীর কাছে পাঠিয়ে দেন। রাসবিহারীর গোপন আবাস তখন কাশীতে বাঙ্গালীটোলার সন্নিকটে। পরিচিতিপত্র নিয়ে ওঁরা গোপনে রাসবিহারীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ঐ দিনই গঙ্গা-বক্ষে নৌকায় বসে রাসবিহারীর সাথে তাঁদের কথা হয় ও জার্মানী থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনার কথা ওঁরা রাসবিহারীকে জানান। রাসবিহারী বলেন—'জার্মানী থেকে সাহায্য আসে—সে তো ভাল কথা কিন্তু সেটাত অনিশ্চিত। আমি সৈনিক বিদ্রোহের চেষ্টায় আছি। আপনারা এখন পূর্ববঙ্গে ফিরে যান। সেখানে থাকা অসম্ভব হ'লে উত্তর ভারতে চলে আসবেন"।[১০]

এর পর নভেম্বর মাসে গদর পার্টির সহায়তায় ভারতে ফিরে আসেন বিষ্ণুগণেশ পিংলে ও সত্যেন সেন। বিষ্ণুগণেশ পিংলেও বহুকষ্টে রাসবিহারীর গোপন ঠিকানা সংগ্রহ করে কাশীতে গিয়ে রাসবিহারীর সাথে দেখা করেন এবং তাঁকে জানান যে আমেরিকা থেকে হরদয়াল কর্তৃক প্রেরিত এবং সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত 4000 শিখ বিপ্লবী পাঞ্জাবে এসে পৌঁচেছে এবং আরও ২0,000 শীঘ্র এসে পৌঁছাবে। এই সংবাদ পাওয়ার পরই রাসবিহারী শচীন সান্যালের সাথে পিংলেকে পাঠালেন পাঞ্জাবের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে। তারা ফিরে এসে জানালেন—খবর খুব ভাল। সশস্ত্র ও ব্যাপক গণবিদ্রোহের আয়োজন সুরু করা যেতে পারে। এর পরেই ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে রাসবিহারী

বারাণসীতে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের এক গোপন সভা আহ্বান করেন। "He announced that a general rebellion was impending and informed his audience that they must be prepared to die for the Country."[১১] অভ্যুত্থানের তারিখ স্থির ছিল—২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫।

এর পরে ঝড়ের বেগে কাজ সুরু। শেঠ দামোদর স্বরূপের উপরে এলাহাবাদ কেন্দ্রের কর্মভার অর্পণ করা হ'ল। বাংলা থেকে গিরিজা দত্তকে আনিয়ে শচীন সান্যাল ও গিরিজা দত্তকে ভার দেওয়া হয় কাশী কেন্দ্রের, জব্বলপুরে পাঠানো হয় নলিনী মুখার্জী ও নলিনীকান্ত ঘোষকে—মধ্যপ্রদেশ ক্যাণ্টনমেণ্টগুলিতে কাজ করবার জন্য। রাসবিহারী স্বয়ং নানা ছদ্মবেশ ধারণ করে বিভিন্ন এলাকার সৈন্যব্যারাকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। রাসবিহারীর হেড্ কোয়ার্টার স্থানান্তরিত হ'ল—কাশী থেকে লাহোরে। এইখানে তৎকালীন বিপ্লবীদের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও বৈপ্লবিক মনোবলের নিদর্শন স্বরূপে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারা যায় না। মোচিগেটের সন্নিকটে রাসবিহারীর জন্য বাড়ী ভাড়া করা হ'ল। কিন্তু তখনকার পরিবেশে ঐ বাড়ীতে রাসবিহারী একা থাকলে পুলিশের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'বে। বাড়ীটিকে গৃহস্থ বাড়ীর রূপ দেওয়ার জন্য সেখানে একজন নারী থাকা দরকার। রাসবিহারীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী পাঞ্জাবের রামশরণ দাস তাঁর স্ত্রীকে বললেন রাসবিহারীর স্ত্রী পরিচয়ে ঐ বাড়ীতে বাস করতে। রামশরণের মহিমাময়ী পত্নী এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন। এবং সেই ব্যবস্থাই পাকা হ'ল। এতে শুধু সংশ্লিষ্ট তিন জনের বৈপ্লবিক মনোবলই প্রমাণিত হয়েছে তা নয়, নারীরা যে লোকচক্ষুর অন্তরালে কত গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক কর্ম সাধন করেছেন, এ ঘটনা তারও একটি জ্বলন্ত প্রমাণ।

বাংলায় ও বিহারেও প্রবল বেগে প্রস্তুতি চলতে লাগল। বাংলায় সৈনিক অভ্যুত্থান হবে না। নির্দ্দেশ ছিল এই যে, প্রচুর পরিমাণে বোমা প্রস্তুত করতে হবে। এই বোমার কতক বাংলাতেই থাকবে। কতক যাবে কাশী—সেখানে কতক রেখে বাকিটা চালান হবে লাহোরে। সত্য সত্যই প্রচুর পরিমাণে বোমা প্রস্তুত হ'তে লাগল। অনুকূল চক্রবর্তী, সতীশ পাকড়াশী, অমৃত সরকার, গোপেশ রায়, বিভূতি হালদার, নরেন ব্যানার্জী, প্রবোধ বিশ্বাস, জিতেশ লাহিড়ী, তারিণী মজুমদার প্রমুখ সকলেই কর্ম্মব্যস্ত। প্যারা মিলিটারী পোষাক তৈরী হল। ছেলেরা প্রবল উৎসাহে কুচকাওয়াজ অভ্যাস করতে সুরু করল। কারণ, নির্দ্দেশ ছিল ২১শে ফেব্রুয়ারী যদি পাঞ্জাব মেল কলকাতায় না পৌঁছায়—তা হলেই বুঝতে হবে উত্তর ভারতে বিদ্রোহ সুরু হয়ে গিয়েছে। বাংলার বিপ্লবীরা তখন বোমা নিয়ে ফোর্ট উইলিয়াম আক্রমণ করবেন। পাঞ্জাবের শিখ সৈন্যদের মাধ্যমে বাংলার শিখ সৈন্যদের কাছে খবর দেওয়া ছিল—ঐ রকম আক্রমণ ঘটলেই তাঁরাও অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে এসে বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দেবেন। বিহারের ভার অর্পিত ছিল বঙ্কিম মিত্র, ফণী ঘোষ, রামবিনোদ সিং প্রভৃতির উপর।

বিষ্ণুগণেশ পিংলে ও বিনায়করাও কাপ্‌লে নিয়মিত কলকাতায় এসে কাশীতে বোমা নিয়ে যেতেন। সেই বোমা কাশী থেকে লাহোরে পাঠানো হ'ত। তাঁরা এসে উঠতেন প্রবোধ বিশ্বাসের ১৭২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীটস্থ মেসে।*

* এই প্রবোধ বিশ্বাস পরে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হয়ে 'দালান্দা' নামে পরিচিত বন্দী নিবাস থেকে নলিনীকান্ত ঘোষের সাথে একযোগ পালিয়ে যান। দালান্দার সেই বাড়ীটি এখনও আছে। পি. জি. হাসপাতালের কাছে যে বাড়ীতে এখন Police Tarining School আছে। ১৯১৫ সালে সেইটাই ছিল "দালান্দা বন্দী নিবাস"।

এই ব্যাপক উদ্যমের বিবরণ দিতে গিয়ে Sedition Committee-র রিপোর্টে বলা হয়েছে—

"..... he (Rashbehari) arranged for a general rising on the 21st of February, of which Lahore was to be the head quarters. He went there and sent out emissaries to various cantonments in upper India to procure military aid for the appointed day. He also tried to organise the gangs of villagers to take part in the rebellion. Bombs were prepared, arms were got together, flags were made ready, a declaration of war was drawn up. Instruments were collected for destroying railways and telegraph wires"[১২]

ঐ একই দিনে সিঙ্গাপুরে এবং ব্রহ্মদেশেও বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান হবে—এরূপ আয়োজনও করা হয়েছিল।

ফিরোজপুর, মীরাট, জব্বলপুর, কাশী, এলাহাবাদ প্রভৃতি ২৬টি ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে ভারতীয় সৈন্যেরা বিদ্রোহ করে বেরিয়ে আসবে। তারা নিজ নিজ ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে অস্ত্রাগার লুট করে অস্ত্র নিয় আসবে। আমেরিকা থেকে গদর পার্টির যে ৪/৫ হাজার সামরিক বিদ্যায় শিক্ষিত শিখ-বিপ্লবী এসেছিলেন তাঁরা ঐ বিদ্রোহী সেনাদলের সাথে যোগ দেবেন, কৃষক বাহিনী এবং সারা ভারতে বিপ্লবী দলের কর্মীরাও যোগ দেবে—রাজধানী, রাজকোষ দখল করে স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে—এইরূপ পরিকল্পনা ছিল এবং সেটা কার্যে পরিণত করবার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছিল।

কিন্তু ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য—একটি লোকের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে এই বিপুল আয়োজন সাফল্যের দ্বারে এসে ব্যর্থ হয়ে গেল।

এই ব্যর্থতার কারণ সম্বন্ধে স্যার জেম্‌স্ ক্যাম্বেল কার বলেছেন—
"The failure of the Lahore rising..... was chiefly due to the fact that the police was able to introduce in the inner circle of the revolutionaries a spy named Kripal Sing, a cousin of a trooper of the 23rd Cavalry named Balawant Singh, who had recently returned from America and was known to be in touch with other returned emigrants".[১৩]

পুলিশের গুপ্তচর কৃপাল সিং ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লাহোরে মোচি গেট (Mochi Gate) এর নিকটবর্তী আবাসে রাসবিহারী ও বিষ্ণু গণেশ পিংলেকে ও তৎসহ ১২/১৩ জন বিপ্লবীকে আলোচনারত অবস্থায় দেখতে পায় এবং তাদের কথোপকথন থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারী বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের দিন স্থির হয়েছে বলে জানতে পারে। সে তৎক্ষণাৎ তার নিয়োগকারী পুলিশ অফিসারের কাছে টেলিগ্রাম করে—কিন্তু সে টেলিগ্রাম সময়মত পৌঁছায় না। কৃপাল সিংকে 'দাধির' নামক স্থানে পাঠানো হয়। রাসবিহারী ইতোমধ্যে কৃপাল সিং এর কথা জানতে পারেন (রাসবিহারীর নিজেরও গুপ্তচর বিভাগ ছিল)। তিনি অভ্যুত্থানের দিন এগিয়ে নিয়ে আসেন ও স্থির করেন দেশব্যাপী অভ্যুত্থান হবে ১৯শে ফেব্রুয়ারী। কৃপাল সিং ১৯শে ফেব্রুয়ারী ফিরে আসে এবং খবর পায় যে সেই দিনই সন্ধ্যায় অভ্যুত্থান সুরু হবে। সে পুলিশের সাথে যোগাযোগ করলে পুলিশ তাকে মোচি গেটের হেড্ কোয়ার্টারে গিয়ে থাকতে বলে এবং ঐ বাড়ী থেকে সময়মত নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত জানাতে বলে। কৃপাল সিং ফিরে এলে বিপ্লবীরা তাকে আটক করে। সে সন্দেহ করে তাকে খুন করা হবে। সে তখন কোন একটি অজুহাত দেখিয়ে বাড়ীর ছাতে যাওয়ার অনুমতি পায় এবং ছাত থেকে নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত দান করে পুলিশকে আহ্বান করে। তৎক্ষণাৎ পুলিশ এসে বাড়ী ঘিরে ফেলে—কিন্তু

রাসবিহারী ও পিংলে তার আগেই বাড়ী থেকে বেড়িয়ে গিয়েছেন। বাড়ী ঘেরাও হয় বিকাল সাড়ে চারটার সময়ে। সাতজন বিপ্লবী সেই বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার হন।

এই বিবরণ দিয়েছেন জেম্‌স্‌ ক্যাম্বেল কার।

সঙ্গে সঙ্গে ২৬টি ক্যাণ্টনমেণ্টে ভারতীয় সৈনিকদের গ্রেপ্তার, নিরস্ত্রীকরণ ও ব্যাপক স্থানান্তরের অভিযান চলে। শুধু দুই ঘণ্টার ব্যবধান। পুলিশ দু'ঘণ্টা আগে সংবাদ না পেলে ভারতের ভাগ্য অন্যরূপ হতে পারত। পাঞ্জাবীরা ১৯৪১ সালে কৃপাল সিংকে হত্যা করে তার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার পরেও আরও কিছু ঘটনা ঘটে

২০শে ফেব্রুয়ারী লাহোরে আনারকলি বাজারে অর্জন সিং নামক একজন গদর বিদ্রোহীকে একজন দারোগা ও একজন হেডকন্‌স্টেবল অপর দুইজন সঙ্গীসহ গ্রেপ্তারের জন্য তাড়া করে। অর্জন সিং ফিরে দাঁড়িয়ে গুলী ছোঁড়ে এবং দারোগা ছাড়া বাকী তিনজনই নিহত হয়। ২৫শে ফেব্রুয়ারী পারা সিং নামক একজন গদর বিপ্লবীর গ্রেপ্তারকারী চমন সিং নিহত হয়। রাসবিহারী এবং পিংলে আত্মগোপন করেন। প্রায় একমাস পরে মীরাটের ১২নং অশ্বারোহী বাহিনীর একজন সিপাই 'তাদের বাহিনী বিদ্রোহে প্রস্তুত কিছু বোমা দরকার'—এই বলে বিষ্ণু গণেশ পিংলেকে ক্যাণ্টনমেণ্টে ডেকে নিয়ে যায়। পিংলে একটি বাক্সে দশটি বোমা নিয়ে সেখানে যান। যে লোকটি ডেকে নিয়ে যায় সে আসলে ছিল পুলিশের গুপ্তচর। মীরাট ক্যাণ্টনমেণ্টে পৌঁছানো মাত্র পুলিশ বোমার বাক্স সহ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। পিংলের কাছে যে দশটি বোমা পাওয়া যায় তার সম্বন্ধে সিডিসন কমিটি মন্তব্য করেছে ঐ দশটি বোমা একটি রেজিমেণ্টের অর্দ্ধেক উড়িয়ে দিতে পারত ("Sufficient to

annihilate, a regiment") সিডিসন কমিটির রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে—"The bombs which were found in his possession, had, according to approver Bibhuti, been brought to Beneras from Calcutta and had been left in store there" অনুশীলন সমিতি কি প্রকার শক্তিশালী বোমা প্রস্তুত করতেন—এই মন্তব্য থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই সকল ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র এবং তার সাথে যুক্ত আরও আটটি ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা স্থাপিত হয়। এর মধ্যে একটি মোকদ্দমায় ৭৪ জন, একটিতে ৬১ জন ও আর একটিতে ১২ জন আসামী ছিল। এই সকল মোকদ্দমায় ২৮ জনের ফাঁসী হয়, ২৯ জন খালাস পায়, ও অবশিষ্টদের অধিকাংশই যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়। প্রথম মোকদ্দমায় স্পেসাল ট্রাইবুন্যাল ২৪ জনের ফাঁসীর আদেশ দেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ এতে বিচলিত হয়ে পাঞ্জাবের লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্নর স্যার মাইকেল ওডায়ারকে লেখেন—অতলোকের প্রাণদণ্ড ব্রিটিশ সরকারের নিন্দার কারণ হবে। স্যার মাইকেল জানান যারা দয়া প্রার্থনা করবে তাদের মৃত্যুদণ্ডের বদলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হবে। ১৭ জন Mercy petition করে। তাঁদের ফাঁসীর বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। বাকী সাতজন দয়া ভিক্ষা করতে অস্বীকার করেন। তাঁরা বীরের মত সদর্পে ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণ করেন। এঁদের নাম—কর্তার সিং সারাভা, হরনাম সিং, বিষ্ণু গণেশ পিংলে, জগৎ সিং, বিষেণ সিং, সরণ সিং (পিতা বীর সিং) ও আর এক সরণ সিং (পিতা ঈশ্বর সিং)।

দিল্লী ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার পলাতক আসামী হিসাবে রাসবিহারীর মাথার উপরে ১২৫০০ টাকার পুরস্কারের খড়্গ আগে থেকেই ঝুলছিল। ২১ বা ১৯শে ফেব্রুয়ারীর পরিকল্পিত অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার পর যতগুলি ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা হয় তার প্রায় সবগুলিতেই রাসবিহারীকে প্রধান আসামী রূপে গণ্য করা হয়। তাঁর মাথার উপরে ঘোষিত পুরস্কারের পরিমাণ প্রায় দেড় লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়

কিন্তু তিনি পুলিশের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করে লাহোর, কাশী, বাংলা ঘুরে বেড়াতে থাকেন। শেষে তাঁকে নবদ্বীপে অনুশীলন সমিতির গোপন শেলটারে রাখা হয়। তারপর তাঁকে কলকাতার ধর্মতলা অঞ্চলে Cotinental Hotel নামে একটি হোটেলে রাখা হয়। তাঁর সতীর্থরা বিদেশে পাড়ি দেওয়ার জন্য তাঁর উপরে চাপ দিতে থাকেন। কারণ ধরা পড়লে তাঁর মৃত্যুদণ্ড সুনিশ্চিত। রাসবিহারী প্রথমে কিছুতেই সম্মত হন না। পরে যখন তাঁকে বুঝানো হয় বিদেশে গিয়ে অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণের ব্যবস্থা করলে পুনরায় ব্যাপক বিদ্রোহের আয়োজন করা যেতে পারে, তখন তিনি বিদেশ যাত্রার বিষয়ে সম্মতি দান করেন। 'রাজা প্রমথনাথ ঠাকুর'— এই ছদ্মনামে তাঁর নামে পাসপোর্ট যোগাড় করা হয়, এবং পরিচয় দেওয়া হয় তিনি রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়। রবীন্দ্রনাথের জাপান গমন সম্পর্কিত ব্যাপারে প্রাথমিক ব্যবস্থাদি করবার জন্য রাজা প্রমথনাথ জাপান যাচ্ছেন। ১৯১৫ সালের ১২ইমে তিনি ঐ ছদ্ম পরিচয়ে জাপান যাত্রা করেন এবং শচীন সান্যাল ও গিরিজা দত্ত (ওরফে নগেন দত্ত) তাঁকে জাহাজে তুলে দিয়ে আসেন! জাপান থেকে হংকং গিয়ে তিনি সত্য সত্যই কিছু অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে ১৯১৫ সালের ভারতরক্ষা আইন জারী করে সরকার ছোট বড় প্রায় সকল বিপ্লবীকেই জেলখানায় আবদ্ধ করেন। ফলে বিদ্রোহের আর কোন আয়োজন করা সম্ভব হয় নাই।

জাপানে গিয়ে সারাজীবন রাসবিহারী ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করে গিয়েছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রাসবিহারী কর্তৃক আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন, সুভাষচন্দ্রকে ভারত থেকে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি ইতিহাসের সুপরিচিত ঘটনা।

১১. বারণসী ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা—১৯১৫

সর্বভারতীয় অভ্যুত্থান সম্পর্কিত কার্যক্রমের অন্যতম কেন্দ্র ছিল কাশী। সেইজন্য বারাণসী ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা নামে একটি পৃথক ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা স্থাপিত হয়। এই মোকর্দ্দমার অভিযোগ

সমূহ লাহোর ষড়যন্ত্রেরই অনুরূপ। শচীন্দ্র সান্যালকে ১৯১৫ সালের জুন মাসে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৪জন আসামীর বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা স্থাপিত হয়—তার মধ্যে ৮জন পলাতক থাকেন। তাঁদের মধ্যে নরেন্দ্র ব্যানার্জি ও বিনায়করাও কাপলে অন্যতম। শেঠ দামোদর স্বরূপ, শচীন্দ্র সান্যাল, তাঁর ভাই রবি সান্যাল, গিরিজা দত্ত, নলিনী মুখার্জি, গণেশ লাল, শচীন্দ্রের অপর ভ্রাতা জিতেন্দ্র সান্যাল, প্রতাপ সিং, লছ্‌মী নারায়ণ, আনন্দ ভট্টাচার্য্য, বঙ্কিম মিত্র (পাটনা) প্রভৃতি ১৬ জনের বিচার সুরু হয় স্পেসাল ট্রাইবুন্যালের সম্মুখে—৫ই নভেম্বর ১৯১৫ তারিখে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী রায় ঘোষণা করা হয়। শচীন্দ্র সান্যাল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। দামোদর স্বরূপ, গণেশলাল, নলিনী মুখার্জি, প্রতাপ সিং, গিরিজা দত্ত ও লছমী নারায়ণ এঁদের প্রত্যেককে ৫ বছর করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অন্যদের ৩ বছর ও ২ বছর কারাদণ্ড হয়। বিচারকমণ্ডলী রায়ে বলেন ঃ

"বারাণসী ষড়যন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যাপার নয়। দিল্লী, লাহোর ও বারাণসী ষড়যন্ত্র একই ভারতব্যাপী বিদ্রোহ ঘটাইবার অভিব্যক্তি। রাসবিহারী ইহার নেতা। কাশীর কাজে শচীন্দ্র ছিল রাসবিহারীর প্রধান সহচর এবং সে ছিল ঢাকা অনুশীলন সমিতির সাথে সংযুক্ত।"

এই মোকর্দ্দমার রাজসাক্ষী বিভূতির স্বীকারোক্তি অনুসরণ করে পুলিশ চন্দনগরে সুরেশ ঘোষের বাড়ী তল্লাসী করে ও সেখানে একটি ছয় চেম্বার রিভলভার, এক টিন ভর্তি কার্তুজ, দুটি রাইফেল, একটি দোনালা বন্দুক, ১৭ খানি ছোরা এবং কতকগুলি 'স্বাধীন ভারত' ইস্তাহার ও 'লিবার্টি' ইস্তাহার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সুরেশবাবুর বিরুদ্ধে পুলিশ কোন মোকর্দ্দমা দাঁড় করাতে পারে না। তাঁকে বিনা বিচারে আটক করা হয়। চন্দনগরের মতিলাল রায় লিখেছেন—অনুশীলন সমিতির বাদুড়বাগান লেনের শেল্টারে বসেই রাসবিহারী, প্রতুল গাঙ্গুলী, শচীন সান্যাল ও শ্রীশ ঘোষ ভারতব্যাপী বিপ্লবের চক্রজাল রচনা করেন।

১২ মৈনপুরী ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা—১৯১৮

১৯১৬ থেকে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে উত্তরপ্রদেশের মৈনপুরী জেলায় আউরাইয়া ডি. এ. ভি. স্কুলের প্রধান শিক্ষক পণ্ডিত গেন্দালালের নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এই গোষ্ঠীর অধিকাংশ সভ্যই সংগৃহীত হয়েছিল ছাত্র-সমাজ থেকে। প্রধান ও সর্বভারতীয় বিপ্লবী দল অনুশীলন সমিতির সাথে এই গোষ্ঠীর কোন সংযোগ ছিল কিনা তা জানা যায় না। সরকারী রিপোর্টে এই গোষ্ঠীকে "স্বতন্ত্র সংস্থা" বা independent organisation বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এঁদের সভ্যদেরকে একটি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করতে হ'ত। প্রতিজ্ঞাপত্রটি এইরূপ ঃ "...সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী ঈশ্বরের নামে আমি শপথ করছি যে আমি কখনও সংস্থার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করব না। ভারতমাতার নাম নিয়ে আমি শপথ করছি যে বিদেশীর শাসন-শৃঙ্খল থেকে আমি ভারত মাতাকে মুক্ত করব। আমি আমার শরীর, মন ও সম্পত্তি সমস্তই মাতৃভূমির জন্য সমর্পণ করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকব। যত বিপদই আসুক না কেন আমি কখনও কর্তব্যসাধনে পরাঙ্মুখ হব না, প্রয়োজন হ'লে পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করব। কর্তব্যপালনে অবহেলা করলে আমাকে মৃত্যুদণ্ড দানের অধিকার সংস্থার থাকবে"। এঁদের সংস্থার নাম ছিল "মাতৃবেদী সংস্থা"।

১৯১৭ ও ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে এই সংস্থা কয়েকটি রাজনৈতিক ডাকাতি করেন। কয়েকস্থানে ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এঁরা বৈপ্লবিক ইস্তাহারও প্রকাশ করতেন। ১৯১৮ সালে এঁদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে মৈনপুরী ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা স্থাপনা করা হয়। ১০ জনের কারাদণ্ড হয়। কয়েকজন পলাতক থাকেন। পলাতকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শাহজাহানপুরের রামপ্রসাদ বিস্‌মিল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে যখন অনুশীলন সমিতি কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে যোগেশ চ্যাটার্জি 'হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান অ্যাসোসিয়েশন' নাম দিয়ে অনুশীলন সমিতির উত্তর ভারতীয় সংগঠন পুনরুজ্জীবিত করেন তখন রামপ্রসাদ H. R. A. তে যোগদান করেন। রামপ্রসাদ অত্যন্ত মিতাহারী এবং সংযত চরিত্রের লোক ছিলেন। তা ছাড়া ইনি ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক। কাকোরী ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমায় তাঁর ফাঁসী হয়। ফাঁসীর হুকুমের পরেও তিনি জেলে বসে কবিতা লিখতেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে

নানা বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা

দ্বিতীয় পর্য্যায়

১৯২৩—১৯৩৫

প্রথম পর্য্যায়ের ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমাগুলির সর্বশেষ মোকর্দ্দমা 'মৈনপুরী ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা' ১৯১৮ সালে স্থাপিত হয় এবং ১৯১৯ সালে শেষ হয়—এটা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯১৮ সালে বাংলায়, ৭ই ও ৯ই জানুয়ারী ইতিহাসখ্যাত 'গৌহাটি-ফাইট্' এবং ঐ বছরের ১৫ই জুন 'কলতাবাজার ফাইট্' স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিপ্লবীদের সাহস, শৌর্য্য এবং নিঃসঙ্কোচ আত্মবলিদানের উজ্জ্বল সাক্ষ্য রেখে গিয়েছে। কিন্তু এই দুটি তাৎপর্য্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে কোন ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা স্থাপিত হয় নাই। গৌহাটি ফাইট্ নিয়ে হত্যার চেষ্টা ইত্যাদি নানা অভিযোগে মোকর্দ্দমা স্থাপিত হয়েছিল। পুলিশ শেষপর্য্যন্ত অস্ত্র-আইনের অভিযোগ ছাড়া অন্য অভিযোগ প্রমাণ করতে পারে নাই। বিশাল পুলিশ বাহিনীর সাথে মাত্র সাতজন বিপ্লবী যে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ করেছিলেন, সেই যুদ্ধে ৩০ জন পুলিশ কর্মচারী আহত হয়েছিল (একথা গৌহাটি মোকর্দ্দমায় সরকারপক্ষীয় সাক্ষীর

জবানবন্দীতে প্রকাশ পেয়েছে)। এই যুদ্ধের নেতা ছিলেন নলিনী-কান্ত ঘোষ। তাঁর বহুতর গুলীবিদ্ধ দেহ ("body perforated with bullets") গৌহাটির নবগ্রহ পাহাড় থেকে নীচে গড়িয়ে পড়ে। পরে অস্ত্র আইনে নলিনী ঘোষ সহ ছয়জনের কারদণ্ড হয়। ঐ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অপর পাঁচ জনের নাম—প্রভাস লাহিড়ী, নরেন ব্যানার্জি, প্রবোধ দাশগুপ্ত, নলিনী বাগচি, তারাপ্রসন্ন দে ও মনীন্দ্র রায়। কলতাবাজার কাইটে পুলিশ বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে তারিনী মজুমদার ও নলিনী বাগ্‌চি নিহত হন। Freedom Struggle and Anushilan Samiti পুস্তকের প্রথম খণ্ডে ১৩০ থেকে ১৩৬ পৃষ্ঠায় এই দুটি ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এই দুটি ব্যাপার বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা নয়। তথাপি বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসের ধারাবাহিকতার সূত্র হিসাবে এই ঘটনা দুটির উল্লেখ করতে হল।

১৯১৮ সালের পর থেকেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম নূতন পথে মোড় নিতে থাকে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে নরমদল (moderates) এবং চরমদল (Extremists)---এঁদের কলহের পরিণতিতে সুরাট কংগ্রেস দক্ষযজ্ঞে পরিণত হয় এবং কংগ্রেসের কর্তৃত্ব পুরোপুরি মডারেটদের কবলিত হয়—এবং দশবৎসর ধরে মডারেটকবলিত কংগ্রেস করজোড়ে ইংলণ্ডের রাজার কাছে বার্ষিক ভিক্ষাপ্রার্থনা ও ব্রিটিশ জাতির উদারতার বার্ষিক স্তুতিগান ছাড়া আর কিছু করে নাই। এই সময়ে শুধু বিপ্লবীরাই নিজেদের রক্তের মূল্যে ভারতবাসীকে 'পূর্ণ স্বাধীনতার' বাণী শুনিয়েছে। চরমদলের ২/৪ জন নেতা যাঁরা ঐ সময়ের কংগ্রেসের কাছে অপাংক্তেয় ছিলেন তাঁরাও বক্তৃতা ও রচনার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার কথা ২/৪ বার উচ্চারণ করেছেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুরের অম্বিকাচরণ মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে চরমদল পুনরায়

কংগ্রেসে স্থান লাভ করেন। কিন্তু তখন প্রথম মহাযুদ্ধ চলছে। 'আমাদের সম্রাট' বিপন্ন। সুতরাং তখন তো আর স্বাধীনতা চাওয়া যায় না। তখন সকলে কোমর বেঁধে "সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য" (to defend the empire) ত্যাগ স্বীকারের প্রতিযোগিতায় লেগে যেতে হবে। অতএব তৎকালীন কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের সক্রিয় সহযোগিতায় "স্বেচ্ছাপ্রনোদিত সাহায্যের" ছদ্মনামে দরিদ্র ভারতবাসীর ক্ষুদের হাঁড়িতেও 'রাজার হস্ত' পৌঁছে গেল। প্রথম মহাযুদ্ধে অসহায় ভারতবর্ষ স্বেচ্ছাকৃত (?) সাহায্য কতটা করেছিল তার পরিমাণের কথা শুনলে আধুনিক প্রজন্মের লোকদেরও চক্ষু ঘূর্ণিত হবে। 'ওয়ার ফাণ্ডে' ভারতবাসীর স্বেচ্ছকৃত (?) দানের পরিমাণ ছিল ১৩০ কোটি টাকা! (সেটা ১৯১৪—১৯১৮ সাল)। তখনকার ১৩০ কোটি, টাকার বর্তমান মূল্যমান অনুসারে বর্তমান টাকায় রূপান্তরিত করলে যে অঙ্ক দাঁড়াবে তার শূণ্যের সংখ্যা কাগজের একটি ছত্রে ধরানো যাবে না। এছাড়া ১২ লক্ষ ভারতসন্তানকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়েছে— 'সাম্রাজ্যরক্ষার' জন্য কামানের সামনে দাঁড়াতে। ঐ ১২ লক্ষ ভারতীয় যদিও যুদ্ধ করেছে ইংরাজের জন্য তথাপি চার বছর ধরে ঐ ১২ লক্ষ সৈন্যের বেতন, পোষাক, আহার্য্য ইত্যাদির বাবদ যা কিছু খরচ হয়েছে—তার সবটাই যোগাতে হয়েছে ভারতবাসীকে !! এই ১২ লক্ষের মধ্যে একলক্ষ ভারতসন্তান ইংরাজের 'সাম্রাজ্যরক্ষার' জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে !!!

কংগ্রেসনেতারা তখনও আশা করছেন এই পর্বতপ্রমাণ ত্যাগ বৃথা যাবে না। যুদ্ধশেষ হওয়ার পর উদার ইংরাজ জাতি ভারতবাসীর জন্য "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত থেকে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন উপহার দেবে। (full self government-'স্বাধীনতা' কথাটি তাঁরা উচ্চারণও করেন নি।) শৃগাল যেমন আমগাছের উচুঁ ডালে পাকা আম দেখে লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে,—ভাবে—একটু হাওয়া বইলেই

আমটা পড়বে—তখন সেটা ভক্ষণ করা যাবে—নামী এবং ভারী ভারতীয় নেতারা সেইরূপ ব্রিটিশ উদারতার উচ্চ শাখার দিকে প্রায় পাঁচ বছর ধরে লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন—ভারতবাসী পর্বতপ্রমাণ স্বেচ্ছা-প্রণোদিত (?) ত্যাগের মূল্যস্বরূপ, যুদ্ধ শেষে, শান্তির হাওয়া বইলেই পূর্ণস্বায়ত্বশাসনরূপ পাকা আম অবশ্যই শাখাচ্যুত হয়ে ভারতবাসীর হাতের মধ্যে এসে পড়বে—এই আশায়। তার পর যুদ্ধ শেষ হল, শান্তির হাওয়া বইলো—মণ্টেগুচেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার নামক একটি আম্রফল শাখাচ্যুত হল—ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীকে ডেকে বল্‌লেন—"একবারে কি সব দেওয়া যায় ? তোমরা তো এখনও সাবালক হও নি। এবারের মত যা দিচ্ছি তাই নাও—পরে আস্তে আস্তে দফায় দফায় একটু একটু করে স্বায়ত্বশাসন অবশ্যই দেবো—হলফ করে বল্‌ছি। মডারেট নেতারা তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে বললেন —"আরে বাপ্‌! রাজহস্তের দান বলে কথা! একে কি তুচ্ছ করা যায় ? এ দান আমরা মাথায় রাখবো। চরমদলে দুই মত দেখা দিল। চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহেরু, লাজপত্‌ রায় প্রভৃতি বল্‌লেন ঐ নূতন বোতলে পুরনো মদ—ওটা 'অপেয়মগ্রাহ্যম্‌' ওটা আমরা ছোঁব না। চরমদলের অপরাংশ হলেন মধ্যপন্থী—তাঁরা বল্‌লেন—না, ফিরিয়ে দিয়ে কি হবে ? আমরা জোর গলায় হাঁক্‌ দিয়ে ইংরেজকে জানিয়ে দিই—'তোমার ঐ পচা আম ভারতবাসী চায় না, ভারতবাসী ভয়ানকরকমে অসন্তুষ্ট—এ'র ফল ভাল হবে না' ইত্যাদি। সেই সঙ্গে ঐ পচা আমটাকেই চেটেপুটে দেখা যাক্‌—সাথে সাথে চোখ্‌ রাঙানিও চল্‌তে থাকুক। গান্ধীজী তখন পর্য্যন্ত এই মধ্যপন্থী দলে ছিলেন।

কিন্তু এর মধ্যে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেল। ১৯১৫ সালের ভারতরক্ষা আইনে যে সব বিপ্লবীকে বিনা বিচারে আটক করা হয়েছিল, যুদ্ধশেষে ভারতরক্ষা আইন বাতিল

হওয়াও তাঁদের মুক্তির সম্ভবনা দেখা দিল। কিন্তু ঐ আইন প্রত্যাহৃত হওয়ার আগেই, ১৯১৭ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখের একটি আদেশের বলে বিলাতের King's Bench Division এর বিচারপতি এস্. এ. টি রাউলাট সাহেবকে সভাপতি করে ভারত সরকার একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটিই 'সিডিসন কমিটি' বা "রাউলাট কমিটি" নামে খ্যাত। এই কমিটিতে দুইজন ভারতীয় সভ্য ছিলেন। একজন মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি দেওয়ান বাহাদুর কুমারস্বামী শাস্ত্রী, অপর জন কলিকাতার প্রভাসচন্দ্র মিত্র (পরবর্তীকালে ইনি স্যর পি. সি. মিটার হন)। উভয়েই সুপরিচিত 'রাজভক্ত'। কমিটির করণীয় কার্য্যের নির্দ্দেশ (terms of referrence) ছিল :—

1) to investigate and report on the nature and extent of the criminal conspiracies connected with the revolutionary movement in India.

2) to examine and the difficulties that have arisen in dealing with such conspiracies and to advise as to the legislation, if any, as necessary to enable the Government to deal effectively with them.[১৮] এই কমিটি তাঁদের রিপোর্টে বৈপ্লবিক কাজকর্ম দমনের জন্য বিশেষ ধরণের আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সুবিস্তৃত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। কমিটি বলেন, শুধু বঙ্গদেশে ১৯০৬ থেকে ১৯১৬ পর্য্যন্ত ২১০টি বৈপ্লবিক অপরাধ সংঘটিত হয়েছে—আর তার সাথে আরও ১০১টি এমন ঘটনা ঘটেছে যেখানে ঐ সকল অপরাধের (হত্যা বা ডাকাতির) প্রচেণ্টা হয়েছে কিন্তু সার্থক হয় নাই। ঐ সব ঘটনায় অন্ততঃপক্ষে ১০৩৮ জন বিপ্লবী লিপ্ত ছিলেন, পুলিশের কাগজপত্রে এই তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এদের মাত্র ৮৪ জনকে আদালতের

মাধ্যমে দণ্ডিত করা সম্ভব হয়েছে।[১৯] ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে কমিটি মন্তব্য করেছেন—

"Ten attempts were made to strike at the root of revolutionary conspiracies by means of prosecu tions directed against groups or branches In these prosecutions 192 persons were involved, 63 of whom were convicted".[২০]

বেশীর ভাগ বিপ্লবী যে জালের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যায় তার কারণ সম্পর্কে কমিটি মন্তব্য করেন ঃ—

"The main reason why it has not been possible by ordinary machinery of the criminal law to convict and imprison on a larger scale those guilty of outrages and so put down crime is simply want of sufficient evidence There were 91 dacoities since 1907 of which 16 were accompanied by murder, and from January 1st 1915 to June 30th 1916, there were 14 murders, 8 of them police officers, for which it has not been possible to put any one on trial." [২১]

বাংলাদেশের বিপ্লবীদের কর্মকুশলতা সম্পর্কে আলোচনা করে এবং তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে কমিটি মন্তব্য করেন—

"In Bengal the revolutionary movement (which began earlier, was more fully organised and worked in soil better prepared than in the Punjab) increased and flourished continuously from 1907

to 1916. Though Pulin Behari Das was deported in December 1908, he was released in 1910, and for the five or six years no extrajudicial method was employed * * * The murder on the 30th June 1916 of Deputy Superintendent Basanta Chatterjee marked the end of this policy"[২২]

অতঃপর গোয়েন্দা পুলিশের কুখ্যাত ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বসন্ত চ্যাটার্জির হত্যা সম্পর্কিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে।* সিডিসন কমিটি তাঁদের রিপোর্টে মন্তব্য করেন ঃ—

"This is the outrage of 30th June 1916 * * * finally demonstrating the necessity of recurse to exceptional measures".

পূর্বোক্ত মন্তব্য সমূহের বনিয়াদে কমিটি অনেকগুলি সুপারিশ করেন বৈপ্লবিক কাজকর্ম দমন করতে হলে বৈপ্লবিক অপরাধ সমূহের বিচারের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য আইন (Evidence Act) ও ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন সংশোধন করতে হবে। কমিটি বলেন এমন আইন করতে হবে যাতে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধকরণ সম্পর্কে যে সকল safeguard আছে তা বৈপ্লবিক অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হয়। 'কোন আসামীর স্বীকারোক্তি অন্যান্য সাক্ষীদের দ্বারা সমর্থিত (corroborative) না তা অপর আসামীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে গ্রাহ্য হবে না'—

* ৩০. ৬. ১৯১৬ তারিখে বসন্ত চ্যাটার্জী হত্যার বিবরণ Freedom struggle and Anushilan Samiti পুস্তকের প্রথম খণ্ডে ১২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। এর আগেও ওকে হত্যা করবার জন্য দুইবার চেষ্টা করা হয়। তার বিবরণ নলিনী কিশোর গুহের "বাংলায় বিপ্লববাদ" পুস্তকের ১০৬ পৃষ্ঠায় আছে।

এই মর্মে যে আইন আছে, সেটাও বদ্‌লাতে হবে (অর্থাৎ এমন আইন করতে হবে যে কোন একজন স্বীকারোক্তি করলেই—সেটা অন্য সাক্ষ্যের দ্বারা হোক্ বা না হোক্—বৈপ্লবিক অপরাধের ক্ষেত্রে ঐ একজনের স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করে বাকী সকলকে সাজা দেওয়া যাবে। সিডিসন কমিটি "Emergency provisions-(preventive)" শিরোনামায় আরও কতকগুলি সুপারিশ করেন। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ছিল এই যে ১৯১৫ সালের ভারতরক্ষা আইনে শুধু সরকারের খেয়ালখুসী অনুসারে যে কোন নাগরিককে বিনা বিচারে আটক রাখার যে ক্ষমতা সরকারের উপর অর্পিত হয়েছিল, ভারতরক্ষা আইন প্রত্যাহারের পরেও যাতে সেই ক্ষমতা (সামান্য কিছু অদলবদল সহকারে) সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে, সেইরূপ একটি স্থায়ী আইন বিধিবদ্ধ করবার সুপারিশ। ১৯১৯ সালের ১৯ শে জানুয়ারী রাউলাট কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে অস্বাভাবিক তৎপরতার সাথে ঐ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী (অর্থাৎ মাত্র ১৮ দিন ব্যবধানে), কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার উইলিয়াম ভিন্‌সেণ্ট্ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় দুটি আইনের খসড়া (Bill) উত্থাপন করেন। এর একটি Bill-এ ভারতরক্ষা আইন প্রত্যাহারের পর কতকগুলি সাময়িক বিধিব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব ছিল। অপরটিতে বিনা-বিচারে যে কোন নাগরিককে আটক রাখার ক্ষমতা সরকারের উপরে ন্যস্ত করে এবং বৈপ্লবিক আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট মোকর্দ্দমাগুলির বিচারের ব্যাপারে কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা চালু করে একটি স্থায়ী আইন প্রবর্তনের প্রস্তাব ছিল। তখনকার দিনের সরকারপক্ষের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পন্ন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় দুই সপ্তাহের মধ্যেই ঐ বহুনিন্দিত Bill দুটি পাশ হয়ে গেল।

এই রাউলাট আইন গান্ধীজীর জীবনের ও তাঁর রাজনীতির ধারাবাহিকতার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ turning point. গান্ধীজী

দক্ষিণ আফ্রিকার অত্যাচারক্লিষ্ট ভারতীয়দের জন্য মানবিক অধিকার অর্জনের অসমসাহসিক সংগ্রাম করে ভারতবাসীর কাছে "দরিদ্রের বন্ধু" বা "friend of the poor" নামে পরিচিতি লাভ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় যতদিন বাস করেছেন ততদিন ভারতবর্ষের রাজনীতির সঙ্গে তাঁর কোন প্রত্যক্ষ যোগসূত্র ছিল না। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি শ্রীমতী আনি বেসান্তের সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত কলিকাতা কংগ্রেসে যোগদান করেন তখনও তিনি 'friend of the poor' হিসাবেই অভিনন্দিত হয়েছিলেন। তার পর থেকে কংগ্রেস রাজনীতিতে তিনি ছিলেন মধ্যপন্থী। ১৯১৮ সালের কংগ্রেসেও তিনি মধ্যপন্থী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কিন্তু রাউলাট আইন প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই তাঁর রাজনৈতিক মানসের গুরুতর পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। Rowlatt Bill দুটি আইনে পরিণত হওয়ার পূর্বেই ঐ প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে গান্ধীজী গর্জে উঠলেন। তিনি ঘোষণা করলেন Bill দুটি আইনে পরিণত হলে তিনি ভারতব্যাপী সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করবেন। এই ঘোষণার পরেই তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ভ্রমণ করে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন নেতাদের সাথে আলাপ আলোচনা করেন এবং প্রায় সর্বত্র তিনি উৎসাহজনক জনসমর্থন লাভ করেন। ১৮ই মার্চ তারিখে তিনি একটি 'শপথ পত্র' (pledge) প্রকাশ করেন। ঐ শপথপত্রে কালো আইন দুটিকে "unjust, subversive of the principles of liberty and justice and destructive of elementary rights of individual" বলে বর্ণনা করা হয় এবং শেষাংশে এই শপথবাক্য থাকে যে—"We solemnly affirm that in the event of these bills becoming Law and until they are withdrawn we shall refuse civilly to obey these laws and such other laws as a Committee to be hereafter appointed may think fit … "

পূর্বোক্ত দুইটি কালো আইনের প্রতিবাদে গান্ধীজী ১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল ভারতব্যাপী হরতালের ডাক দেন। সারা ভারতবর্ষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এই বিক্ষোভ উপলক্ষ করে পাঞ্জাব প্রদেশের স্থা.ন স্থানে কিছু কিছু হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে এবং সেই অজুহাতে সরকারী দমননীতিও চণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করে। ১০ই এপ্রিল পাঞ্জাবের সর্বজন শ্রদ্ধেয় কংগ্রেস নেতা ডাঃ সত্যপাল ও ডাঃ সফিউদ্দিন কিচ্‌লুকে অমৃতসরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর বাংলোয় ডেকে নিয়ে গিয়ে সেখানে থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করে গোপনে কারাগারে পাঠিয়ে দেন। জনমানস আগে থেকেই ক্ষোভে ক্রোধে জলন্ত চুল্লীর মত উত্তপ্ত হয়েছিল। নাগরিকেরা জান্‌তে চাইলেন তাঁদের শ্রদ্ধেয় নেতৃদ্বয়কে কোথায় পাঠানো হয়েছে। কারণ অমৃতসর জেলে খোঁজ নিয়ে জানা যায় সেখানে তাঁরা নেই। নেতৃদ্বয়কে কোথায় পাঠানো হয়েছে তা প্রকাশ করতে সরকার সম্মত হলেন না। তার ফলে একদল উত্তেজিত মানুষ নেতৃদ্বয়ের আটকের স্থানের ঠিকানা প্রকাশের দাবী নিয়ে মিছিল করে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলোর দিকে যাচ্ছিল—সামরিক পাহারাদারগণ শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর গুলিবর্ষণ করে—এতে মিছিলকারীদের মধ্যে কিছু লোক হতাহত হয় (তখন পর্য্যন্ত সভা কিংবা মিছিল নিষিদ্ধ করে কোন আদেশ প্রচারিত হয় নাই) শান্তিপূর্ণ নাগরিকদের অকারণ প্রাণনাশ জনতার ক্রোধাগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ করল—ওরা সঙ্গীদের মৃতদেহগুলি একটি বাজারের মধ্যে সাজিয়ে রেখে বিক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে। ঐ ঘটনায় যারা আহত হয়েছিল, তাদেরকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানকার জনৈকা শ্বেতাঙ্গিনী ডাক্তার তাদের চিকিৎসা করতে অস্বীকার করেন ও তর্জন করে বলেন "তোমরা স্বদেশী-ওয়ালা, চিকিৎসার জন্য ইংরেজের হাসপাতালে এসেছ কেন?

গান্ধীর কাছে যাও "। সাধারণ মানুষের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ে। মরীয়া হয়ে তারা প্রত্যাঘাতের পথে পা বাড়ায়। অমৃতসর, গুজরানওয়ালা, কাসুর, প্রভৃতি জেলায় জনতা ও প্রশাসনের পারস্পরিক আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ পাল্লা দিয়ে চলতে থাকে। এতে ক্ষিপ্ত জনতার হাতে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ প্রাণ হারায়।

১০ই এপ্রিল তারিখেই কুখ্যাত জেনারেল ডায়ারকে অমৃতসরের 'সামরিক প্রশাসক' (Military Administrator পদে নিয়োগ করা হয়—যদিও ১৫ই এপ্রিলের পূর্বে সামরিক আইন জারী করা হয় নাই।

১৩ই এপ্রিল ছিল হিন্দু বছরের প্রথম দিন। অমৃতসরে প্রতিবছর ঐ দিনটিতে আড়ম্বরপূর্ণ বৈশাখী মেলা হত। মেলার মাঠের পাশেই ছিল একটা চতুর্দ্দিকে প্রাচীরঘেরা মাঠ— (হয়তো পূর্বে কখনও ওখানে বাগান ছিল)—নাম জালিয়ানওয়ালা 'বাগ'। দূর দূরান্তরের গ্রামগঞ্জ থেকে নারী পুরুষ বালক-বৃদ্ধ-যুবক-যুবতী উৎসবের আমোদে মত্ত হয়ে মেলায় এসেছে। বেচাকেনা, হৈহুল্লোড়, নাচ, গান, বাজীকরের খেলা—এসব নিয়ে মেলা সরগরম। এমন সময় দেখা গেল পাশে জালিয়ানওয়ালাবাগে একটি ব্যক্তি বক্তৃতা করছে। (পরে জানা যায় ঐ ব্যক্তির নাম ছিল হংসরাজ এবং সে ছিল পুলিশের গুপ্তচর)। তখন পাঞ্জাবে এক উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থা চলছে। স্বদেশী সভা সম্পর্কে সাধারণের মনে প্রচণ্ড আগ্রহ। অতএব মেলার মানুষ দলে দলে জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রাচীরঘেরা মাঠে প্রবেশ করলো কেউবা বক্তৃতা শ্রবণের আকর্ষণে—কেউবা মজা দেখতে। চারিদিকে প্রাচীর ঘেরা জায়গা—তার একটি মাত্র সঙ্কীর্ণ প্রবেশ পথ। জনসভা নিষিদ্ধ করে কোন সরকারী আদেশ প্রচারিত হয়েছে—এমন সংবাদ তখন পর্য্যন্ত কারও কর্ণগোচর হয় নাই (পরে সরকারপক্ষ থেকে বলা হয় যে ঐ দিন সকালে অমৃতসরের কোন কোন এলাকায় নাকি ঢোল সহরতের দ্বারা ঐ রকম

ঘোষণা প্রচার করা হয়েছিল)।

প্রায় ২০000 লোক সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনছে বা মজা দেখছে। অকস্মাৎ নরপিশাচ ডায়ার ৫০ জন সশস্ত্র গোরা সৈন্য ও ১০০ সশস্ত্র দেশী সৈন্য নিয়ে পূর্বোক্ত সঙ্কীর্ণ প্রবেশপথ অবরোধ করে দাঁড়ালেন। তাঁর আদেশে বৃষ্টিধারার মত মারনাস্ত্রের গুলী বর্ষিত হতে লাগলো। হতভাগ্য মানুষদের পালানোর পথ ছিল না কারণ পূর্বোক্ত সঙ্কীর্ণ প্রবেশ পথই ছিল একমাত্র নির্গমের পথ। সেই পথ অবরোধ করে ডায়ার ও তার ১৫০ জন সিপাই গুলীবর্ষণ করছে। ১৬০০ রাউণ্ড গুলী ছোঁড়া হয়। তার বেশী গুলি ছিল না। অতএব অগণিত নিরপরাধের প্রাণহরণ করে এবং আরও বেশী লোককে জখম করে, অঙ্গহীন করে—বীরদর্পে ডায়ার তাঁর সেনানিবাসে ফিরে গেলেন। সরকারী রিপোর্ট অনুসারে নিহত হয়েছিল ৪০০ জন এবং আহতের সংখ্যা ছিল প্রায় ২০০০। ,বেসরকরী তদন্তে জানা গেছে সরকারপ্রদত্ত হতাহতের সংখ্যা তার প্রকৃত সংখ্যার একতৃতীয়াংশও নয়। পরে বিলাতে হাণ্টার কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দান কালে ডায়ার দম্ভভরে বলেন—"আমি ওদের শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম। আমার গুলী ফুরিয়ে গিয়েছিল—তাই থামাতে হয়েছিল। তা না হলে আরও গুলী চালাতাম।"

এর পর চলে সারা পাঞ্জাব জুড়ে পৈশাচিক তাণ্ডব। শাসক-দের দ্বারা শাসিতের উপরে অনুষ্ঠিত সে ভয়ঙ্কর নারকীয় পৈশাচিক-তার বর্ণনা এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। সভ্য পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুল্য নজির বেশী নেই।* জালিয়ানওয়ালাবাগের নারকিয়

* পূর্বোক্ত পৈশাচিকতার পূর্ণ বিবরণ জানতে হলে আগ্রহী পাঠক "Report of the Congress Enquiry Committee on Punjab Disturbances—দুই খণ্ড, ও B. G Horniman প্রণীত "Amritsar and our duty to India" নামক পুস্তক পাঠ করতে পারেন।

ঘটনা প্রকৃতপক্ষে একটি সুপরিকল্পিত পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড। কংগ্রেস বা অন্য কোন সংস্থা ঐ দিন ওখানে কোন সভা ডাকে নাই। ইংরেজরা গুপ্তচর নিয়োগ করে তার মাধ্যমে একটি মাত্র সঙ্কীর্ণ প্রবেশপথযুক্ত প্রাচীর ঘেরা মাঠে লোক জড় করে। সকালে নিষেধাজ্ঞা প্রচারের কৈফিয়ৎ একটি ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছু নয়। যদি ধবেও নেওয়া যায় যে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে একটা জনসভা হচ্ছিল—তা হ'লেই বা সেখানে সৈন্যবাহিনীসহ স্বয়ং ডায়ার উপস্থিত হবে কেন ? সভা যে সশস্ত্র ছিল এমন 'কোন দাবী সরকারপক্ষ থেকে করা হয় নাই। সুতরাং সেই জনসভা ছত্রভঙ্গ করতে সাধারণ পুলিশবাহিনী নিয়োগ না করে দেড়শত সশস্ত্র সৈনিক নিয়ে একজন জেনারেলকে যেতে হবে কেন ? নিরস্ত্র জনসমাবেশ বেআইনী হলেও সেখানে জনতার দ্বারা যদি সাধারণ নাগরিকের জীবন বা সম্পত্তি বিনষ্ট হওয়ার মত পরিস্থিতির উদ্ভব না হয় তা হলে ঐরূপ বেআইনী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার আইনসিদ্ধ নয়। তাছাড়া বেআইনী জনতা ছত্রভঙ্গ করবার কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়মকানুন আছে। প্রথমে সভার লোকদেরকে বলতে হবে—'এ সভা বেআইনী—তোমরা চলে যাও। তারপর তাদের চলে যাওয়ার সময় দিতে হবে। তরেপরেও যদি তারা স্থানত্যাগ না করে তা হলে বলপ্রয়োগের আগে পুনরায় জনতাকে সতর্ক করে দিতে হবে—বলতে হবে—যদি এতক্ষণের মধ্যে তোমরা স্থানত্যাগ না কর তবে তোমাদের উপর গুলি চালানো হবে।' জালিয়ানওয়ালাবাগে এই সকল নিয়মের কোন নিয়মই পালন করা হয় নাই। হাণ্টার কমিশন যখন প্রশ্ন করেন—"আপনি জনতাকে সতর্কীকরণের পর তাদের সরে যাওয়ার জন্য কতটা সময় দিয়েছিলেন ?" তখন ডায়ার সদম্ভে জবাব দেয়—"আমি ওদের দুই মিনিট সময় দিয়েছিলাম।" ২০০০০ লোকের স্থানত্যাগের জন্য দুই মিনিট সময় !! আর স্বয়ং দেড়শত সশস্ত্র সৈনিক নিয়ে নির্গমের

একমাত্র পথকে রুদ্ধ করে রাখা ॥ ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে জালিয়ানওয়ালাবাগে ও পাঞ্জাবের অন্যান্য স্থানে নরঘাতন-নিষ্ঠুরতার যে নারকীয় তাণ্ডব দৃশ্যমান হয়, তা চিরকালের ইতিহাসে ইংরেজ জাতির একটি দুরপনেয় কলঙ্করূপে চিহ্নিত রয়েছে ও থাকবে। পক্ষান্তরে, জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা ভারতবাসীর সংগ্রামের অগ্রগমনের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ গতি-পরিবর্তনের নির্দেশক কেন্দ্রবিন্দু—বা turning poin. জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্তপ্রবাহের মধ্য থেকেই ভারতে ইংরেজশাসনের কবরখোঁড়ার কাজ অবিশ্রান্তগতিতে এগিয়ে চলে। স্বাধীনতা সংগ্রামের পথরচনায় গুণগত পরিবর্তন (qualitative change) পরিদৃষ্ট হয়। নরমপন্থী রাজনীতিকদের prayer, petetion and protest এর ক্লীব রাজনীতি আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়। ইংরাজীশিক্ষায় শিক্ষিত আন্দোলনবিলাসী উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বক্তৃতা-বিশারদ নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতা সংগ্রামের মঞ্চ (platform) থেকে চিরতরে নির্বাসিত হন। এমন কি 'প্যাট্রিয়ট' বলে তাঁদের যে সামান্য পরিচয় ছিল সেটাও মুছে যায়। অতঃপর 'লিবার‍্যাল পার্টি' নামক নূতন পার্টির ছত্রতলে এই ভূতপূর্ব 'প্যাট্রিয়ট' গণ ইংরজ-শাসনের পোষকতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতার পথ ধরে চলতে চলতে তাঁরা রাজনৈতিক আত্মবিলোপ সম্পন্ন করেন। 'দেশভক্ত' (patriot)-এর বদলে তাঁদের নূতন পরিচয় হয়—'রাজভক্ত' (loyalists)। কংগ্রেস-মঞ্চের যে সংগ্রাম ১৮৮৫ থেকে ১৯১৯ এর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত ছিল—মুষ্টিমেয় উকীল, ব্যারিষ্টার, জমিদার, ডাক্তার ও বৃহৎ-ব্যবসায়ীর সাম্বৎসরিক কণ্ঠকসরতের আসর মাত্র, তার চরিত্র পরিবর্ত্তিত হয়ে আপামর জনসাধারণের সাথে তার সংযুক্তি ঘটে। এই mass-orientation of national liberation movement আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগামী পদক্ষেপ।

গান্ধীজী জনমানসের এই উদ্বেল ও দুর্বার উত্তাপ-প্রবাহের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন। তিনি অহিংস অসহযোগের কর্মসূচী প্রকাশ করলেন। তার পক্ষে জনমত যাচাই করবার উদ্দেশ্যে ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করলেন। পরিণামে, ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে পাঞ্জাব কেশরী লাল লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্পেসাল কংগ্রেস 'অহিংস অসহযোগের' প্রস্তাব গৃহীত হল। তিনমাস পরে ঐ বছরের ডিসেম্বরে নাগপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে 'অহিংস অসহযোগ' (nonviolent-noncooperation) কর্মসূচী পুনরমোদিত (re-affirmed) হয়। নাগপুর অধিবেশনে কংগ্রেসের অনুষ্ঠানপত্র ও সাংগঠনিক বিধিসমূহেরও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটলো। এতদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অনুষ্ঠানপত্রে তার ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল—"attainment of responsible Government for India by constitutional means। নাগপুর অধিবেশনে সেটা বদল করে হ'ল—The object of the Indian National Congress is the attainment of Swaraj by peaceful and legitimate means." স্বরাজ শব্দের যদিও কোন সংজ্ঞা নির্দেশ করা হ'ল না—তথাপি অধিকাংশের কাছেই 'স্বরাজ' শব্দটি "পূর্ণ স্বাধীনতা" অর্থেই গৃহীত হল। এবং constitutional শব্দের পরিবর্তে peaceful and legitimate শব্দগুলি ব্যবহৃত হওয়ার অর্থ দাঁড়ালো এই যে কংগ্রেসের আন্দোলন প্রচলিত আইনের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। "Legitimate" ও 'legal' এ দুটি শব্দের অর্থগত পার্থক্য অনেক। 'Legitimate' অর্থ—ন্যায়সঙ্গত'। কোন কার্য্যক্রম 'আইন সঙ্গত' না হয়েও 'ন্যায় সঙ্গত' হতে পারে।

কংগ্রেসের গঠন বিধিরও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হল। এতদিন পর্য্যন্ত বিভিন্ন Bar Association, Chamber of Commerce,

Merchants' Association প্রভৃতি সংস্থার মাধ্যমে কংগ্রেসের প্রতিনিধি (delegate) নির্বাচিত হত। নাগপুর কংগ্রেসে স্থির হ'ল যে কোন প্রাপ্তবয়স্ক ভারতবাসী পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যপত্রে স্বাক্ষর দান করে বাৰ্ষিক চার আনা চাঁদা দিলেই কংগ্রেসের প্রাথমিক সভ্য হতে পারবেন, এবং গ্রামীন, মহকুমা, জেলা ও প্রাদেশিক— সর্বস্তরের সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হবে প্রাথমিক সদস্যদের ভোটের দ্বারা। কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচনও হবে ঐ একই প্রকারে। অর্থাৎ কংগ্রেসের সংগঠনগুলি শহরবাসী কতিপয় উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 'বাবু' দের ঘরোয়া সংগঠন রইল না। সর্বস্তরের সাংগঠনিক সংস্থায় গ্রামীন কর্মীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্মধারার যে গুণগত পরিবর্তন ঘটলো ১৯২১ সাল থেকে—তার প্রমাণ পাওয়া গেল ঐ সালে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের অভূতপূর্ব ব্যাপকতা ও শক্তির জোয়ারের মধ্য দিয়ে। সে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন—হিমালয় থেমে কুমারিকা পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত সেই প্রচণ্ড জনজাগরণের প্লাবন যাঁরা চোখে দেখেন নাই তাঁদের পক্ষে প্লাবনের অপরিমেয়তা সম্পর্কে ধারণা করা কঠিন। তরঙ্গের তরঙ্গ এসে সমগ্র ভারতবর্ষকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেল। অসহযোগ আন্দোলনই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম দৃপ্ত গণ-আন্দোলন যার বিস্তৃতি ভারতবর্ষের সমগ্র অঞ্চলে এবং উচ্চ স্তরের উকীল ব্যারিষ্টার থেকে শুরু করে সহস্র সহস্র গ্রামীন কৃষক ও শ্রমজীবীকে স্বাধীনতা অর্জনের যুদ্ধক্ষেত্রে একত্রিত করতে পেরেছিল। ১৯২০ সালের পূর্ব পর্য্যন্ত স্বাধীনতাকর্মীদের ও জনসাধারণের মধ্যে যে যোগাযোগের ব্যবধান বর্তমান ছিল, অসহযোগ আন্দোলন সেই ব্যবধানকে ধুয়ে মুছে দিল। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিরূপতা এবং স্বাধীনতার আকাঙ্খা, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি মমত্ব অট্টালিকা থেকে জীর্ণ কুটীর সর্বত্র পৌঁছে গেল।

এই সময়ে বিশ্ব-রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি বিস্ময়কর ও অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। সে হল রাশিয়ার মহাবিপ্লব বা 'অক্টোবর রিভল্যুসন'। ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে মহাবিপ্লবী লেনিনের নেতৃত্বে বিশাল রুশ দেশের অত্যাচারিত নিরন্ন, শিক্ষাবঞ্চিত অর্দ্ধনগ্ন জনগণ দুর্বার আঘাতে শুধু যে সাম্রাজ্যবাদী চক্রের কুট-কৌশলী প্রভাব থেকে তাদের মাতৃভূমিকে মুক্ত করলো তাই নয়, যুগযুগান্তপ্রোথিত শোষণজীবী রাষ্ট্রিক ও সামাজিক কাঠামোকে চূর্ণবিচূর্ণ করে প্রতিষ্ঠিত করলো সবহারার একনায়কত্ব। সমগ্র বিশ্ব কতকটা ভীতিবিহ্বল, কতকটা বিস্ময়বিমুক্ত ও কতকটা প্রত্যাশাবিলোড়িত চিত্তে চেয়ে দেখলো শোষিত মানুষের একতার দুর্গ গড়ে তুলবার। মানব সমাজের ও মানব সভ্যতার রূপান্তর সাধনের বিস্ময়কর দৃপ্ত প্রয়াস।

ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার ইতিহাস লিখতে বসে এই দীর্ঘ ভূমিকা প্রদান অনেকের কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। কিন্তু প্রথম পর্য্যায়ের বৈপ্লবিক সংগ্রামের সমাপ্তি ও দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সংগ্রামের সুরু—এর মধ্যবর্তী কালের—অর্থাৎ ১৯১৮ থেকে ১৯২৩—এই মধ্যবর্তী সময়ের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান না থাকলে দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈপ্লবিক সংগ্রামের গতি-প্রকৃতিকে যথাযথ রূপে অনুধাবন করা সম্ভবপর হয় না। সেই জন্যই দীর্ঘ ভূমিকার প্রয়োজন হল।

১৯২০ সালের শেষে, অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা কালে কারারুদ্ধ ও অন্তরীণাবদ্ধ বিপ্লবী নেতা ও কর্মীদের অনেকেই মুক্তি-লাভ করেন। তখন তাঁদের সামনে দেখা দিল এক অপ্রত্যাশিত নূতন সমস্যা। গান্ধীজীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণসংগ্রামের উন্মাদনায় তখন ভারতের জনসাধারণ প্রমত্ত হয়ে উঠেছে। বিপ্লবীরা কি করবেন? রাজনীতির তত্ত্ব বা লক্ষ্য হিসাবে "অহিংসাকে" গ্রহণ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। মত

ও পথের যে ধারণা ও বিশ্বাসের বেদীতে তাঁদের অন্তর এতদিন লালিত হয়েছে, তার কাছে গান্ধীজীর 'অহিংসাধর্ম' (Creed of nonviolence) যে গ্রহণযোগ্য হবে না, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু গান্ধীজী 'অহিংসা'র সাথে ব্যাপক গণসংগ্রামের কর্মসূচীকে যুক্ত করে যে দেশব্যাপী জনজাগরণ উদ্বোধিত করেছিলেন, সেই জনজাগরণকে উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য করা ও বিপ্লবীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং এই সমস্যা নিয়ে বিপ্লবীদের মধ্যে কিছুদিন ধরে আলোচনা ও বিতর্ক চললো। 'যুগান্তর' দলের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন 'গ্রুপ' বা গোষ্ঠী প্রত্যেকেই অসহযোগ আন্দোলনে যোগ-দানের অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু অনুশীলন সর্বভার-তীয় পার্টি—তাঁদের পক্ষে ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব ছিল না। অনুশীলন সমিতির তৎকালীন নেতা পুলিনবিহারী দাস অহিংস সংগ্রামে যোগদানের বিরোধী ছিলেন। গান্ধীজীর মনে যেমন "অহিংসা"র অনুকূলে বেশ খানিকটা গোঁড়ামি ছিল—পুলিনবাবুর মনেও তদ্রূপ 'অহিংসা"র বিরুদ্ধে প্রচণ্ড গোঁড়ামি ছিল। কিন্তু পুলিনবাবুর পরবর্তী স্তরে সমিতিতে যাঁরা নেতৃস্থানীয় ছিলেন তাঁদের সাথে পুলিনবাবুর মত পার্থক্য ঘটলো। তাঁরা দৃঢ়ভাবে অভিমত প্রকাশ করলেন যে দেশব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ-জাগরণ থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখলে বিপ্লবীরা ভারতের জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন। তাঁদের অপর বক্তব্য ছিল যে ব্যাপক সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের উচ্ছেদ সাধন করতে হলে জনসাধারণের সাথে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন অবশ্যই প্রয়োজন হবে—গান্ধীজী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন বিপ্লবীদের সামনে সেই সুযোগ এনে দিয়েছে। এতদিন সেবাকার্য্য ছাড়া জনসাধারণের সাথে ঘনিষ্ঠতা অর্জনের ব্যাপারে বিপ্লবীদের সামনে আর কোন পথ খোলা ছিল না। এখন সাম্রাজ্য-বাদবিরোধী প্রকাশ্য সংগ্রামের মাধ্যমে তাঁরা অনায়াসে জনসাধা-

রণের মধ্যে নিজেদেরকে ছড়িয়ে দিতে পারবেন। স্কুল কলেজ পরিত্যাগ করে যে সহস্র সহস্র ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেবে তাদের মধ্য থেকে উপযুক্ত লোক বাছাই করে তাদেরকে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত করে বিপ্লবপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধি করতে পারবেন। জাতীয় বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁরা নিজেদের কর্মকেন্দ্ররূপে ব্যবহার করতে পারবেন। সবচেয়ে বড় কথা হল—এই আন্দোলন জনমানস থেকে ইংরেজের প্রতি আনুগত্যের শেষ শিকড় উৎপাটিত করবার (to cut out the last roots of loyalty from the mass mind) সুযোগ এনে দিয়েছে। এ সুযোগ পরিত্যাগ করা নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে। পুলিনবাবুকে হার মানতে হল। তিনি বললেন—তিনি নিজে তাঁর বিবেক বিসর্জন দিতে প্রস্তুত নন—তবে যারা তাঁর বিরুদ্ধেমত পোষণ করে তারা আন্দোলনে যোগদান করতে চাইলে তিনি বাঁধা দেবেন না। এর ফলে অনুশীলন সমিতির নেতা ও কর্মিগণ ব্যাপক সংখ্যায় অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। ঢাকা, ফরিদপুর, রাজসাহী, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, শ্রীহট্ট, নদীয়া মুর্শিদাবাদ রঙ্গপুর দিনাজপুর প্রভৃতি জেলারা অনুশীলনের সুপরিচিত নেতারা তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় আন্দোলনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সকল জেলায় সুপরিচিত অনুশীলনপন্থীরা জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক বা সহকারী সম্পাদক পদে বৃত হন। বেশীর ভাগ জেলা কংগ্রেস কমিটিতে বিপ্লবীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় সর্বত্র জাতীয় বিদ্যালয়গুলি বিপ্লবীদের পরিচালনাধীনে চলে আসে।

এতদিন জাতির স্বাধিকার লাভের আন্দোলন 'নিয়মতান্ত্রিক পথ' (constitutional path) ও বৈপ্লবিকপথ'' (revolutionary path) এই দুই পরপরবিচ্ছিন্ন ধারায় অগ্রসর হচ্ছিল। গান্ধীজীর দ্বারা প্রবর্তিত 'অহিংস অসহযোগের' কর্মসূচীর মধ্যেই এমন কিছু ছিল 'নিয়মতান্ত্রিক মানস' ও 'বৈপ্লবিক মানস' এই উভয়কেই

কিয়ৎপরিমাণে সন্তুষ্ট করতে পারে। 'নন্ ভায়োলেন্স' নিয়মতান্ত্রিক মানসের কাছে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য এবং নিয়মতান্ত্রিক মানসের কাছে, তাৎকালিক অবস্থায়, তার আবেদন ছিল যথেষ্ট প্রবল। অন্যদিকে—'নন্-কো-অপারেশন' (যার প্রত্যক্ষ কর্মসূচী ছিল পঞ্চবিধ বয়কট্, পিকেটিং, আইন-অমান্য প্রভৃতি—অর্থাৎ (fighting part of the non-co-opeation programme) বৈপ্লবিক মানসকে বহুল পরিমাণে আকর্ষণ করতে পেরেছিল। 'অহিংস অসহযোগ' আন্দোলন যে সারাভারতে অজ্ঞাতপূর্ব সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনবিক্ষোভের প্লাবন সৃষ্টি করতে পেরেছিল' গান্ধীজীর সুকৌশলী কর্মসূচী-পরিকল্পনা তার অন্যতম কারণ। কমিণ্টার্ণের দ্বিতীয় কংগ্রেসে মহাবিপ্লবী লেনিনও তাঁর ঔপনিবেসিক থিসিসে এই ভারতব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণআন্দোলকে 'বৈপ্লবিক' বলে বর্ণনা করেছিলেন।

একটি প্রচলিত গল্প আছে যে বিপ্লবীদের সাথে গান্ধীজীর এমন একটি 'চুক্তি' হয়েছিল যে বিপ্লবীরা একবছরের জন্য বৈপ্লবিক কর্মধারা স্থগিত রাখবেন। ঐরূপ কোন 'চুক্তি'র ব্যাপারে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। সুতরাং 'চুক্তি'র গল্পটি গল্পমাত্র। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়ীতে পুলিনবাবুর সাথে গান্ধীজীর পর পর তিনদিন ধ'রে আলোচনা হয়।[২৪] সে আলোচনা ব্যর্থ হয়। কারণ পুলিনবাবু কোন অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাস করেন না—একথা স্পষ্টভাবেই গান্ধীজীকে জানিয়ে দিয়ে আসেন। একথা সত্য যে গান্ধীজী বিপ্লবীদের অনুরোধ করেন যে তাঁরা বৈপ্লবিক কমপন্থা কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখুন। কিন্তু 'একবছরের চুক্তি' একটা কথার কথা মাত্র।

দ্বিতীয় আলিপুর ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা—১৯২৩

১৯১৮ সালের পরে ১৯২৩ সালের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত দেশে বৈপ্লবিক কাজকর্ম প্রায় বন্ধ ছিল। ১৯২২ সালের ২২শে জুন

ময়মনসিংহ জেলার সারাচর গ্রামে বিপিনচন্দ্র সাহা নামক এক ব্যক্তি নিহত হন। গোয়েন্দা রিপোর্টে এই ঘটনাকে 'সন্ত্রাসবাদী কার্য্য' বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে নিহত ব্যক্তি পুলিশের গুপ্তচর ছিল এই সন্দেহের বশবর্তী হয়ে বিপ্লবীরা তাকে হত্যা করে। যদি ঐ বিবরণকে সত্য বলে ধরে নেওয়া যায় তথাপি ঐ কার্য্যের সাথে কোন সংগঠিত বিপ্লবীদলের কোন সম্পর্ক ছিল এরূপ প্রমাণ নাই। ঘটনাটি নিতান্তই একটি বিচ্ছিন্ন এবং দলীয় সম্পর্কশূণ্য ঘটনা।

কিন্তু ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত চৌরিচৌরা গ্রামে অনুষ্ঠিত একটি অস্বাভাবিক হিংসাত্মক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজীর নির্দ্দেশে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটি গান্ধীজীর পরিকল্পিত আসন্ন আইন-অমান্য কর্মসূচী স্থগিত রাখবার ও কেবলমাত্র বিদেশী বস্ত্রের ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত ব্যাপার ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে পিকেটিং, নিষিদ্ধ জনসভা ও শোভাযাত্রাদিতে অংশ গ্রহণ ইত্যাদি—অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রায় সর্ববিধ কর্মসূচী স্থগিতকরণের অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তার ফলে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানকারী সাধারণ কর্মীগণের এবং এমন কি তৎকালে কারারুদ্ধ মতিলাল নেহেরু ও লালা লাজপত রায় প্রমুখ উচ্চস্তরের নেতৃবৃন্দের মনে বিক্ষোভ ও হতাশা দেখা দেয়। এই অবস্থায় বিপ্লবীরাও তাঁদের ভবিষ্যৎ কার্য্যক্রম সম্পর্কে চিন্তাভাবনা সুরু করেন।

একমাত্র ১৯১৫ সালে রাসবিহারী বসু কর্তৃক পরিকল্পিত সর্বভারতীয় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজনকে বাদ দিলে বৈপ্লবিক কর্মধারা ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত দুষ্ট সরকারী কর্মচারী ও গুপ্তচরদের হত্যা, রাজনৈতিক ডাকাতি এবং বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ—এই ত্রিবিধ কর্মের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। বিপ্লবীরা সকলেই জানতেন যে এই কর্মধারা বৈপ্লবিক লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রাথমিক কর্মসূচী মাত্র।

এই প্রাথমিক স্তর থেকে বৈপ্লবিক সংগ্রামকে উন্নততর স্তরে নিয়ে যেতে হবে। অনুশীলনের নেতৃবৃন্দ তাঁদের আন্দোলনকে পরবর্তী স্তরে উন্নীত করবার পন্থা ও উপায় সম্পর্কে ১৯১৮/১৯ সাল থেকেই চিন্তাভাবনা সুরু করে দিয়েছিলেন। অপরদিকে অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাবও তাঁদের অনেকের অন্তরকে স্পর্শ করেছিল। এই অবস্থায় অনুশীলন নেতৃবৃন্দ অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত হওয়ার সাথে সাথে পুরাতন ধারার sporadic violence-এর কর্মসূচী পুনরায় সুরু করবার পক্ষপাতী ছিলেন না। যুগান্তরদলের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীও তাঁদের পরবর্তী কর্মধারা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করছিলেন। কিন্তু তাঁদের চিন্তা ভাবনা বিশেষ কোন রূপ গ্রহণ করবার পূর্বেই তাঁদের ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত কলিকাতার শ্রী সন্তোষ মিত্রের নেতৃত্বাধীন ক্ষুদ্র একটি উপদল পুরাতন প্রোগ্রাম নিয়েই কাজ সুরু করে দিলেন। সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম গ্রুপের কোন অংশও একই সময়ে পুরাতন পথে নূতন ভাবে উদ্যম নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কারণ ১৯২৩ সালে ২২শে মার্চ চট্টগ্রাম জেলার পারাইকোরা গ্রামে এবং ১৪ই ডিসেম্বর ঐ জেলার বটতলি গ্রামে ডাকাতি হয়। গোয়েন্দা বিভাগ এই দুটি ডাকাতিকে "সন্ত্রাসবাদী" কার্য্যক্রম বলে উল্লেখ করেছেন।

ঐ সালের ১৫ই মে তারিখে হাওড়া জেলার কোণা গ্রামে একটি ডাকাতি হয় এবং সেখানে দুইজন গ্রামবাসী নিহত হয়। এই ডাকাতিতে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল। এর নয়দিন পরে—অর্থাৎ ২৪শে মে তারিখে চারজন সশস্ত্র যুবক কলিকাতার উল্টাডিঙ্গি ডাকঘর লুন্ঠন করে। ৮ই জুন অনুরূপ চারজন যুবক শঙ্কর ঘোষ লেনে ডাকাতির চেষ্টা করে—কিন্তু তাদের প্রয়াস ব্যর্থ হয়। তারপর ১৯শে জুলাই গোয়ালপাড়া লেনে চার জন যুবক কর্তৃক একটি সশস্ত্র ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয় এবং এগারো দিন পরে ৩০শে জুলাই তিনজন সশস্ত্র যুবক গড়পাড় রোডে একটি ডাকাতি করে। ৮ই আগষ্ট

শাঁখারীটোলা ডাকঘরে সশস্ত্র ডাকাতি হয় এবং বাঁধাপ্রদানের চেষ্টা করতে গিয়ে পোষ্ট-মাষ্টার নিহত হন। হাওড়া ও কলিকাতার এ সবগুলি ডাকাতিই সন্তোষ মিত্র কর্তৃক পরিচালিত উপদলের কার্য্য।

সন্তোষ বাবু নিজে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইংরাজীতে প্রথমশ্রেণীর অনার্স সহ বি. এ পাশ করেন। বিপ্লবী-জনোচিত গুণাবলীও তাঁর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

হাওড়া ও কলিকাতার ঐ ডাকাতিগুলিকে একত্রিত করে পুলিশ সন্তোষবাবু ও অপর ছয়জনের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা খাঁড়া করে। এই মোকর্দ্দমাই দ্বিতীয় আলিপুর ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা নামে পরিচিত লাভ করেছে। সেসন আদালত ঐ মোকর্দ্দমায় একমাত্র বরেন্দ্রনাথ ঘোষ ছাড়া অপর সকল আসামীকে মুক্তি দেন। বরেন্দ্র ঘোষের ফাঁসীর হুকুম হয়। পরে হাইকোর্টের বিচারপতি আশুতোষ মুখার্জি তাঁর প্রাণদণ্ড মকুব করে তাঁকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করেন।

দ্বিতীয় আলিপুর ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা সম্পর্কে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনস্থ ইনটেলিজেন্স ব্যুরো'র রিপোর্টে বলা হয়েছে ঃ- "The Jugantar group was the first to strike. In May 1923 they committed a dacoity with double murder at Kona near Howra; in the same month the Ultadingi post office was looted. The same gang committed a robbery with murder at Garpar Road on 30th July in which firearms were used. The murder of postmaster at Sankaritola followed. The investigation in this. produced full corroboration of the information already in possession of the government and showed that these outrages were all the

work of a particular group of the terrorist party. Seven members of this group were put on trial in Alipur conspiracy case, but many of the facts in possession of the Government could not be placed before the Court and they were eventually acquitted ; but Barendra Kumer Ghose was sentenced to death (though not executed) for the Sankaritola murder". সন্তোষ মিত্র আদালতের আদেশে মুক্তি পাওয়ার পর তাঁকে বিনা বিচারে আটক করা হয়। হিজলী বন্দীশালায় ১৯৩১ সালে চীফ হেড্‌ওয়ার্ডার যমুনা সিং-এর নেতৃত্বে কারাপ্রহরীগণ রাত্রির অন্ধকারে কারারুদ্ধ বন্দীদের উপরে গুলীবর্ষণ করে। সেই গুলিবর্ষনের ফলে সন্তোষ মিত্র ও তাঁর সহবন্দী তারকেশ্বর সেন নিহত হন।

দ্বিতীয় আলিপুর ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা বৈপ্লবিক সংগ্রামের দিক দিয়ে গুরুত্বহীন। দলের নেতৃবর্গ যখন নূতন পথের সন্ধানে ব্যাপৃত, যে সময়ে জনমানসে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ডাকাতি ও নরহত্যার কর্মসূচী সম্পর্কে বহুলপরিমাণে নিরূপতা বিরাজ করছিল, সেই সময়ে দলের বৃহত্তর পরিমণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সামান্য কয়েকজন লোক নিয়ে গঠিত একটি উপদলের পক্ষে গোটাকতক ডাকাতি এবং সেই ডাকাতি করতে গিয়ে প্রায় সর্বত্রই অবাঞ্ছিত নরহত্যা—একে রোম্যাণ্টিক দুঃসাহসপ্রবণতা (romantic adventurism) ছাড়া অপর কোন আখ্যা দেওয়া যায় না। ১৯০৮ সাল থেকে ১৯১০-১১—এই সময়ে অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে শুধু ডাকাতির জন্যই ডাকাতি করা হয়েছে। কিন্তু সেটা বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রাথমিক যুগের ব্যাপার। ১৯০৮/০৯ সালের বৈপ্লবিক স্তর ও ১৯২৩ সালের বৈপ্লবিক স্তর—এ দুইয়ের মধ্যে তফাৎ অনেক। ঐ অবাঞ্ছিত দুঃসাহসপ্রবণতার দ্বারা ঐ ক্ষুদ্র উপদলটি

বৈপ্লবিক সংগ্রামকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন। শাঁখারীটোলা মার্ডারের পরেই আমাদের শত্রুপক্ষ নূতন করে সমরসজ্জা সুরু করে। সেপ্টেম্বর মাসেই শত্রুপক্ষের হাত দিয়ে প্রথম প্রত্যাঘাত আসে। দিল্লীর স্পেসাল কংগ্রেসে যোগদানের পর বাংলার কংগ্রেস-ডেলিগেট-গণ যখন কলকাতায় ফিরছিলেন সেই সময় হাওড়া স্টেশনেই অনুশীলন ও যুগান্তরের উচ্চস্তরের নেতৃবৃন্দকে ১৯১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন অনুসারে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করা হয়। নরেন সেন ও প্রতুল গাঙ্গুলী আত্মগোপন করেন। হাওড়া স্টেসনে অন্যান্য বিপ্লবী নেতাদের সাথে অনুশীলনের রবীন্দ্রমোহন সেন ও রমেশ চৌধুরী গ্রেপ্তার হন। বৈপ্লবিক ধারার নূতন কমকৌশলের উদ্ভাবন ও তার রূপায়ণের প্রস্তুতির জন্য নেতাদের যে সময় পাওয়া উচিত ছিল, একটি ক্ষুদ্র উপদলের অসময়োচিত হঠকারিতার ফলে সেই সময় তাঁরা পেলেন না।

কিন্তু সন্তোষ মিত্র পূর্বোক্ত কার্য্যাবলীর মধ্যে রাজনৈতিক অবিবেচনার পরিচয় দিলে ও তিনি জীবন দিয়ে সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে গিয়েছেন। "হিজলী সুটিং"—এ সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনের মৃত্যুর রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। ঐ পৈশাচিক ঘটনার প্রতিবাদে সারা ভারতের কণ্ঠ গর্জে উঠল। এই ঘটনা শুধু বৈপ্লবিক আন্দোলনকেই নয়, দেশের সামগ্রিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের উপরে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে। ময়দানের লক্ষ লোকের প্রতিবাদ সভায় রবীন্দ্রনাথ, তাঁর শারীরিক অসুস্থতাকে অগ্রাহ্য করে, সশরীরে সেই সভায় উপস্থিত হয়ে সরকারী পৈশাচিকতাকে ধিক্কার জানিয়ে যে সংক্ষিপ্ত-ভাষণ দিয়েছিলেন তার স্পষ্ট এবং সুকঠোর ভাষা নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামকে যুগ যুগ ধরে উৎসাহ যোগাবে।

কাকোরী ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা—১৯২৪

এই মোকর্দ্দমাটি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই মোকর্দ্দমার বিবরণ লিপিবদ্ধ করবার

আগে এর পটভূমি সম্পর্কে দু-চার কথা বলতে হবে।

অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসবার পরে অনুশীলন নেতৃবর্গ sporadic violence এর পথে আর বেশী অগ্রসর না হয়ে ব্যাপক গণবিদ্রোহের প্রস্তুতিপর্ব হিসাবে তাঁদের সাংগঠনিক বিস্তৃতি ও সংগঠনের দৃঢ়ীকরণের দিকেই বেশী মনোযোগ দেওয়া যুক্তি যুক্ত বলে বিবেচনা করতে থাকেন। বস্তুতঃ sporadic violence এর বিরুদ্ধে নেতাদের মনে বিরূপতা দেখা দেয়। অনুশীলন ছিল সর্ব-ভারতীয় বিপ্লবী পার্টি। শুধু বঙ্গদেশের মধ্যে এই দলের কার্য্য সীমাবদ্ধ ছিল না। আবার, অনুশীলন ছিল একটি ইউনিটারী পার্টি-কতকগুলি আঞ্চলিক গোষ্ঠীর ফেডারেশন নয়। বাংলার বাইরে-পাঞ্জাব, সংযুক্ত-প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশে ১৯১১ থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে অনুশীলনের যে ব্যাপক সংগঠন গড়ে উঠেছিল, ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার পর লাহোরে কতকগুলি ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার এবং বারাণসী ষড়যন্ত্র, বর্মা ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার আঘাতে সে সংগঠন বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়ে। তা ছাড়া অতগুলি ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমায় বহুলোকের ফাঁসী ও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ডের পরে উত্তরভারতীয় সংগঠণের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল ১৯১৫ সালের ভারতরক্ষা আইনের (Defence of India Act, 1915) এর আঘাতে সেটুকুও বিধ্বস্ত হয়ে যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে—মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড শাসন সংস্কার প্রবর্তনের প্রাককালে ব্যাপক কারাদণ্ড (general amnesty-র) সুযোগে দ্বীপান্তর দণ্ডে ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দীগণ অনেকে মুক্তি-প্রাপ্ত হয়ে বাইরে আসেন। কিন্তু ঐ সময়ে অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল ও দেশ-ব্যাপী আলোড়ন সুরু হয়ে গিয়েছে। তাই ঐ অবস্থায় বাংলার

অনুশীলন নেতৃবর্গের পক্ষে উত্তর-ভারতীয় সহকর্মীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হয়নি। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে অনুশীলন নেতৃবৃন্দ তাঁদের উত্তর ভারতীয় সংগঠনকে পুনরুজ্জীবিত করবার এবং তার ব্যাপকতর বিস্তৃতি সাধনের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গিয়েছে। ১৯১৯ সালে গয়া কংগ্রেসের কিছু পূর্বে বিখ্যাত বিপ্লবী অবনী মুখার্জি বার্লিনের Indian Independence Party কর্তৃক প্রেরিত হয়ে ভারতে আসেন।[২৬] অবনী একদা অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। ১৯১৫ সালে রাসবিহারী জাপান যাত্রা করবার কিছু পূর্বে অবনী বিদেশ থেকে ভারতে আসেন এবং নূতনভাবে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টার জন্য অনুশীলন সমিতি তাঁকে জাপানে রাসবিহারীর কাছে প্রেরণ করেন। সিডিসন কমিটির রিপোর্টে লেখা হয়েছে অবনী যতীন মুখার্জির দ্বারা প্রেরিত হয়ে জাপান গমন করেন এবং সেই অসত্য উক্তি অনুকরণ করে যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন যে যতীন মুখার্জি ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে রাসবিহারী বসুর সহিত সাক্ষাতের জন্য অবনীকে জাপান প্রেরণ করেন। এই দুটি বৃত্তান্তের একটিও সত্য হতে পারে না। কারণ অবনী অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন এ নিয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। এক দলের নেতা ভিন্ন দলের কোন কর্মীর দ্বারা কোন কাজ করাতে চাইলে ঐ কর্মী যে দলের সাথে যুক্ত সেই দলের নেতার অনুমতি ছাড়া সেটা কখনই সম্ভব হয় না। অনুশীলন সমিতির সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ এমন কথা জানেন না ও শুনেন নাই যে যতীন মুখার্জি অবনীকে জাপান পাঠানোর জন্য অনুশীলন সমিতির কারও কাছে কোনরূপ অনুমতি নিয়েছিলেন। তা ছাড়া ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে ও যতীন মুখার্জি এবং তাঁর সহকর্মীরা জার্মানী থেকে অস্ত্র ও সামরিক বিশেষজ্ঞ নিয়ে ম্যাভেরিক জাহাজ আসবে—তারই পরিপ্রেক্ষিতে

উদ্যোগ আয়োজনে ব্যাপৃত। ১৯১৯ এর জুলাইতে— মাভেরিক জাহাজের প্রত্যাশায় যতীন মুখার্জি, অতুল ঘোষ প্রভৃতি নৌকা নিয়ে প্রায় দশদিন সুন্দরবনের রায়মঙ্গলে অপেক্ষা করেন, তারপর বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন। সুতরাং ঐ সালের এপ্রিল মাসে যতীন মুখার্জি কর্তৃক অস্ত্রের জন্য অবনীকে রাসবিহারীর কাছে প্রেরণের কোন প্রশ্ন ওঠে না। তৃতীয়তঃ, রাসবিহারী ভারত ত্যাগ করেন ১৯১৫ সালের ১২ই মে। এপ্রিল মাসে তিনি অনুশীলনের গোপন শেল্টারে আত্মগোপন করে রয়েছেন। সুতরাং রাসবিহারী দেশত্যাগ করেছেন কি না এটা না জেনেই যতীন মুখার্জি রাসবিহারীর সাথে যোগাযোগের জন্য অবনীকে জাপানে প্রেরণ করবেন এটাও অসম্ভব। চতুর্থতঃ, অবনী নিজে কোথাও বলেন নাই যে তিনি যতীন মুখার্জি কর্তৃক জাপানে প্রেরিত হয়েছিলেন। পঞ্চমতঃ, যতীন মুখার্জি যদি সত্যই জাপানে রাসবিহারীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন প্রয়োজন মনে করতেন, তাহলে তাঁর নিজ দলের মধ্যে এমন কিছু বিশ্বস্ত লোক ছিলেন যাঁদের সাথে রাসবিহারীর যথেষ্ট ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি অবনী মুখার্জীর সাহায্য গ্রহণ করতে যাবেন কেন?

রাসবিহারী জাপানে পৌঁছানোর পরে অবনী জাপানে পৌঁছান এবং রাসবিহারীর সাথে তিনি জাপান থেকে সাংহাই গমন করেন।[২৭] রাসবিহারী সাংহাই থেকে কিছু অস্ত্র নৌকাযোগে প্রেরণ করেন। অবনী প্রত্যাবর্তনের পূর্বে রাসবিহারী তাঁকে ভারতের কিছু বিপ্লবীর নাম ঠিকানা প্রদান করেন। অবনী সে সব নাম ঠিকানা একখানা নোটবুকে লিখে নেন। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পথে অবনী সেই নোটবুক সহ পেনাংএ গ্রেপ্তার হন। সিঙ্গাপুরের সৈনিকবিদ্রোহ সম্পর্কে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়, এবং বিচারে তাঁর ফাঁসীর আদেশ হয়। তিনি সিঙ্গাপুরকোর্ট জেল থেকে পালিয়ে সমুদ্র সাঁতরিয়ে মালয়ের মৎস্যজীবীদের একখানি নৌকায় আশ্রয়

গ্রহণ করে মালয়ে যান এবং সেখান থেকে বহু দুঃখ কষ্ট সহ্য করে জনৈক জার্মান ব্যবসায়ীর সাহায্যে রোটার্ডাম হয়ে রুশদেশে গমন করেন। সেখানে তিনি রোজা কিনিৎসগাফ নামে এক কম্যুনিস্ট মহিলাকে বিবাহ করেন ও স্বয়ং কম্যুনিস্ট মতবাদে দীক্ষিত হন। ১৯২০ সালে কমিণ্টার্ণের দ্বিতীয় কংগ্রেসে এম. এন. রায় মেক্সিকোর প্রতিনিধি ও অবনী মুখার্জি ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন।[২৮]

বিপ্লবী বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা) দীর্ঘকাল ধরে ইউরোপে মাদাম কামা, শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা, এস. আর. রাণা প্রভৃতি ভারতীয় বিপ্লবীদের সহকর্মীরূপে ইউরোপে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নায়করূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে বার্লিনে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেস কমিটি (I. I. C) গঠনে ও তার কার্য্যপরিচালনার ব্যাপারেও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা ছিল অসামান্য। অক্টোবর বিপ্লবের পরে তিনি কম্যুনিস্ট মতবাদে দীক্ষিত হন এবং জার্মান কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। কমিণ্টার্ণের দ্বিতীয় কংগ্রেসের (আগস্ট, ১৯২০) পরে পূর্ব এশিয়ার ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে—বিশেষ করে ভারতবর্ষে—কম্যুনিজম প্রচারকার্য্যের অধ্যক্ষতা কোন্ ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হবে তা নিয়ে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মানবেন্দ্র রায়ের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হয় এবং এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেশ কয়েক বছর ধরে চলে। অবনী মুখার্জী প্রথম দিকে রায়ের পক্ষভুক্ত ছিলেন। ১৯২২ সালে তাসখন্দে প্রথম যে Communist Party of India নাম দিয়ে Exile C. P. I গঠিত হয় তার মোট ৭জন সভ্যের মধ্যে দুজন ছিলেন এম. এন. রায় ও তাঁর পত্নী ইভলিন রায় এবং অপর দুজন ছিলেন অবনী মুখার্জী ও তাঁর পত্নী রোজা কিনিৎসগাফ। এই তথাকথিত C. P. I. এর

সেক্রেটারীপদে নিযুক্ত হন মহম্মদ সফিক। এর অপর সভ্য ছিলেন শওকত ওসমানী। এ কমিটির অস্তিত্ব অবশ্য শুধু কাগজে কলমেই ছিল।

কিছুকাল পরে এম. এন. রায়ের সাথে অবনী মুখার্জির বিরোধ হয়। তিনি রায়ের পক্ষ পরিত্যাগ করে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষে যোগদান করেন। পক্ষান্তরে বার্লিনবাসী কম্যুনিস্ট নলিনী গুপ্ত (সঠিক নাম নলিনী দাশগুপ্ত) বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষ পরিত্যাগ করে রায়ের পক্ষে যোগদান করেন। ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষে ছিলেন। এই সময়ে তিনিও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপর থেকে তাঁর সমর্থন প্রত্যাহার করেন —অথচ রায়ের পক্ষেও প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করেন না।

বার্লিনের Indian Independence Party বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনকারীদের সংস্থা ছিল। এই সংস্থার পক্ষ থেকেই ১৯২২ সালে ভারতীয় বিপ্লবীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য অবনী মুখার্জিকে ভারতবর্ষে পাঠানো হয়। রায় এই সংবাদে আতঙ্কিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে নলিনী গুপ্তকে তাঁর নিজস্ব দূত হিসাবে ভারতে প্রেরণ করেন। উভয়েই ছদ্মবেশে প্রায় একই সময়ে ভারতে পৌঁছান।

সম্ভবতঃ ১৯২২ এর ডিসেম্বর মাসে অবনী ভারতে পৌঁছান—আফ্রিকান-এর ছদ্মবেশে। অবনী মারাত্মক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ভারতে এসেছিলেন। সিঙ্গাপুরে প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত পলাতক বিপ্লবী ভারতে এসে ধরা পড়লে তাঁর ফাঁসী অনিবার্য্য ছিল। তিনি এসে তাঁর কৈশোরকালের সমবয়স্ক বন্ধু ও প্রতিবেশী সুনীতি কুমারের (ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের) সাথে গোপনে সাক্ষাৎ করেন। এ বিষয়ে ডক্টর চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :—

"It was possibly just after Christmas in December 1922, one evening I came back home at about 9 o'clock from a meeting, my elder brother told

me that there were three men who came to see me, and they were rather mysterious looking people. *** Next evening only one man called. I could not recognise him because it was dark, but I took him into my drawing room and at once found that it was Abaninath. I was quite astonished, one might say, dumbfounded, to find him back in India. It was certainly most serious—most dangerous for him, with a price on his head."[২৯]

সুনীতিবাবু লিখেছেন তিনি দিলীপ কুমার রায় (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র) ও সত্যেন বসু (পরবর্তীকালের বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক)-এই দুজনের সাথে কথাবার্তা বলেন। এরপর তাঁর চেষ্টায় বিখ্যাত হোমিওপ্যাথি ডাঃ জিতেন মজুমদারের বাড়ীতে দিলীপ রায় ও সত্যেন বসুর কথাবার্তা (অনুশীলন সমিতির প্রথমযুগে এঁরা সমিতির সাথে যুক্ত ছিলেন) হয়। সুনীতিবাবু লিখেছেন—

"I wanted them, if they could, to find out the names of some persons who belonged to Anushilon Samiti...* I returned to my house and Satyen took Abani to the Anushilan Samiti gentleman who would be able to look after him"[৩০]

কিন্তু নলিনীকিশোর গুহ লিখেছেন—অবনী আশ্রয়ের সন্ধানে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যান এবং সুভাষচন্দ্রকেও আশ্রয়ের কথা জানান। উপেনবাবু ও সুভাষচন্দ্র উভয়েই প্রতুল গাঙ্গুলীকে সংবাদ পাঠান। তার ফলে অনুশীলন সমিতি অবনীকে ঢাকাতে নিরাপদ স্থানে রাখার সিদ্ধান্ত করে। এই সময়ে নলিনী গুপ্তকেও ঢাকায় অনুশীলনের গোপন আশ্রয়ে রাখার ব্যবস্থা হয়।

সুভাষচন্দ্রের অনুরোধেই অনুশীলন সমিতি নলিনী গুপ্তের জন্যও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। ৩১

নলিনী গুপ্তের আচার আচরণ ও কথাবার্তা অনুশীলনের লোকদের মনে অশ্রদ্ধা জাগায়। কিন্তু অবনী সম্বন্ধে তাঁদের কোন অভিযোগ ছিল না। অবনী প্রায় দেড় বছর অনুশীলন সমিতির গোপন আশ্রয়ে ছিলেন। কম্যুনিস্ট মতবাদ ও সোভিয়েত দেশে তার প্রয়োগ পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অবনীর সাথে অনুশীলনের উচ্চ স্তরের নেতৃবৃন্দের দীর্ঘদিন ধরে আলাপ আলোচনা চলে। শেষ পর্য্যন্ত অনুশীলন নেতৃবর্গ অবনীকে জানান যে তাঁরা ঐ বিষয়ে পড়াশুনা করে আরও জ্ঞানলাভ করতে চান। কম্যুনিস্ট মতবাদ গ্রহণ বা বর্জন করা সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বে ঐ সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানলাভ তাঁরা প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। অবনী মুখার্জ্জি রাশিয়ায় ফিরে গিয়ে আবশ্যকীয় পুস্তকাদি প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছদ্মবেশে কিছুদিন ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে ১৯২৪ এর শেষভাগে রাশিয়ায় ফিরে যান।

অবনী মুখার্জির আগমনের ফলে অনুশীলন নেতৃবৃন্দের মনোভাব সমাজবাদী বিপ্লবের দিকে অনেক খানি ঝুঁকে পড়ে।

বিখ্যাত বিপ্লবী যোগেশ চ্যাটার্জি ১৯১৬ সালের ৯ অক্টোবর অনুশীলন সমিতির গোপন সেলটার ৩৯ নং পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীট থেকে গ্রেপ্তার হন। তাঁকে দালান্দা বন্দীনিবাস থেকে বাংলার গোয়েন্দা দপ্তরের হেড্‌কোয়ার্টার 8 নং কীড্‌ স্ট্রীটে নিয়ে তাঁর উপরে অমানুষিক অত্যাচার করা হয়। পরে তাঁকে ১৮১৮ সালের ৩ নং রেগুলেশন অনুসারে বিনাবিচারে আটক করা হয়।*

* ঐ সময়ে 8 নং কীড্‌ স্ট্রীট ছিল পাশবিক অত্যাচারের কারখানা। এখানে বিপ্লবীদের উপরে যে সকল বর্বরযুগীয় অত্যাচার করা হত তার কিছু কিছু বিবরণ 'Struggle and Anushilan Samiti'-vol. 1-এর ১৩৯ থেকে ১৪২ পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে।

১৯২০ সালে কারামুক্ত হয়ে যোগেশবাবু, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, মনীন্দ্র চক্রবর্তী, জিতেন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কয়েকজন বিপ্লবী সহকর্মীর সাথে মিলে কুমিল্লা শহরে House of Labourers নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এই প্রতিষ্ঠান সমাজবাদী আদর্শে পরিচালিত হত —অর্থাৎ শ্রম যারা করবে তারাই মালিক হবে—কেবলমাত্র যারা লাভলোকসানের তুল্যাংশ গ্রহণে সম্মত হত না তাদেরকেই বেতনভুক কর্মচারীরূপে নিয়োগ করা হত। তবে পূর্বোক্তরূপ মালিকেরা কর্মচারীদের সাথে একত্র হয়ে শ্রমদান করতেন। যোগেশবাবু কারখানা ঘরেই রাত্রিযাপন করতেন। এঁরা ছোট ছোট মেসিন প্রস্তুত করতেন। এঁদের তৈরী দিয়াশলাই প্রস্তুতের রোটারী মেসিন খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অল্প সময়ের মধ্যে এই নূতন ধরণের কারখানা সুধী-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসী পত্রিকায় এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও তাঁদের কর্মকুশলতার প্রশংসা করে প্রবন্ধ লেখেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র স্বয়ং কুমিল্লা শহরে গিয়ে এই প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন ও পরিচালকগণের নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মকুশলতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। কুমিল্লার খ্যাতনামা দানশীল ব্যবসায়ী মহেশ ভট্টাচার্য্য স্বয়ং এগিয়ে এসে এঁদের বিনা সুদে দশ হাজার টাকা ঋণ দান করেন। অবনী মুখার্জির ভারতে আসার পূর্ব থেকেই যে অনুশীলন নেতৃবৃন্দ সমাজবাদী আদর্শের প্রতি অনুরাগী হয়ে উঠছিলেন, যোগেশবাবু কর্তৃক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কারখানা স্থাপনের মধ্য দিয়ে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এদিকে অনুশীলনের উত্তর ভারতীয় সংস্থাগুলির পুনরুজ্জীবনের জন্য সমিতির নেতৃবৃন্দ স্থির করেন—যোগেশবাবুকেই ঐ কার্য্যের ভার গ্রহণ করতে হবে। অতএব নরেন সেন ও প্রতুল গাঙ্গুলীর নির্দ্দেশে যোগেশবাবু ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে House of

Labourers থেকে বিদায় নিয়ে উত্তর ভারতে চলে যান। দুঃখের বিষয় যোগেশবাবুর বিদায় গ্রহণের পর কয়েক বৎসরের মধ্যেই House of Labourers প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়।

যোগেশ চট্টোপধ্যায় প্রথমে কাশী যান। কাশীতে তখন অনুশীলনের ক্ষুদ্র একটি ইউনিট ছিল। সতীশ সিংহ ও তাঁর ভাই ক্ষেত্র সিংহ (উভয়েই অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট সভ্য) তখন কাশীতে ছিলেন। সতীশ সিংহ ছিলেন ঐ ইউনিটের পরিচালক। দলের নির্দ্দেশে যোগেশবাবু সতীশ সিংহের নিকট থেকে কাশী ইউনিটের পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন।

বারানসীতে প্রাথমিক কাজকর্ম সমাধা করে যোগেশবাবু এলাহাবাদে শচীন্দ্র নাথ সান্যালের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। শচীনবাবু অভিমত প্রকাশ করেন যে উত্তর ভারতে বৈপ্লবিক কর্ম-ধারা পুনরুজ্জীবিত করতে হলে "অনুশীলন সমিতি" নাম ব্যবহার না করে ভিন্ন নামে সংগঠন সুরু করা হোক। কারণ বঙ্গদেশে 'অনুশীলন' নামের সঙ্গে জনমানসে উজ্জ্বল ইমেজ সৃষ্টি হয়েছে, উত্তর-ভারতে সেরূপ হয় নি। যোগেশবাবু শচীন্দ্র সান্যালের ঐরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। শচীনবাবু তখন তাঁর নূতন প্রস্তাব নিয়ে বাংলার অনুশীলন নেতাদের সাথে আলাপ আলোচনা সুরু করেন। প্রথমে এ ব্যাপারে রমেশ চৌধুরী এলাহাবাদে আসেন। কিন্তু যোগেশবাবু বা শচীনবাবু—উভয়েই নিজ নিজ অভিমতে অটল থাকেন। সুতরাং কোন মীমাংসা হয় না। শচীনবাবু তখন কলকাতায় গিয়ে প্রতুল গাঙ্গুলীর কাছে তাঁর প্রস্তাব ব্যক্ত করেন। প্রতুলবাবু শচীনবাবুর প্রস্তাব অনুমোদন করেন না। অতঃপর ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত ভোলাচিং গ্রামে শচীনবাবু, যোগেশবাবু, নরেন সেন, প্রতুল গাঙ্গুলী, ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী (মহারাজ) এবং ত্রিপুরার অমূল্য মুখার্জি

একত্রিত হন। মহারাজ সব শুনে বলেন— "নামে কি আসে যায় ? শচীন বলছে ভিন্ন নামে কাজ করলে কাজ ভাল হবে। ভিন্ন নামের সংস্থা যদি অনুশীলন সমিতির শাখা হিসাবেই কাজ করে, তবে ভিন্ন নাম দিতে আপত্তি কিসের ?" শেষে মহারাজের অভিমত সকলেই মেনে নেন এবং ঐ ভোলাচং গ্রামে ঐ বৈঠকেই Hindusthan Republican Association (H. R. A.) নাম দিয়ে অনুশীলন সমিতি উত্তর-ভারতীয় শাখা জন্মলাভ করে।

H. R. A র সংগঠনকে বিধ্বস্ত করবার উদ্দেশ্যেই ১৯২৪ সালে "কাকোরী ষড়যন্ত্র" মোকর্দ্দমা স্থাপিত হয়। প্রকৃতপক্ষে অনুশীলন সমিতি ১৯২২ সাল থেকেই তাঁদের বারাণসী ইউনিটকে সক্রিয় করে তুলবার চেষ্টা করছিলেন। ১৯২২ সালেই শ্যাম চক্রবর্তীকে বারাণসী ইউনিটের পরিচালকরূপে পাঠানো হয়। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে কাজ করবার জন্য দুইজন ছাত্রকেও ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। পরে বিখ্যাত ক্ষেত্র সিংহের ছোট ভাই শ্যাম চক্রবর্তীর কাছ থেকে কর্মভার গ্রহণ করেন। যোগেশবাবু ১৯২৩ এর ডিসেম্বরে সতীশ সিংহের নিকট থেকে বারাণসী ইউনিটের পরিচালনাভার গ্রহণ করেন। ফরিদপুরের অনুশীলন কর্মী প্রফুল্ল কুমার সেন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী জীবনে স্বামী সত্যানন্দ পুরী নামে পরিচিত হন। সন্ন্যাস গ্রহণের পরেও তিনি বৈপ্লবিক পথ পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি কাশীর গোধুলিয়া অঞ্চলে একটি আশ্রম স্থাপন করেন। যোগেশবাবু বারাণসীতে পৌঁছানোর পূর্বেই স্বামী সত্যানন্দ পুরী বারাণসী ত্যাগ করে চলে যান—তবে তাঁর আশ্রমটি ছিল। সেখানে কয়েকজন ব্রহ্মচারী থাকতেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন—অনুশীলনের বিশিষ্ট কর্মী শচীন্দ্র চক্রবর্তী—যিনি জালনোট প্রস্তুতের অভিযোগে অনুশীলনের নেতৃস্থানীয় সভ্য প্রবোধ দাশগুপ্তের সাথে গ্রেপ্তার হন

এবং পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। স্বামী সত্যানন্দ পুরী পরে ব্যাঙ্কক চলে যান,* গোধুলিয়ার এই কল্যাণ আশ্রমই বারাণসীতে অনুশীলন বিপ্লবীদের মিলন কেন্দ্রে পরিণত হয়।

যোগেশবাবু প্রথমতঃ উত্তর-প্রদেশ পাঞ্জাব ও বিহারের পুরাতন অনুশীলনপন্থীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে চেষ্টা করেন। লাহোরের রামশরণ দাস ও জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, এলাহাবাদের শেঠ দামোদর স্বরূপ, ঝাঁসীর পণ্ডিত পরমানন্দ প্রভৃতি যাঁরা ১৯১৫ সালে রাসবিহারী বসুর সাথে কাজ করেছেন, তাঁরা এবং আলিগড়ের প্রবীন অনুশীলন নেতা অর্জুনলাল শেঠী, কানপুরের সুরেশ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি উৎসাহের সাথে পুনরায় বৈপ্লবিক কর্মে আত্মনিয়োগে সম্মত হন এবং H.R.A.তে যোগদান করেন। আটঘরিয়া কাইটের বীর বিপ্লবী গোবিন্দ চন্দ্র কর তখন লক্ষ্ণৌতে ছিলেন। তিনিও H.R A তে যোগদান করেন। এছাড়া নূতনদের মধ্যে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজেন লাহিড়ী, প্রণবেশ চ্যাটার্জি প্রভৃতি নিষ্ঠাবান যুবক H.R.A তে যোগদান করেন। কিন্তু এখানে যোগেশবাবু যাদেরকে সহকর্মীরূপে লাভ করেন তার মধ্যে দুই জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হলেন—শচীন বক্সী ও মন্মথ গুপ্ত।

---

* স্বামী সত্যানন্দ পুরী ব্যাঙ্ককে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তিনি ব্যাঙ্ককের মেয়র হন। রাসবিহারী ১৯২৪ সালে পূর্ব এশিয়ার দেশপ্রেমিকদের নিয়ে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ গঠন করবার পর থেকেই তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের একজন সক্রিয় সভ্য হিসাবে কাজ করতে থাকেন। ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে রাসবিহারী কর্তৃক আহূত টোকিও সম্মেলনে যাওয়ার সময়ে বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। তিনিই I. N. A র প্রথম শহীদ।

কিছুদিন পরে অনুশীলন সমিতি শচীন সান্যালকে বাংলাদেশে নিয়ে যান—তাঁকে প্রথমে বাঁকুড়ায় ও পরে উত্তরবঙ্গে কাজ দেওয়া হয়। H. R. A র নেতৃত্ব যোগেশবাবুর উপরেই ন্যস্ত থাকে।

বারাণসীতে কিছুদিন কাজ করবার পর যোগেশবাবু বুঝতে পারেন যে তাঁর উপরে ও কল্যাণ আশ্রমের উপরে গোয়েন্দা ইনস্পেক্টর জিতেন সেনের নজর পড়েছে। এই গোয়েন্দা কর্মচারী-টির বাড়ী ছিল ময়মনসিংহ জেলায় এবং বিপ্লবী যোগেশ চ্যাটার্জির নাম ও পরিচয় তিনি ভালভাবেই জানতেন। অতএব যোগেশবাবু H.R.A র হেডকোয়ার্টার কানপুরে স্থানান্তরিত করবার সংকল্প করেন।

কানপুরে এসে যোগেশবাবু তাঁর পুরাতন সহকর্মী সুরেশ ভট্টাচার্য্যের পাটপুকুর mess এ ওঠেন। সুরেশ ভট্টাচার্য্য তখন কানপুরের Anglo Bengali School এ শিক্ষকতা করতেন এবং 'বর্তমান' নামক একখানি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদনাও করতেন। বারাণসীতে যোগেশবাবু কোন ছদ্মনাম গ্রহণ না করে ভুল করেছিলেন। সেই জন্যই ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসী বাঙ্গালী গোয়েন্দাপুলিশ সহজেই তাঁকে চিনতে সক্ষম হয়। কানপুরে এসে যোগেশবাবু ছদ্মনাম গ্রহণ এবং পি. সি. রায় বা 'রায়মহাশয়' নামে পরিচিত হন। কানপুরে বিজয়কুমার সিং, তার বড় ভাই (হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র) রাজকুমার বটুকেশ্বর দত্ত, অজয় ঘোষ প্রভৃতিকে দলভুক্ত করেন (অজয় ঘোষ পরবর্তীকালে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগদান করেন এবং দীর্ঘদিন ঐ পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন)। এ ছাড়া পণ্ডিত পরমানন্দ তাঁর স্বগ্রামবাসী দেওয়ান শত্রুঘ্ন সিংহকে H.R.A দলে নিয়ে আসেন। কিন্তু যোগেশবাবু কানপুরে এসে যাঁদেরকে দলভুক্ত করতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে উজ্জ্বলতম তিন ব্যক্তি হলেন মৈনপুরী ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার পলাতক আসামী শাহজাহানপুর নিবাসী রামপ্রসাদ বিস্‌মিল এবং

অবিস্মরণীয় বিপ্লবী ভগৎ সিং ও চন্দ্রশেখর আজাদ। রামপ্রসাদ বিস্‌মিলের মাধ্যমে আর একটি উজ্জ্বল রত্ন লাভ করে H.R.A। ইনি ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক ইতিহাসের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক—আস্‌ফাকউল্লা।

যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে দলভুক্ত না হয়েও নানাভাবে দলকে সহায়তা দান করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কানপুরের খ্যাতনামা কংগ্রেসনেতা গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী, ডাক্তার এস. এন. সেন এবং Anglo Bengali School এর শিক্ষক নেপাল ব্যানার্জি।

এইখানে ভগৎ সিং এর সাথে H.R.A এর যোগাযোগ কিভাবে সংঘটিত হয় তার বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন মনে করছি। ভগৎ সিং ছিলেন বিখ্যাত বিপ্লবী পরিবারের সন্তান। তাঁর জ্যেষ্ঠতাত ভারতবিখ্যাত বিপ্লবী অজিত সিং ১৯০৮ সালে ভারত থেকে নির্বাসিত হন। ভগৎ সিং এর পিতা কিষণ সিং ১৯১৫ সালের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজনে রাসবিহারী বসুর সহকর্মী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে স্যার জেম্‌স ক্যাম্বেল কার লিখেছেন—"He is a brother of the notorious Ajit Sing and took active part in disturbances in Lahore in 1907 and was sentenced to two years R. I. in Lahore riot case. In 1909 he was concerned in flooding the Punjab with seditious literature, and was convicted in March 1910 and sentenced to 10 months' R. I."[৩২]

ভগৎ সিং অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং লাহোর ন্যাশনাল কলেজে ভর্তি হন। ১৯২৩ সালে তিনি যখন লাহোর ন্যাশনাল কলেজের ছাত্র, সেই সময়ে তাঁর ঠাকুর্দা তাঁর বিবাহ স্থির করেন। ঐ সময়ে বিবাহ করবার মত মানসিক অবস্থা ভগতের ছিল না। তিনি তাঁর কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের শরণাপন্ন হন এবং বলেন—"স্যার, এই বিপদ

থেকে আমাকে উদ্ধার করুন। আমি বিবাহ করব না, দেশের কাজ করব।” ঘটনাক্রমে ঐ সময়ে শচীন সান্যাল লাহোরে ছিলেন। জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার একখানি পত্র দিয়ে ভগৎ সিংকে শচীন সান্যালের কাছে পাঠিয়ে দেন। শচীনবাবু সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হয়ে আর একখানি পত্র দিয়ে তঁকে কানপুরে যোগেশ চ্যাটার্জির নিকট প্রেরণ করেন। এ সম্বন্ধে যোগেশবাবু লিখেছেন—

“Sanyal babu asked Bhagat whether he was fully ready to devote his life for winning the freedom of his motherland whether he was ready to leave his family and relations for the Cause. The replies to these questions were of course in the affirmative Sanyal babu gave him a letter for me and sent him to Kanpur. It was in the day time that he arrived at our place and gave me the letter ”[৩৩]

শাহজাহানপুরে রামপ্রসাদ বিস্‌মিলের মাধ্যমেই পরবর্তীকালের কাকোরী শহীদ ঠাকুর রোশন সিং ও আসফাকউল্লার সাথে যোগেশবাবুর পরিচয় ঘটে।

ভগৎ সিংকে প্রথমে পাটপুকুরের বাঙ্গালী মেসেই রাখা হয়। কিন্তু বাঙ্গালী মেসে একজন শিখ যুবকের অবস্থান পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে, এ জন্য গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। গণেশ শঙ্কর কানপুর থেকে প্রকাশিত হিন্দী ‘প্রতাপ’ পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। তিনি ভগৎ সিংকে ‘সাংবাদিকতার শিক্ষানবীশ’ (trainee in journalism) হিসাবে ‘প্রতাপ’ পত্রিকা’র অফিসে ভর্তি করে নেন এবং পত্রিকার কার্য্যালয়েই তাঁর বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন। তা ছাড়া training allowance স্বরূপে তাঁকে মাসিক ১০৲ দশ টাকা হিসাবে হাত

খরচ দেওয়ারও ব্যবস্থা করেন। এর কিছুকাল পরে আলিগড়ের বিপ্লবী নেতা ঠাকুর টোডর সিং যোগেশবাবুকে অনুরোধ করেন—আলিগড়ের জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকতা করবার উপযুক্ত একজন কর্মীকে আলিগড়ে পাঠানোর জন্য। যোগেশবাবু ভগৎ সিংকে আলিগড়ে প্রেরণ করেন; একই সাথে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকতা ও H.R.A র জেলা সংগঠকের কাজের ভার দিয়ে।[৩৪]

সংযুক্ত প্রদেশের গোয়েন্দা বিভাগের বার্ষিক রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছে যে যোগেশবাবু এক বছরের মধ্যে ঐ প্রদেশের ২৬টি জেলায় H.R.A র শাখা সংগঠন গড়ে তুলতে সমর্থ হন। পরবর্তীকালে কাকোরী ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমায় প্রাথমিক তদন্তকালে তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট মন্তব্য করেন যে "১৯২৪ সালের ৩রা অক্টোবর তারিখ পর্য্যন্ত বারাণসী, এলাহাবাদ, প্রতাপগড়, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, ফতেপুর, মৈনপুরী. জৌনপুর, ঝাঁসি, হামিরপুর, ফরাক্কাবাদ, এটোয়া, আগ্রা, আলিগড়, মথুরা, বুলান্দসহর. মীরাট, দিল্লী, এটা, বেরিলি. পিলভিট, শাহজাহানপুর, মজফ্ফরপুর প্রভৃতি স্থানে জেলা সংগঠক নিয়োগ করা হয়েছিল।"[৩৫]

যদিও অনুশীলন সমিতির নেতৃবৃন্দ ১৯২২ সালের পরে, ডাকাতির দ্বারা অর্থসংগ্রহ যথাসম্ভব পরিহার করবার অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তথাপি এটা সত্য কথা যে প্রয়োজনের তাগিদে মাঝে মাঝে ডাকাতি করতে হয়েছে। বৈপ্লবিক কার্যাক্রম পরিচালনা করতে—অস্ত্র সংগ্রহ, বোমা প্রস্তুত, ঘরছাড়া বিপ্লবীদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা, নিষিদ্ধ পুস্তকাদি সংগ্রহ, প্রচার, মুদ্রণ পলাতক সভ্যদের নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা, যাতায়াত ব্যয় ও সর্বোপরি বৈপ্লবিক মোকর্দ্দমাগুলিতে আসামীদের ডিফেন্সের ব্যয় ইত্যাদিতে বহু অর্থের প্রয়োজন। অথচ বৈপ্লবিক কার্য্যের জন্য প্রকাশ্যভাবে চাঁদা সংগ্রহও সম্ভবপর নয়। সুতরাং কাজের তাগিদে অর্থসংগ্রহের

জন্য ডাকাতি—আবার সেই ডাকাতিকে কেন্দ্র করে মোকর্দ্দমা-তার ডিফেন্সের জন্য আবার ডাকাতি, হাজার চেষ্টা করেও বিপ্লবীরা এই vicious cycle থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে পারেন নাই। ১৯২৪ এর ৩রা অক্টোবর কানপুরে H.R A এর যে প্রথম প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় সেখানে H. R. A এর একটি লিখিত উদ্দেশ্যপত্র ও নিয়মাবলী গৃহীত হয়। উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়—

"The object of the association shall be to establish a federated republic of the limited states of India, by an organised and armed revolution"

"The basic principle of the republic shall be universal suffrage and the abolition of all systems which make any kind of exploitation of man by man possible.[৩৬]

অনুশীলন সমিতি যে ১৯২২ সাল থেকেই সমাজবাদী চিন্তায় আকৃষ্ট হচ্ছিলেন, H.R.A র গঠনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ পূর্বোক্ত objective clause থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

অর্থসংগ্রহের জন্য ডাকাতি করবার কথা পূর্বোক্ত গঠনতন্ত্রে লিখিত কর্মসূচীর মধ্যে নাই। তবে কর্মসূচীর মধ্যে ৩নং প্রকরণে লেখা ছিল—

Funds shall be collected generally by means of voluntary subscriptions and occasionally by contributions exacted by force"[৩৭]

যোগেশ চ্যাটার্জী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—

"with the expansion of our contacts our expenses also increased. The meagre income that we got from some sources was not enough to meet our

expenses * * * I recieved demands for money from Beneras and many other places. In this financial duress I thought of arranging some action".[৩৮]

ঠাকুর জং বাহাদুর সিং এলাহাবাদের নিকটবর্তী একটি গ্রামে একটি ডাকাতির আয়োজন করেন। এই ডাকাতিতে যোগেশবাবু নিজে ছিলেন—এবং ভগৎ সিং, মন্মথ গুপ্ত, বনোয়ারীলাল, রবীন্দ্র কর, প্রণবেশ চ্যাটার্জি, জং বাহাদুর সিং ও বীরভদ্র তেওয়ারী এই কার্য্যে যোগদান করেন। যোগেশবাবু জিতেন সান্যালকে বলেন এলাহাবাদের একজন স্থানীয় লোক সঙ্গে থাকলে ভাল হয়। জিতেন সান্যাল কেশবদেব মালব্যকে নিয়ে আসেন কিন্তু যোগেশবাবু অতবড় ঘরের ও অত ভাল চেহারার যুবককে সঙ্গে নেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। যোগেশবাবু লিখেছেন, সংযুক্ত প্রদেশের গ্রামীন ধনী লোকেরা অত্যন্ত রক্ষণশীল, তারা টাকা মাটির তলায় পুঁতে রাখে। অত্যন্ত নিষ্ঠুর দৈহিক নির্য্যাতন না করলে তাদের কাছ থেকে টাকার সন্ধান আদায় করা যায় না। যোগেশবাবু ঐ ধরণের দৈহিক নির্য্যাতনের পক্ষপাতী ছিলেন না। ফলে প্রায় শূণ্যহস্তে ফিরে আসতে হয়। কিন্তু পালানোর সময় অনুসরণকারীদের প্রতিরোধ করবার জন্য গুলী ছুঁড়তে হয়—এবং তার ফলে একজন গ্রামবাসী মারা যায়। তার পরে ১৯২৪ এর ২৫শে ডিসেম্বর বামরাউলিতে ডাকাতি হয়, লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৪০০০৲ টাকা। ১৯২৫ র ৯ই মার্চ বীরপুরীতে এবং ২৪ মে দ্বারকাপুরে ডাকাতি হয়। এইসব ডাকাতিতে যোগেশবাবু ছিলেন না। রামপ্রসাদ বিস্‌মিল এই সব ডাকাতিতে নেতৃত্ব করেন—সঙ্গে ছিলেন চন্দ্রশেখর আজাদ, আসফাকউল্লা, বনোয়ারীলাল প্রভৃতি। দ্বারকাপুর ডাকাতিতে একজন গ্রামবাসী প্রাণ হারায়। এই তিনটি ডাকাতিই প্রায় নিরর্থক হয়েছিল কারণ টাকা যা পাওয়া গিয়েছিল তার পরিমান সামান্য।

যোগেশবাবু ১৯২৪ এর অক্টোবর মাসে কানপুর কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমায় অন্যতম আসামী রামচরণ লাল শর্মার সাথে সাক্ষাৎ করবার জন্য পণ্ডিচেরী যান। রামচরণ লাল তৎকালে ভারতে এম. এন. রায়ের এজেণ্টরূপে কাজ করছিলেন। এঁর ভাই শিবচরণ লাল শর্মা H.R A-তে যোগদান করেছিলেন। যোগেশবাবুর উদ্দেশ্য ছিল রামচরণ লালের মাধ্যমে কমিণ্টার্ণের নিকট থেকে কিছু আর্থিক সাহায্য লাভ করা। ঐ সময়ে ভারতে কম্যুনিজম প্রচারের জন্য কমিণ্টার্ণের টাকা বিলি হত এম. এন. রায়ের মাধ্যমে। পণ্ডিচেরী থেকে তিনি জানতে পারেন যে ইংরেজের গোয়েন্দা পুলিশ তাঁকে অনুসরণ করছে। তিনি পণ্ডিচেরী থেকে পায়ে হেঁটে মাদ্রাজের অন্তর্গত কুডডালোর ষ্টেশনে এসে সেখান থেকে কলকাতার টিকিট কিনে গাড়ীতে ওঠেন। গাড়ী হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছানোর পর যোগেশবাবু হাওড়া ব্রিজ পার হয়ে কলকাতার এলাকায় পা দেওয়া মাত্র হ্যারিসন রোড ও ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের সংযোগ স্থলে দু দিক থেকে দুজন গোয়েন্দা কর্মচারী তাঁকে ধরে ফেলে। যোগেশবাবুর পকেটে তখন একটি মারাত্মক দলিল ছিল। সেটি হল H,R A র সাংগঠনিক বিধি, নিয়মাবলী ও কর্মসূচী। যোগেশবাবু দলিলটি রাস্তায় ফেলে দেন। কিন্তু পুলিশ রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নেয়। যোগেশবাবুকে কোন অভিযোগ ছাড়াই ১৮ই থেকে ২৫শে অক্টোবর বড় বাজারে থানা লক আপে আটক রাখা হয়। কারণ B.C.L.A ordinance তখনও গেজেটে প্রকাশিত হয় নাই। ২৫শে অক্টোবর ঐ অর্ডিন্যান্স চালু হওয়ার পর তাঁকে প্রেসিডেন্সী জেলে পাঠানো হয়—পরে সেখান থেকে পাঠানো হয় বহরমপুর জেলে। যোগেশবাবুর বহরমপুর জেলে অবস্থানকালে ৯ই আগষ্ট ১৯২৫ বিখ্যাত কাকোরী ট্রেন ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। এই ডাকাতিতেও নেতৃত্ব করেন রামপ্রসাদ বিস্‌মিল—যোগদান কারীদের মধ্যে ছিলেন—রাজেন লাহিড়ী, চন্দ্রশেখর আজাদ, আস-

আসফাকউল্লা, ঠাকুর রোশন সিং, রামকৃষ্ণ ক্ষেত্রী প্রভৃতি। পরিকল্পনা অনুযায়ী সাহারানপুর থেকে লক্ষ্ণৌগামী ৮নং ডাউন প্যাসেঞ্জার থেকে সরকারী টাকা লুণ্ঠন করবার জন্য এই ডাকাতি করা হয়। সরকারী টাকার বাক্সটি থাকতো গার্ডের গাড়ীতে—গার্ডের জিম্মায়। পূর্বোক্ত তারিখে সন্ধ্যায় ঐ প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি কাকোরী ষ্টেশন পরিত্যাগ করে আলমনগর ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় দ্বিতীয় শ্রেনীর কামরা থেকে সাহেবী পোষাক পরিহিত রাজেন লাহিড়ী অ্যালার্ম চেইন টেনে গাড়ী থামান। অন্যেরা গার্ডের কামরার দিকে ছুটে গিয়ে রিভলভার দেখিয়ে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান গার্ডকে বলে- উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে। গার্ড ঐ আদেশ পালন করে। বিপ্লবীরা বিনা বাধায় সরকারী টাকা সহ লোহার বাক্সটি কামরা থেকে বাইরে ফেলে দেয়—সেটা ওখানেই ভাঙ্গা হয়। ভিতরে ৪৫০০্ টাকা ছিল। 'বিপ্লবীরা টাকা নিয়ে সরে পড়ে। কাউকে হত্যা করবার কোন পরিকল্পনা ছিল না। বাক্স ভাঙ্গার সময় যাতে কোন যাত্রী গাড়ী থেকে নেমে না আসে, সেই জন্য ভয় দেখানোর তাগিদে ফাঁকা জায়গায় গুলী ছোঁড়া হচ্ছিল, ঐ গুলি কারও লাগবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু জনৈক মুসলমান মোক্তার অত্যাধিক ঔৎসুক্যবশতঃ কামরা থেকে নেমে আসেন। ফলে তিনি গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা যান। এই হ'ল কাকোরী ট্রেন ডাকাতির ঘটনার বৃত্তান্ত। এর পূর্বে বামরাউলি বীচপুরী এবং দ্বারকাপুরে যে তিনটি ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয় পুলিশ সেগুলিকে বৈপ্লবিক ডাকাতি বলে বুঝতে পারে নাই। কিন্তু কাকোরী ট্রেন ডাকাতির পরে পুলিশ সেটাকে বৈপ্লবিক ডাকাতি বলে অনুমান করে। তবু প্রথম কিছুদিন ধরে খোঁজখবর করেও 'এই ডাকাতির সূত্র আবিষ্কার করতে পারে না। এর মধ্যে এক- দিন কাকোরী ডাকাতিতে যে সকল কারেন্সী নোট লুণ্ঠিত হয়— তারই একটির নম্বরযুক্ত একখানা কারেন্সী নোট শাহ্‌জাহানপুরে পাওয়া যায়। শাহ্‌জাহানপুরে রামপ্রসাদ বিস্‌মিলের বাড়ী।

মৈনপুরী ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার পলাতক আসামী হিসাবে পুলিশের খাতায় রামপ্রসাদের নাম ছিল—সুতরাং রামপ্রসাদের উপরে পুলিশের সন্দেহ ঘনীভূত হল। পুলিশ অনুসন্ধানে আরও জানতে পারলো যে ৮ই, ৯ই, ও ১০ই আগষ্ট রামপ্রসাদ শাহ্‌জাহানপুর থেকে অনুপস্থিত ছিলেন (৯ই আগষ্ট কাকোরী ডাকাতির তারিখ)। সংযুক্ত প্রদেশের গোয়েন্দা পুলিশের স্পেশাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হর্টন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সাথে কাকোরী ডাকাতি সম্পর্কিত তদন্তে অগ্রসর হতে লাগলেন। শাহ্‌জাহানপুর ডাকঘরে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল রামপ্রসাদের নামে সেখানে বেশী চিঠি আসেনা। মিঃ হর্টন অনুমান করলেন—শাহজাহানপুরে নিশ্চয়ই এমন কোন ব্যক্তি আছে যে রামপ্রসাদের post-box হিসাবে কাজ করে অর্থাৎ রামপ্রসাদের উদ্দেশ্যে লিখিত চিঠি অন্য কারও নামে আসে। ডাকঘরে ক্রমাগত কয়েকদিন ধরে অনুসন্ধান করে জানা গেল স্থানীয় গভর্নমেণ্ট হাই স্কুলের ছাত্র ইন্দুভূষণ মিত্রের নামে অনেক চিঠি আসে। চিঠিগুলি spray র সাহায্যে খুলে এবং পাঠ করে হর্টন কৃতনিশ্চয় হলেন যে ইন্দুভূষণই রামপ্রসাদের post-box। সাধারণ গোয়েন্দা হলে সে তৎক্ষণাৎ ইন্দুভূষণকে গ্রেপ্তার করতো। কিন্তু চতুর হর্টন সে পথে গেলেন না। তিনি গভর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড মাষ্টার খান সাহেব ইদ্রিস আহম্মদের সাথে বন্দোবস্ত করলেন যে ইন্দুভূষণের নামে ডাকঘরে যে সব চিঠি আসবে, খান সাহেব সেগুলি spray দিয়ে খুলে সেই সব চিঠি নকল করে রাখবেন এবং তার পর আসল চিঠি খানি আবার লেফাফায় ভরে মুখ এঁটে ইন্দুভূষণকে দিয়ে দেবেন। এই উপায়ে রামপ্রসাদের কাছে যারা চিঠিপত্র লেখে তাদের অনেকেরই নাম ঠিকানা হর্টনের হস্তগত হল। তাদের আবাসস্থলের ডাকঘর গুলিতে গোপন সেন্সরের ব্যবস্থা প্রবর্তন তাদের কাছে রামপ্রসাদ কর্তৃক লিখিত চিঠিপত্রের বিবরণ হর্টন সহজেই সংগ্রহ করতে সমর্থ হলেন। এই সময়ে রামপ্রসাদ ১৩ই ও ১৪ই সেপ্টেম্বর

মীরাটে H.R.A র প্রাদেশিক কনভেনসন আহ্বান করেন। রামপ্রসাদ কর্তৃক তাঁর আলিগড়ের এক সহকর্মীকে লেখা চিঠি intercept করে এই সংবাদ হর্টনের গোচরে আসলো। হর্টন কিন্তু রামপ্রসাদের ঐ সহকর্মীকে গ্রেপ্তার করলেন না। মীরাটে গুপ্তচর পাঠিয়ে কনভেনশনে যোগদানকারী H.R.A সভ্যগণের যথাসম্ভব পরিচয় সংগ্রহ করলেন। সংগঠনের যাবতীয় সংবাদ এই ভাবে পূর্বাহ্নে হস্তগত করে ২৬শে সেপ্টেম্বর সংযুক্ত প্রদেশে নানাস্থানে একসাথে জাল ফেললেন—ঐ একই দিনে নানা স্থানে H.R.A কর্মীরা গ্রেপ্তার হলেন। নানা স্থানে থানাতল্লাসির ফলে অনেক বৈপ্লবিক কাগজপত্র ও কিছু কিছু অস্ত্রশস্ত্র ধরা পড়লো। তারই ভিত্তিতে খাড়া করা হল ইতিহাস বিখ্যাত কাকোরী ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা (Kakori Conspiracy Case)।

গ্রেপ্তার হলেন রামপ্রসাদ বিস্‌মিল (শাহজাহানপুর), ঠাকুর রোশন সিং (ঐ), প্রেম কিষণ খান্না (ঐ), বানারসীলাল (ঐ), রামদত্ত শুক্ল (ঐ), রাজ কুমার সিং (কানপুর), বীরভদ্র তেওয়ারী (ঐ), রাম-দুলারী ত্রিবেদী (ঐ), গোপীমোহন (ঐ), সুরেশ ভট্টাচার্য্য (ঐ), শেঠ দামোদর স্বরূপ (এলাহাবাদ), শীতলা সহায় (ঐ), ভূপেন্দ্র সান্যাল (ঐ), ডি. ডি. ভট্টাচার্য্য (কাশী), মন্মথ গুপ্ত (ঐ), রামনাথ পাণ্ডে (ঐ), ইন্দ্র বিক্রম সিং (ঐ), চন্দ্রধর জওহরী (আগ্রা), চন্দ্রভাই জওহরী (ঐ), বাবুরাম ভার্মা (এটোয়া), গোবিন্দ কর (লক্ষ্ণৌ), হরনাম সুন্দরলাল (ঐ), শচীন বিশ্বাস (ঐ), মোহনলাল গৌতম (ঐ), জ্যোতি শঙ্কর দীক্ষিত (এটোয়া), মুকুন্দীলাল (ঐ), রামরতন শুক্লা (ঐ) বিষ্ণুশরণ দুবলিশ (মীরাট), মদন লাল (ঐ), ধৈর্য্যে সিং (ঐ), রাম-কৃষ্ণ ক্ষেত্রী (চান্দা), প্রণবেশ চ্যাটার্জি (জব্বলপুর ও বারাণসী) এবং বনোয়ারীলাল (রায় বেরিলী)। এছাড়া শচীন্দ্র নাথ সান্যালকে নাটোরে গ্রেপ্তার করে লক্ষ্ণৌ নিয়ে যাওয়া হয়। বাংলা থেকে কালিদাস বসু ও শরৎ চন্দ্র গুহ নামে আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করে

নিয়ে যাওয়া হয়। রাজেন লাহিড়ী তখন কাশীতে ছিলেন না। তাঁকে পলাতক বলে ঘোষণা করা হয়। পরে ৯ই নভেম্বর ১৯২৫ দক্ষিণেশ্বরের একটি বাড়ী খানাতল্লাসের সময়ে সেই বাড়ী থেকে অনন্তহরি মিত্র, ধ্রুবেশ চ্যাটার্জি, বীরেন ব্যানার্জি প্রভৃতির সাথে রাজনকেও গ্রেপ্তার করা হয়—এবং অন্যান্যের সাথে তাঁকেও দক্ষিণেশ্বর বোমার মোকদ্দমায় আসামী শ্রেণীভুক্ত করা হয়। কাকোরী ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার পলাতক আসামী হিসাবে তাঁকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে লক্ষ্ণৌ জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। দুই জায়গায় তাঁর বিরুদ্ধে দুটি মোকদ্দমাই চলতে থাকে।

যোগেশ চ্যাটার্জীকে হাজারীবাগ জেল থেকে লক্ষ্ণৌ জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। এ ছাড়া বারাণসীর শচীন বকসী ও চন্দ্রশেখর আজাদ এবং শাহজাহানপুরের আসফাকউল্লাকেও আসামী শ্রেণী ভুক্ত করা হয় কিন্তু তাঁরা আত্মগোপন করেন, তাঁদের নামে হুলিয়া প্রচারিত হয়।

ভগৎ সিং এবং যতীন দাসকে কাকোরী মোকর্দ্দমার বেড়াজালে আটকানো গেল না। রায়বেরিলীর বনোয়ারীলাল পুলিশের কাছে তার জবানবন্দীতে 'বলবন্ত সিং' ও 'কালীবাবু'-এই দুটি নাম করে। প্রকৃতপক্ষে—'বলবন্ত সিং' ছিল ভগৎ সিং এর ছদ্মনাম—আর, পার্টিতে যতীন দাসের ছদ্মনাম ছিল 'কালীবাবু'। বনোয়ারী লাল ঐ দুইজনকে ঐ নামেই চিনত—তাদের আসল নাম জানত না। পুলিশ সারা পাঞ্জাব তোলপাড় করেও 'বলবন্ত সিং' নামধারী কোন বিপ্লবী কর্মীর সন্ধান পায় না। কলকাতায় অনুসন্ধান চালিয়ে কালীবাবু নামক কোন বিপ্লবীর খোঁজ পাওয়া গেল না। এভাবে ঐ দুই জন কাকোরী মোকর্দ্দমা থেকে রক্ষা পায়।

দক্ষিণেশ্বর বোমার মোকর্দ্দমায় রাজেন লাহিড়ী ঘটনাচক্রে জড়িত হন। রামপ্রসাদ বিসমিল বোমা প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এ ব্যাপারে অনুশীলন সমিতি যতীন

দাসকে বলেন রামপ্রসাদকে সাহায্য করতে। যতীন দাস রাম প্রসাদকে কলিকাতায় আসবার জন্য কানপুরে খবর পাঠান। ঐ সময় রামপ্রসাদ কানপুরে ছিলেন না। এজন্য রাজেন লাহিড়ী নিজেই চলে আসেন যতীন দাসের কাছে। ঐ সময়ে অনুশীলনের যে তরুন গোষ্ঠী "অবিলম্বে বৈপ্লবিক সক্রিয়তা"র (immediate revolutionary violence এর) দাবীতে অনুশীলনের অভ্যন্তরে "অ্যাড্‌ভান্স গ্রূপ্‌" নামে একটি গোষ্ঠী গড়ে তোলেন—তাঁদের সাথে যুগান্তর দলের dissident group এর কিছু তরুণ কর্মী মিলে দক্ষিণেশ্বরে ও শোভাবাজারে দুটি বাড়ীতে বোমা প্রস্তুত করছিলেন। যতীন দাস রাজেন লাহিড়ীকে পরিচিতিপত্র দিয়ে সেখানে পাঠান। সেখানে কথাবার্তা বলতে বলতে অনেক রাত্রি হয়ে যায়। ফলে রাজেন ফিরতে পারেন না। দক্ষিণেশ্বরের ঐ গোপন বৈপ্লবিক কেন্দ্রেই তাঁকে রাত কাটাতে হয়। ৯ই নভেম্বর অতি প্রত্যুষে পুলিশ দক্ষিণেশ্বরের ঐ বাড়ী ঘেরাও করে। ফলে অন্যান্য বিপ্লবীদের সাথে রাজেন লাহিড়ীও গ্রেপ্তার হন এবং অন্যান্যের সাথে তাঁকেও দক্ষিণেশ্বর বোমার মোকর্দ্দমায় জড়ানো হয়।

সংযুক্ত প্রদেশের পুলিশ যে ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার জাল বিস্তার করে—H. R A র গোটা সংগঠনকে ধ্বংস করবার সুপরিকল্পিত প্ল্যান নিয়েই অগ্রসর হচ্ছিলেন, গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিদের নামের তালিকা থেকেই সেটা বোঝা যায়। যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় তাঁদের মধ্যে অনেকেই বামরাউলি বীচপুরী, দ্বারকাপুর বা কাকোরীর ডাকাতির সাথে কোন ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। যোগেশ চ্যাটার্জি ঐ সকল ডাকাতি অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব থেকেই জেলখানায় আটক ছিলেন। শচীন সান্যালের সাথেও ডাকাতির কোন সম্পর্ক ছিল না—কারণ অনুশীলন সমিতি ১৯২৪ সালের প্রথম ভাগেই শচীনবাবুকে বাংলায় নিয়ে এসে, প্রথমে বাঁকুড়ার এবং পরে উত্তরবঙ্গের সংগঠন পরিচালনার কার্য্যে নিযুক্ত করেন। সুরেশ ভট্টাচার্য্য কোনদিন কোন

ডাকাতিতে যোগদান করেন নাই। মাত্র রামপ্রসাদ, রাজেন লাহিড়ী, চন্দ্রশেখর, রোশন সিং, রাজকুমার সিং, প্রণবেশ চ্যাটার্জি, আস্ফাক-উল্লা প্রভৃতি ডাকাতিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বিচারের সময় অনেক আসামীর বিরুদ্ধেই সরকারপক্ষ ডাকাতির অভিযোগ প্রমাণ করতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু আসল অভিযোগ হ'ল—"ভারত সম্রাটকে তাঁর ভারতবর্ষীয় সাম্রাজ্যের সার্বভৌম অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার উদ্দেশ্যে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন (Conspiracy to wage war against the King Emperor with a view to deprive His Majesty of his Sovereignty over India) ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২১ ও ১২১ ক ধারা। বৈপ্লবিক কর্মধারাকে নির্মূল করবার জন্য ভারত সরকারের অস্ত্রাগারে রক্ষিত এই ব্রহ্মাস্ত্রটিকেই পুনঃপুনঃ ব্যবহার করেছেন।

কাকোরী মোকর্দ্দমা সারাদেশে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু স্বয়ং আসামীদের উপযুক্ত ডিফেন্সের ব্যবস্থার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি প্রথমে লক্ষ্ণৌএর শ্রেষ্ঠ উকীল পণ্ডিত জগৎনারায়ণ মুল্লাকে ডেকে এনে অনুরোধ করেন আসামী-দের ডিফেন্সের ভার নেওয়ার জন্য। কিন্তু মিঃ মুল্লা বলেন—আমি মাসে ২০ দিন ঐ মোকর্দ্দমার জন্য কাজ করব—কিন্তু বাকী দশ দিন আমাকে পরিবার প্রতিপালনের জন্য অর্থ উপার্জন করতে হবে। পণ্ডিত নেহেরু বুঝতে পারেন—পণ্ডিত জগৎনারায়ণের মনে দ্বিধা আছে। তখন নেহেরুজীর অনুরোধে ডিফেন্সের ভার গ্রহণ করেন খ্যাতনামা কংগ্রেস নায়ক পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ্। তাঁর সহ-কারীরূপে কাজ করতে থাকেন লক্ষ্ণৌ-এর কংগ্রেস নেতা মোহনলাল সাক্সেনা, চন্দ্রভান্ গুপ্ত, আর. এফ. বাহাদুরজী, অজিত প্রসাদ আগরওয়াল, দয়াশঙ্কর হাজেলা ও কলকাতার ব্যারিষ্টার জিতেন চৌধুরী। যে আসামীরা স্বীকারোক্তি করেছিল তাদের পক্ষে সর-কার থেকে উকীল নিযুক্ত হন—হরকরণ নাথ মিশ্র।

পণ্ডিত মতিলাল কাকোরী মোকর্দ্দমার আসামীদের ডিফেন্সের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গোবিন্দবল্লভ পন্থ্ ও গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থীর নেতৃত্বে একটি ডিফেন্স কমিটিও গঠন করেন। প্রথমে স্পেসাল ম্যাজিস্ট্রেট খান সাহেব আইনুদ্দিনের আদালতে প্রাথমিক তদন্তের জন্য সাক্ষ্য প্রমাণ গৃহীত হয়। প্রাথমিক তদন্তে রামদত্ত শুক্ল, গোপীমোহন, দামোদর স্বরূপ, ডি. ডি. ভট্টাচার্য্য, ইন্দ্রবিক্রম সিং, শীতলা সহায়, চন্দ্রধর জওহরী, চন্দ্রভাই জওহরী, বাবুরাম ভার্মা, জ্যোতিশঙ্কর দীক্ষিত, হরনাম সুন্দরলাল, মোহনলাল গৌতম, শরৎ চন্দ্র গুহ, রাম রতন শুক্ল, মদনলাল, ধৈরোঁ সিং ও কালিদাস বসু মুক্তিলাভ করেন। অবশিষ্ট ৩২ জনকে দায়রায় সোপরদ্দ করা হয়।

দায়রা জজ মিঃ হ্যামিল্টন ১৯২৭ সালের ৬ই এপ্রিল মোকদ্দমার রায় ঘোষণা করেন। তিনি লালা হরগোবিন্দ ও শচীন বিশ্বাসকে মুক্তি দান করেন। বারাণসী লাল ও ইন্দুভূষণ মিত্র রাজসাক্ষী হওয়ায় তাদের ক্ষমা করা হয়। সুতরাং তারাও মুক্তি লাভ করে। অবশিষ্ট ২৮ জন দণ্ডিত হন।

রামপ্রসাদ বিস্মিল, রাজেন লাহিড়ী ও ঠাকুর রোশন সিং এর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। যোগেশ চ্যাটার্জি, শচীন সান্যাল, শচীন বক্সী, গোবিন্দ কর ও মুকুন্দীলাল—এঁদের প্রত্যেকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। মন্মথ গুপ্তের হয় ১৪ বছরের দ্বীপান্তর দণ্ড। রাজকুমার সিং, সুরেশ ভট্টাচার্য্য, বিষ্ণুশরণ দুবলীশ ও রামকৃষ্ণ ক্ষেত্রী এঁদের প্রত্যেকের হয় দশ বছরের দ্বীপান্তর দণ্ড। প্রেমকিষণ খান্না, রামদুলারী ত্রিবেদী, রামনাথ পাণ্ডে ও ভুপেন সান্যাল (শচীন সান্যালের ভাই), এঁদের প্রত্যেকের হয় পাঁচ বছরের কারাদণ্ড, এবং প্রণবেশ চ্যাটার্জি ও বনোয়ারী লালের হয় ৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। (এরা দুজনেই স্বীকারোক্তি করেছিল কিন্তু রাজসাক্ষী হয় নাই। মুক্তির পরে অনুতাপের তাড়নায় প্রণবেশ আত্মহত্যা করে।)

দায়রা আদালত প্রণবেশকেও পাঁচ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। কিন্তু আউধ চীফ কোর্টে আপীলে তার দণ্ড এক বছর কমিয়ে ৪ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আপীলে অন্য আসামীদের দণ্ড বহাল থাকে—অর্থাৎ প্রণবেশ ছাড়া আর সকলের আপীলই ডিস্‌মিস্‌ হয়। প্রণবেশের স্বীকারোক্তি, দণ্ড হ্রাস ও আত্মহননের একটা পশ্চাৎপট আছে। সেটা এই--

প্রণবেশের পরিবার বারাণসীর অধিবাসী ছিল। মন্মথ গুপ্তের মাধ্যমে সে বিপ্লবী দলে ভর্তি হয়। যোগেশবাবু সংগঠন গড়ে তোলার জন্য যখন প্রথমে কাশী যান তখন তাঁর বন্ধুস্থানীয় বিপ্লবীদের মাধ্যমে তিনি প্রণবেশের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যে সকল বিপ্লবী ভারতের স্বাধীনতার জন্য বিদেশে কাজ করছিলেন—তাঁদের মধ্যে ডাক্তার চন্দ্র চক্রবর্তী, গদর পার্টির রামচন্দ্র প্রভৃতি কয়েকজনের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা স্থাপিত হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সান্‌ফ্রানসিস্‌কো নগরে। এই মোকর্দ্দমা "সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা" নামে বিখ্যাত। প্রণবেশের দাদা সুকুমার এই মোকদ্দমার অন্যতম আসামী ছিল কিন্তু সে রাজসাক্ষী হয়ে নিজের প্রাণ বাঁচায়, অপর আসামীদের কারাদণ্ড হয়। প্রণবেশ গ্রেপ্তার হওয়ার পরে তার এই দাদা জেলের মধ্যে ভাইয়ের সাথে পুনঃ পুনঃ সাক্ষাৎ করে স্বীকারোক্তি করবার জন্য তাকে প্ররোচনা দিতে থাকে। কিন্তু প্রণবেশ সব রকম প্ররোচনা সত্ত্বেও মনোবল রক্ষা করতে সমর্থ হয়। তখন তাকে অন্য আসামীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে একাকী একটি ঘরে রাখা হয়। এ সত্ত্বেও প্রণবেশ তার দৃঢ়চিত্ততা বজায় রাখে। দায়রা আদালতে তার ৫ বৎসর কারাদণ্ড হওয়ার পরে সুকুমারের প্ররোচনায় কর্তৃপক্ষ তাকে একটি ডিস্ট্রিক্ট জেলে সরিয়ে নিয়ে যায়। সে জেলে আর কোন রাজনৈতিক বন্দী ছিল না। অসহনীয় নিঃসঙ্গতায় প্রণবেশ মনের দিক দিয়ে কাতর হয়ে পড়ে। ভাইয়ের মানসিক

কাতরতার সুযোগ নিয়ে সুকুমার পুনঃ পুনঃ তার সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে তার 'মগজ-ধোলাই' এর অভিযান চালাতে থাকে। সুকুমারের পরামর্শমত সে আপীল আদালতের (আউধ্ চীফ কোর্টের) প্রধান বিচারপতির কাছে এক পত্র লিখে নিজের দোষ স্বীকার করে ও সেই পত্রে যোগেশ চ্যাটার্জি, রামপ্রসাদ ও রাজেন লাহিড়ীকে জড়িয়ে নানা বৈপ্লবিক কর্মের বিবরণ দেয়। সে পত্র অবশ্য আইনতঃ প্রমাণ হিসাবে গ্রাহ্য হতে পারে না এবং চীফ কোর্ট সেটাকে প্রমাণ হিসাবে গণ্য করতে অস্বীকার করেন। তবে প্রণবেশের দণ্ডকাল এক বছর হ্রাস করে তার ৪ বছর কারাদণ্ডের আদেশ দেন। মেয়াদ অন্তে মুক্তিলাভ করে প্রণবেশ ঘরে ফিরে আসে। কিন্তু অনুতাপের তাড়নায় মুক্তির অল্প দিন পরেই সে আত্মহত্যা করে।

কাকোরী মোকর্দ্দমার গুরুত্ব সম্পর্কে যোগেশ চ্যাটার্জি লিখেছেন—

"Though the case started with one incident of a train money action, the Government realised that the real cause behind train action was a very serious one. It was an armed challenge to the foreign domination of India by some dare-devil revolutionary youths who did not believe in reformism, but wanted to free India by armed revolution."[৩৯]

১৯১৫ সালে অনুশীলনের তৎকালীন সর্বাধিনায়ক রাসবিহারী বসু উত্তর ভারতে ভারতীয় সৈনিকদের সহায়তায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজনকে প্রায় সম্পূর্ণ করে এনে বিদেশী শাসকদের হৃৎকম্প উপস্থিত করেছিলেন। তারপর ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার জাল বিস্তার করে ২৮ জন বিপ্লবীর ফাঁসী ও শতাধিক বিপ্লবীর কঠোর কারাদণ্ড দান করে এবং তার চারবছর পরে জালিয়ানওয়ালাবাগের পৈশাচিক

হত্যাকাণ্ড এবং সমগ্র পাঞ্জাবে দানবীয় পৈশাচিকতার অনুষ্ঠান করে ইংরাজ ভেবেছিল তারা বিপ্লবীদের নিশ্চিহ্ন করতে পেরেছে। এরপর গান্ধীজীর গণ-আন্দোলনকে সুযোগ দেওয়ার জন্য বিপ্লবীরা তাদের কার্যক্রম স্থগিত রাখে। ইংরাজ শাসকেরা "বিপ্লব মারিয়াছি"—এই অলীক আত্মপ্রসাদে মগ্ন হয়ে নিশ্চিন্তে দিন যাপন করছিল। ১৯২৪ সালের শেষে অকস্মাৎ দেখতে পেলো সমগ্র উত্তর ভারতে বায়ুতাড়িত অগ্নিশিখার মত দ্রুতবেগে বিপ্লববহ্নি ছড়িয়ে পড়ছে। গোয়েন্দা রিপোর্টে প্রকাশ পেলো মাত্র একটি বছরের মধ্যে সংযুক্ত প্রদেশের ২৬টি জেলায় H.R.Aর শক্তিশালী সংগঠন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের নিদ্রালস চক্ষু থেকে সুখনিদ্রা অন্তর্হিত হল। তাই ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে বিপ্লবনিধনের সুযোগ সন্ধান করতে লাগলো শাসক সম্প্রদায়। বিপ্লবীদলকে উৎখাত করবার সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি থেকেই কাকোরী ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার সৃষ্টি। কাকোরী ট্রেন ডাকাতির তুচ্ছ ঘটনা তাদের অভীপ্সিত সুযোগ তাদের হাতে ধরিয়ে দিল।

কাকোরী ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় সরকার পক্ষ প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে বিপুল আয়োজনে যুদ্ধযাত্রা করেন। যেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসে বর্ণিত উদয়পুর বিজয়াভিলাষে ঔরংজীবের সমরায়োজনের মত। অন্যদিকে তেমনি অভিযুক্ত আসামীগণের নিরুদ্বেগ নির্ভীকতা দেশবাসীকে মুগ্ধ করে।

স্পেসাল ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ আইনউদ্দিনের এজলাসে ৫৬ দিন ধরে ২৪৭ জন সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হয়। জেল থেকে আদালতে নিয়ে আসা এবং ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় আসামীগণ সারিবদ্ধ হয়ে দুপায়ের 'শিকলী-বেড়ি' তালে তালে বাজিয়ে জাতীয় সঙ্গীত গান করতে করতে প্রত্যহ আসা যাওয়া করতেন। রাস্তায় ভীড় জমে যেতো। এই বিবরণ নজরুলের "আজি রক্ত নিশি ভোরে" সঙ্গীতটির অবিস্মরনীয় দুটি ছত্র মনে করিয়ে দেয়—

ওরা দুপায়ে দলে গেল মরণ-শংকারে
সবারে ডেকে গেল শিকল-ঝঙকারে ॥

যোগেশ চ্যাটার্জি লিখেছেন—

"Every day when we were driven through different routes from Jail to the Court, crowds of men lined up on the road side. This went on for a year and a half in the city of Lucknow and it was itself a big propaganda for the death-defying revolutionaries of India"[৪•]

স্পেসাল ম্যাজিস্ট্রেট খান সাহেব আইনউদ্দিন ২৬ জন আসামীকে দায়রায় সোপর্দ্দ করেন। তার মধ্যে বীরভদ্র তেওয়ারীর ও জ্যোতি শঙ্কর দীক্ষিতের *বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় এবং ইন্দুভূষণ ও বানারসীলাল রাজসাক্ষী হওয়ায় তাদেরকে মার্জনা (pardon) করা হয়। বীরভদ্র তেওয়ারীর বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা প্রত্যাহৃত হওয়ায় অপরাপর আসামীদের মনে সন্দেহ উৎপাদন করে। রামপ্রসাদ, যোগেশবাবু, ও শচীনবাবু উদ্বিগ্ন হন। কারণ বীরভদ্রের বিরুদ্ধে সাজা হওয়ার উপযুক্ত যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ ছিল। পরবর্তীকালে গোয়েন্দা দপ্তরের কাগজ পত্র থেকে জানা গিয়েছে যে মুক্তির পরে বীরভদ্র পুলিশের বেতনভোগী ইন্‌ফরমারের কাজ গ্রহণ করে এবং ১৯৩১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদের আলফ্রেড্ পার্কে পলাতক আসামী চন্দ্র শেখর আজাদের অবস্থানের খবর বীরভদ্রই পুলিশকে জানায়।

* ৮৬ পৃষ্ঠায় ভুলক্রমে নিম্ন আদালত থেকে খালাস-পাওয়া আসামীদের নামের সাথে জ্যোতিশঙ্করের নাম মুদ্রিত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে জ্যোতিশঙ্কর দায়রায় সোপর্দ্দ হওয়ার পর তার উপর থেকে অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

যার ফলে সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর সাথে একক সম্মুখ যুদ্ধে আজাদ নিহত হন প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য H.S R.A-র কর্মীরা দুইবার বীরভদ্রের প্রাণনাশের চেষ্টা করেন কিন্তু দুইবারই সে বরাতজোরে বেঁচে যায়।

দায়রা আদালতে মোকদ্দমা চলতে থাকা কালে পলাতক আসামী শচীন্ বক্সী ও আসফাকউল্লা ধরা পড়েন এবং দুইটি স্যাপ্লিমেণ্টারী মোকদ্দমায় তাঁদের বিচার হয়ে তাঁরাও দণ্ডিত হন। আসফাকউল্লার প্রাণদণ্ড ও শচীন বক্সীর ১৫ বছর কারাদণ্ড হয়।

এই মোকদ্দমায় প্রদত্ত দণ্ডাদেশ তৎকালীন বিভিন্ন সংবাদপত্রে কঠোরভাবে সমালোচিত হয়। দণ্ডাদেশে যৎপরোনাস্তি হিংস্রতা প্রকাশ পেয়েছিল।

দায়রা আদালতে প্রায় ২৫০ জন সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হয়, দুইশতেরও বেশী দলিল নথিভুক্ত করা হয় (অর্থাৎ documentary exhibits রূপে প্রমাণ ব্যবহৃত হয়)। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল—১৯৮ নং Exhibit। এটা হল হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান্ অ্যাসোসিয়েশনের গঠণবিধি (Constitution) ও কার্য্য প্রণালী (Rules and Regulations)। এই দলিলখানিই আসামীদের বিরুদ্ধে মারাত্মক অস্ত্রের কাজ করে। ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সরকারের উচ্ছেদ এবং তার স্থানে এমন এক স্বাধীন সরকার স্থাপন করা যার লক্ষ্য হবে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা (eradication of every sort of exploitation of man by man) এবং সেইরূপ বিদ্রোহ সংঘটনের উদ্দেশ্যে ডাকাতি প্রভৃতির দ্বারা অর্থ সংগ্রহ এবং অবৈধ উপায়ে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ—এ সকল অভিযোগ প্রমাণের ব্যাপারে নিম্ন আদালত থেকে আপীল আদালত প্রত্যেকেই এই দলিলখানির উপরে সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া অন্যান্য দলিলের মধ্যে ছিল - ১৯২4 সালের ৩ অক্টোবর তারিখে কানপুরে

অনুষ্ঠিত H. R. A.-র "কৌন্সিল মিটিং" এর কার্য্যবিবরণী, এছাড়া ছিল "বিজয়কুমার" নামের ছদ্মস্বাক্ষরে একখানি মুদ্রিত বৈপ্লবিক ইস্তাহার যা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রচারিত হয়েছিল বলে সরকার পক্ষ থেকে প্রমাণ দাখিল করেন।

কাকোরী মোকর্দ্দমা সম্পর্কে আরও ২/১ টি আনুষঙ্গিক ঘটনা আছে যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বীরবিপ্লবী ভগৎ সিং এর অসমসাহসিকতা এবং দলীয় সতীর্থগণের প্রতি তাঁর আনুগত্য বোধের দৃষ্টান্ত হিসাবে এই ঘটনাগুলির উল্লেখ করা যায়। নিম্ন আদালতে ও দায়রা কোর্টে যখন সহকর্মীদের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা চলছে, সেই সময় ভগৎ সিং প্রচণ্ড বিপদের ঝুঁকি নিয়ে প্রায়শঃ এসে আদালতগৃহে বসে থাকতেন। গোয়েন্দা পুলিশ তাঁর পরিচয় জানতে পারলে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ঐ মোকর্দ্দমায় আসামী শ্রেণীভুক্ত করে দেবে—এ কথা জেনেও ভগৎ সিং প্রায় প্রত্যহ বিচারের সময়ে আদালতগৃহে এসে বসে থাকতেন। ওদিকে কিন্তু রামপ্রসাদ প্রভৃতির গ্রেপ্তারের পরে—H. R A র নেতৃত্ব ভগৎ সিং এর উপরেই ন্যস্ত হয় এবং তখন ভগৎ ও তাঁর তরুণ সহকর্মীরা প্রচণ্ড বেগে গুপ্ত বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন।

দণ্ডাদেশ ঘোষিত হওয়ার পর যোগেশবাবুকে প্রথম ফতেগড় জেলে, তারপর সেখান থেকে আগ্রা জেলে এবং পরে আবার আগ্রা থেকে লখনৌ জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি যোগেশবাবুর আগ্রা থেকে লখনৌ স্থানান্তরের জন্য নির্দ্ধারিত দিনের কথা জানতে পারেন এবং স্থির করেন যে আগ্রা ষ্টেশন থেকে তাঁরাও গোপনে ট্রেনে উঠবেন এবং কানপুরের ৫ মাইল পশ্চিমে একস্থানে শিকল টেনে ট্রেন থামিয়ে যোগেশবাবুকে মুক্ত করে নিয়ে যাবেন। জেলকর্তৃপক্ষ পূর্বে স্থির করেছিলেন, যে টেনটি রাত্রি দশটায় আগ্রা ষ্টেশন ছেড়ে লখনৌ এর দিকে যায়, সেই ট্রেনে যোগেশবাবুকে নিয়ে যাওয়া হবে—ভগৎ সিংদের কাছেও সেই মর্মে

গোপন সংবাদ পাঠানো হয়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে জেল কর্তৃপক্ষ তাঁকে সন্ধ্যা ছয়টার ট্রেনে পাঠায়। এই সময় পরিবর্তনের কথা ভগৎ সিং ও তার সঙ্গীরা বিলম্বে জানতে পারেন। তাঁরা তাড়াতাড়ি আগ্রা ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হন। বটুকেশ্বর দত্ত ও রাজগুরু যোগেশবাবুকে হাতকরি-বেড়ী-পরিহিত অবস্থায় দেখতে পান এবং দূর থেকে সঙ্কেত প্রদান করেন। কিন্তু ততক্ষণে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, 'উদ্ধার-কর্মীরা' (Rescue party-র বিপ্লবীরা) ট্রেনে উঠতে পারেন না! সময়ের সামান্য অপ্রতুলতার দরুণ উদ্ধার-আয়োজন ব্যর্থ হয়।

ঐ দিন রেস্‌কিউ পার্টিতে ছিলেন—ভগৎ সিং, রাজগুরু, বটুকেশ্বর দত্ত, বিজয় কুমার সিং, শিব বর্মা, সদাশিব রঘুনাথ ও ঝাঁসির ভগবান দাস মাহোর (শেষোক্ত ব্যক্তি ১৯২৯ সালের 'ভুশোয়াল বোমার মোকর্দ্দমায় দশ বৎসরের দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন—মেয়াদঅন্তে আন্দামান থেকে ফিরে এসে কোন কলেজে অধ্যাপকরূপে কাজ করতে থাকেন) ভগবান দাস মাহোর H.R.A H.S R.A র বৈপ্লবিক কার্য্য সম্পর্কে একখানা বই লিখেছেন। এই পুস্তকে তিনি উল্লেখ করেছেন যে উদ্ধার আয়োজন ব্যর্থ হওয়ায় ভগৎ সিং শিশুর মত ক্রন্দন করতে থাকেন।

পূর্বোক্ত দুটি ঘটনার মধ্যে ভগৎ সিং এর সাহসিকতা ও আন্তরিকতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রয়েছে।

কাকোরী মোকর্দ্দমায় যে চারজন বীরবিপ্লবীকে জীবন বলি দিতে হয়েছে, তাঁদের সম্বন্ধে সামান্য কিছু ব্যক্তিগত পরিচয় লিপিবদ্ধ করে এই অধ্যায় শেষ করছি।

রামপ্রসাদ বিসমিল — জন্ম ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান, কিন্তু যৌবনপ্রাপ্তির সাথে সাথে "সত্যার্থ-প্রকাশ" পাঠ করে মুগ্ধ হন এবং আর্য্য সমাজে যোগদান করেন। তার

জন্য আপন পরিবার ও আত্মীয়গণের সাথে বিচ্ছেদ ঘটে। পিতৃগৃহে তাঁর স্থান হল না। ১৯১৬ সালে লখনৌ কংগ্রেসের সময় স্বেচ্ছাসেবকরূপে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবন সুরু হয়। লোকমান্য তিলকের মাধ্যমে বিপ্লবী দলের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। ১৯১৮ সালে মৈনপুরী ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার তিনি পলাতক আসামী ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ হওয়ার পর general amnesty তে তাঁর নামের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহৃত হয়। তিনি ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক। যোগেশ চ্যাটার্জি লিখেছেন—"his nerves were made of steel"। ব্যক্তিগত জীবনে সততা, দয়ালুতা, সাহসিকতা ও জনসেবাপরায়ণতার জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি রূপে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি সংযম অভ্যাস করেছিলেন, নিয়মিত ব্যায়াম করতেন। আহার করতেন মাত্র একবেলা; ব্যঞ্জনের মধ্যে শুধু সব্জী সিদ্ধ (মসলার রান্না খেতেন না)। কয়েকখানি পুস্তক লিখেছেন, আরও কয়েকখানি অনুবাদ করেছেন। Condemned cell এ বসেও তিনি কবিতা রচনায় সময় কাটাতেন। ঠাকুর রোশন সিং ও আস্ফাকউল্লা তাঁর মাধ্যমেই বিপ্লবী দলে ভর্তি হন।

১৯২৭ সালের ১৯শে ডিসেম্বর গোরখ্পুর জেলে রামপ্রসাদের ফাঁসী হয়।

ঠাকুর রোশন সিং — বাড়ী শাহ্জাহানপুরে। সম্মানিত রাজপুত 'ঠাকুর' বংশের সন্তান। ১৯২১ সালে গান্ধীজী-পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে দুই বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করেন। এই সময়ে বৈরিলী জেলে দণ্ডভোগকালে বহুতর দেশ-প্রেমিকের সংস্পর্শে আসেন। কারামুক্তির পর অহিংস আন্দোলনের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মে ও তাঁর স্বগ্রামবাসী রামপ্রসাদ বিস্মিল তাঁকে বৈপ্লবিক পথে দীক্ষিত করেন। তিনি দক্ষ কুস্তিগীর ছিলেন এবং লাঠি ও বন্দুক চালনাতেও দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।

তাঁর দৈহিক ও মানসিক শক্তি ছিল অপরিসীম। কাকোরী মোকর্দ্দমায় বিচারাধীন বন্দীরূপে জেলখানায় আবদ্ধ থাকার সময়ে তাঁর পিতার মৃত্যু সংবাদ আসে। তিনি অত্যদ্ভুত চিত্তস্থৈর্য্যের সাথে এই শোক বহন করেন। এই সময়ে একবার তিনি অনশন (hunger strike) করেন ১৬ দিন ব্যাপী। কিন্তু ১৬ দিন অনাহারে থেকেও স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতেন, যেন কিছুই হয় নাই।

যোগেশ চ্যাটার্জি লিখেছেন—"he took the sentence without the least change of appearance." তাঁর প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হওয়ার পর তাঁর বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয়বগ বড়-লাটের কাছে দয়াভিক্ষা করে দরখাস্ত পাঠানোর জন্য তাঁকে পীড়া-পীড়ি করতে থাকেন। কিন্তু ঠাকুরজীকে টলানো গেল না। বৃন্দাবনের গুরুকুল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ণরত তাঁর পুত্র বাইরে কোন ব্যক্তি-র কাছে শুনেছিল যে তার পিতা বড়লাটের কাছে দয়াভিক্ষা করে দরখাস্ত দিয়েছেন। সে ক্ষুব্ধ হয়ে পিতার সাথে সাক্ষাৎ করে ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করলে রোশন সিং ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ছেলেকে বলেন, —'আমি ঠাকুর বংশের ছেলে—বেইমানের বংশে আমার জন্ম হয় নাই। তুচ্ছ প্রাণটাকে বাঁচানোর জন্য শত্রুর কাছে দয়াভিক্ষা করব?" ১৯২৮ সালের ২০শে ডিসেম্বর নইনী সেণ্ট্রাল জেলে তাঁর ফাঁসী হয়।

রাজেন্দ্র লাহিড়ী — অধুনা 'বাংলাদেশের' অন্তর্গত পাবনা জেলার লাহিড়ীমোহনপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ লাহিড়ী বংশে তাঁর জন্ম। তাঁর দুই পিতৃব্য অমূল্য লাহিড়ী ও জল্লেশ (ওরফে মনি) লাহিড়ী অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন এবং দুজনকেই স্বাধীনতা সংগ্রামে দীর্ঘদিন কারাবাসে কাটাতে হয়েছে। সুতরাং বিপ্লবীর পরিবারে তার জন্ম। তার ফলে কৈশোরকাল থেকে দেশের

স্বাধীনতার পিপাসা তাঁর অন্তরে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল। রাজেন্দ্র তার পরিবারের একাংশের সাথে কাশীতে বাস করছিল। সেই সময় সে নিজেই উদ্যোগ করে একজন প্রাক্তন বিপ্লবীর সহায়তায় শচীন্দ্রনাথ সান্যালের সাথে পরিচিত হয়। যোগেশবাবু যখন উত্তর-প্রদেশে দলীয় সংগঠনের ভার নিয়ে কাশীতে পৌঁছান রাজেন্দ্র তখন বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। রাজেন্দ্রের সাহিত্যিক মেধা ছিল। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা 'বঙ্গ-সাহিত্য পরিষদ' ছিল—রাজেন্দ্র ছিল তার সম্পাদক। অনুশীলনপন্থী সাপ্তাহিক পত্রিকা 'শঙখ' এবং 'বঙ্গবাণী'তে তার কিছু কিছু লেখা প্রকাশিত হয়। কাকোরীর ঘটনার সময়ে রাজেন্দ্র ছিল এম. এ ক্লাশে অধ্যয়ণরত। যোগেশবাবু লিখেছেন—"He was an out and out revolutionary and revolted against social prejudices, and though a brahmin he threw away his sacred thread ...realised at heart that the social prejudices were great hindrances in the path of progress and they were to be broken mercylessly".[৪১] ফাঁসীর পূর্বে যে তার মাতাকে পত্র লিখে জানায়—"মনে হচ্ছে দেশের জন্য আমাদের জীবনবলির প্রয়োজন আছে। মৃত্যু কি? সে ত জীবনেরই আর এক দিক প্রাতঃকালের সূর্য্যালোকের মত মৃত্যু সকলেরই সুনিশ্চিত ভবিতব্য"—১৯২৮ সালের ১৭ই ডিসেম্বর গোণ্ডা জেলে রাজেন্দ্রর ফাঁসী হয়।

আস্‌ফাকউল্লা — শাহজাহানপুরের অধিবাসী। নিজের মনে তাঁর অপার দুঃখ যে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে উল্লেখযোগ্যরূপে অংশ গ্রহণ করে নাই। নিজের অন্তরের তাগিদে নিজেই রামপ্রসাদের কাছে গিয়ে বিপ্লবী দলে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করে। মুসলমান বলে রামপ্রসাদ প্রথমে তাকে আমল দেন নাই—কারণ তাঁর ধারণা ছিল গুপ্তবৈপ্লবিক কার্য্যে মুসলমানদেরকে

গ্রহণ করা নিরাপদ নয়। কিন্তু আস্‌ফাক অপরিমিত ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা চালাতে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত আস্‌ফাকের চরিত্রগুণ ও তার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে রামপ্রসাদ তাকে H. R. A.-তে ভর্তি করে নেন। তারপর থেকে উভয়ে পরস্পরের প্রতি গভীর ভালবাসায় আবদ্ধ হন। আস্‌ফাক ছিল ধনীবংশের সন্তান। অল্পবয়সে তার চরিত্র ছিল শরৎবাবুর 'রামের সুমতি' গল্পের রামের মত। দুষ্টামি ও উদারতার সংমিশ্রণ। সাম্প্রদায়িকতাবোধের লেশমাত্রও আস্‌ফাকের মধ্যে ছিল না। সে সার্থকভাবে প্রমাণ করেছে যে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড হিন্দু বা মুসলমান কোন এক সম্প্রদায়ের একচেটিয়া এক্তিয়ারভুক্ত নয়। পলাতক অবস্থায় যে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের হোষ্টেলে থেকেছে—কেউ সন্দেহ করতে পারেনি যে সে অহিন্দু। পলাতক অবস্থায় আরও থেকেছে উত্তর প্রদেশের প্রবীণ অনুশীলন নেতা অর্জ্জুনলাল শেঠীর বাড়ীতে। শেঠী মহাশয়ের যুবতী কন্যা তার প্রতি প্রণয়াকৃষ্ট হয়ে পড়েছে—একথা বুঝতে পেরে সে কাউকে কিছু না বলে স্থানান্তরে চলে যায়। তাঁর ফাঁসীর সংবাদে অর্জ্জুনলালজীর কন্যা শয্যাগ্রহণ করে এবং অল্পদিন পরে মারা যায়। গোয়েন্দা-অফিসার খাঁ বাহাদুর তাসদ্দিক হোসেন তাকে নানাভাবে সরকারপক্ষের দিকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করেন। বলেন—'তুমি মুসলমান, কাফেরদের লড়াইতে তুমি কেন যোগ দেবে?" পুনঃ পুনঃ এই কথা বলে উত্যক্ত করতে থাকলে একদিন আস্‌ফাক তাকে বলে—"আপনার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। রামপ্রসাদকে আমি হিন্দু বলে মনে করি না। আমরা উভয়েই 'হিন্দুস্থানী'। আমি হিন্দুর স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছি না। হিন্দুস্থানের স্বাধীনতার জন্য আমার লড়াই। আমাকে যদি বলা হয়—'তুমি 'হিন্দুর অধীনতা' ও 'ইংরাজের অধীনতা' এ দুটি বিকল্পের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণ করবে—তা হ'লে আমি আনন্দে হিন্দুর অধীনতাই বরণ করব — কারণ, হিন্দুরা বিধর্মী হলেও

আমার দেশের লোক আর ইংরেজ বিদেশী"। H R. A তে যতগুলি রত্ন সংগৃহীত হয়েছিল আস্ফাকউল্লা তাদের মধ্যে উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের মত দেদীপ্যমান। নিজের জীবন দিয়ে সে প্রমাণ করে গিয়েছে—ভারতবর্ষ হিন্দুরও নয়, মুসলমানেরও নয়, ভারতবর্ষ ভারতবাসীর। ১৯২৭ সালের ১৯শে ডিসেম্বর ফৈজাবাদ জেলে এই বীর বিপ্লবী নির্বিকারচিত্তে ফাঁসীমঞ্চে জীবন বিসর্জন করেন।

কাকোরী যজ্ঞের যিনি হোতা অর্থাৎ যে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডকে শৃঙ্খলিত করবার উদ্দেশ্যে কাকোরী ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার জাল প্রস্তুত করা হয়েছিল—সেই কর্মকাণ্ডের যিনি নায়ক ছিলেন তাঁর সামান্য কিছু পরিচয় ইতঃপূর্বে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য পাঠকজনের সামনে উপস্থিত করা সমুচিত মনে করছি।

যোগেশ চ্যাটার্জি—জন্ম ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জিলার অন্তর্গত গাঁওদিয়া গ্রামে। ১৪ বছর বয়স থেকে কুমিল্লা সহরে বাস করতে থাকেন পড়াশোনার জন্য। সেখানে বিখ্যাত বিপ্লবী নরেন চ্যাটার্জি ও পূর্ণ চক্রবর্তীর মাধ্যমে প্রথম যৌবনেই তিনি অনুশীলন সমিতির সাথে যুক্ত হন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজনের সময় যোগেশবাবু ও তৎকালীন কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হন এবং এই সময়ে আর একজন দুর্ধর্ষ বিপ্লবীর সান্নিধ্যলাভ করেন—তিনি খ্যাতনামা অতীন্দ্রমোহন রায়। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন ব্যর্থ হওয়ার পর ১৯১৫ সালের ভারতরক্ষা আইনের বেড়াজালে সরকার তখন বিপ্লবী কর্মীদেরকে ছেঁকে তুলতে থাকেন। অতএব তাঁর পিতৃব্যের গৃহতল্লাসী হয় এবং তিনি বাড়ীর পিছনের দরজা দিয়ে পলায়ন করেন। কিছুকাল এদিকে ওদিকে আত্মগোপন করে থাকবার পরে দলের নির্দ্দেশে কলিকাতায় অনুশীলন সমিতির গোপন শেল্টার ৩৯ নং পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটে এসে বাস করতে থাকেন।

৯ই অক্টোবর, ১৯১৬—যোগেশবাবু খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েছেন। বন্ধ দরজায় বার বার করাঘাতের শব্দ শোনা গেল। বারানসী ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার পলাতক আসামী নরেন ব্যানার্জি তখনও শেল্টারে ফিরে আসেন নাই। নরেনবাবুই দুয়ারে করাঘাত করছেন—এইরূপ মনে করে যোগেশবাবু দরজা খুলতেই দুজন ষণ্ডামার্কা পুলিশ কর্মচারী দুদিক থেকে তাঁকে চেপে ধরল। সদ্যঘুমভাঙ্গা যোগেশবাবু বুঝতে পারলেন গোপন শেল্টারের সব বাসিন্দাকেই ওরা এবার খাঁচায় পুরবে। পরদিন প্রাতে চন্দননগর থেকে শিশির দত্তগুপ্ত আগের রাত্রির ঘটনার কিছু না জেনে শেলটারে এসে হাজির হতে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার। সন্ধ্যায় ঠিক একই প্রকার অবস্থায় গ্রেপ্তার হলেন অতীন্দ্র মোহন রায়। পলাতক আসামী নরেন ব্যানার্জী দ্বিতীয়বার পলাতক হলেন।

গ্রেপ্তারের পর যোগেশবাবুকে নিয়ে যাওয়া হয় তৎকালীন গোয়েন্দা পুলিশ হেড্কোয়ার্টার ৪নং কীড্ ষ্ট্রীটে। এইখানেই তখন ছিল পুলিশের "torture chamber"। মনোজ পাল ও মনি বসু নামে দুই বাঙ্গালী পুলিশ অফিসার ছিলেন torture-কলার ডক্টরেট্—অর্থাৎ টাকার লোভে বাঙ্গালী খয়েরখাঁয়েরা যে বাঙ্গালীর প্রতি কত হীন, ঘৃণ্য, নিষ্ঠুর ও পাশবিক আচরণ করতে পারে—এ দুজন তার প্রমাণ রেখে গিয়েছেন। ৪নং কীড্ ষ্ট্রীটে নীচের তলায় কতকগুলি তারের জালি দিয়ে ঘেরা খুপ্রী ছিল। এগুলি পূর্বে ছিল ঘোড়ার আস্তাবল। ধৃত রাজনৈতিক বন্দীদের প্রথমে এনে এই নোংরা খুপ্রীতে রাখা হত। আহার্য যা দেওয়া হত তা মানুষের অখাদ্য এবং পরিমাণে বিড়ালের আহারের সমতুল্য। কোন মাদুর বা কম্বল দেওয়া হত না—নোংরা খুপ্রীতে একবস্ত্রে বন্দীদের তালাবন্ধ করে রাখা হত। যোগেশবাবুকে এই খুপ্রীতে রাখা হয়। স্নানের ব্যবস্থা ছিল না। পানীয়জলও এত কম দেওয়া হত যাতে বন্দীরা সব সময় তৃষ্ণায় ছট্ফট্ করে। খুপ্রী থেকে

নিয়ে যাওয়া হ'ত অফিসারের ঘরে। এই ঘরের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যোগেশবাবু লিখেছেন—'The man started filthy abuses and put several questions to me. I remained silent. The officer's intention, of course, was to extort confession. * * * With filthy abuses he started striking me on bone joints so heavily that with every strike the joints swelled. * * * After a dozen blows where he stopped to breaths, the joints of my body were so swollen, that it appeared as if I was suffering from some peculiar disease. But my silence made him more enraged and more abuses and more strikes followed He struck my chest and back several times with the end of the stick. Blood came out from different parts of my body and there was suffocating pain in my heart and lungs * * * With night fall the peon was ordered to bring a cane and brutal caning followed. I was made to lie on the table and my legs were raised and cane strikes went on underneath my feet. It was already late night and the officer had to leave me possibly for drinks. I was sent to the stable cell with strict order that I must not be allowed even to sit. I should be bayonetted on any such attempts'[৪১ক]

এখানে যে officer এর কথা লেখা হয়েছে তিনি মনোজ পাল। যোগেশবাবু তারপর লিখছেন —

"One day the drunk Manoj Pal became very angry and told the peon to bring pieces of beaf from the Deputy commissioner's cook and push those inside my mouth. Next the idea came to him to put urine etc. in my mouth. No sooner did he express an idea than a man in European costume jumped at it and helped in its execution. Owing to tortures, starvation and sleeplessness, I was extremely weak. They caught hold of me and forced my mouth inside the commode. * * * They poured urine mixed with excreta all over my body and locked me in the cell. For three days they did not allow me to have a wash. After three days, I got the first chance of wash in the Calcutta Presidency Jail"[৪১৭]

ঐ ৪ নং কীড্ স্ট্রীটেই একদিন যোগেশবাবুর দুই পা টেনে ফাঁক করে মাঝখানে প্রায় দুই হাত পরিমাণ ব্যবধান রেখে মাঝখানে একটা লোহার ডাণ্ডা আটকে দেওয়া হয়—(যাতে ঐ ব্যবধানে এক ইঞ্চি পরিমাণ সঙ্কুচিত করবারও কোন উপায় না থাকে) এবং এই অবস্থায় তাঁকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এতেও কোন ফল হল না দেখে তাঁকে টেবিলের উপরে এমনভাবে চেপে শুইয়ে রাখা হয় যে কোমর থেকে সুরু করে শরীরের নিম্নাংশটাই থাকে টেবিলে এবং উর্দ্ধাংশ—যোগেশবাবুর ভাষায়—"was kept suspended in the air"। এই নিষ্ঠুরতাও চলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দীর্ঘসময়ব্যাপী। তারপর হাতদুটাকে হাতকড়িবদ্ধ করে এবং দুই পায়ে বেড়ী এঁটে তাঁকে উলঙ্গ করে দাঁড় করিয়ে রাখে গোয়েন্দাবিভাগের পিশাচেরা।

অনুরূপ পৈশাচিক অত্যাচার আরও অনেকের উপরে করা হয়েছিল ঐ ৪ নং কীড্ স্ট্রীটে। এঁদের মধ্যে ছিলেন—অরুণ চন্দ্র গুহ, আশুতোষ কালী, শিশির দত্তগুপ্ত, নলিনীকান্ত ঘোষ, ক্ষেত্র সেন, অনন্ত হালদাব প্রভৃতি।

প্রেসিডেন্সি জেলেও যোগেশবাবুর উপরে অমানুষিক অত্যাচার হয়। প্রতিবাদে যোগেশবাবু অনশন সুরু করেন। এটাই কারাগারে যোগেশবাবুর প্রথম hunger strike। পাঁচ দিন অনশনের পর যোগেশবাবুকে রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলে বদলী করবার ব্যবস্থা হয়। শিয়ালদহ ষ্টেশনে নিয়ে এসে তাঁকে গাড়ীতে উঠানোর পর যোগেশবাবু অনশন ভঙ্গ করেন।

যোগেশবাবু ১৯১৮ সালে রাজসাহী জেল থেকে তাঁর উপরে ও অন্যান্য রাজবন্দীদের উপবে পৈশাচিক অত্যাচারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে, তদানীন্তন বড়লাটের কাছে একখানি দরখাস্ত পাঠান। এই দরখাস্তের একটা প্রতিলিপি গুপ্ত উপায়ে পাঠানো হয় নির্ভীক সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। রামানন্দবাবু ঐ দরখাস্তের কতকাংশ ১৯১৮ আগষ্ট মাসের মর্ডান রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। রাজবন্দীদের উপরে পৈশাচিক অত্যাচারের বিবরণ দিয়ে দুইখানা গোপন চিঠি তৎকালীন কংগ্রেস সভানেত্রী শ্রীমতী এ্যানি বেসান্তের হাতেও পৌঁছায়। এর মধ্যে একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন অনুশীলনের গুহী সদস্য ঢাকার উকীল (পরবর্তী কালের খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য) মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। নোয়াখালী জেলার কুতুবদিয়া দ্বীপে মনোরঞ্জনবাবুর শ্যালক (বিপ্লবী নায়ক প্রতুল গাঙ্গুলীর ভ্রাতা) ধীরেন গাঙ্গুলী এবং আরও অনেককে অন্তরীনাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। মনোরঞ্জনবাবু গোয়েন্দাবিভাগের অনুমতি নিয়ে ধীরেনবাবুর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে ধীরেনবাবু কুতুবদিয়ার রাজবন্দীদের উপরে অত্যাচারের বিবরণ ও অত্যাচারিত রাজবন্দীদের নামের

একটি তালিকা মনোরঞ্জনবাবুকে দেন। মনোরঞ্জনবাবু পুলিশের চোখ এড়িয়ে কাগজখানা নিয়ে আসেন এবং গোপনে তার নকল পাঠিয়ে দেন শ্রীমতী আনি বেসান্তের কাছে।

এইভাবে অত্যাচারের বিবরণ বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়ায় জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহে সমালোচনা প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯১৮ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন বসে। ঐ সম্মেলনের সভাপতি (তৎকালীন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য) শ্রী অখিলচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁর সভাপতির ভাষণে রাজবন্দীদের উপর অত্যাচারের কঠোর সমালোচনা করেন। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক অখিলবাবুকে সমর্থন করে মন্তব্য প্রকাশ করেন। চারি-দিক থেকে আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে। সরকার বাধ্য হয়ে তাঁদের মুখবন্ধের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করেন দুই জন মাত্র সদস্য নিয়ে, তার একজন শ্বেতাঙ্গ-(Hon'ble Stevension Moore) এবং একজন ভারতীয় (খ্যাতনামা রাজভক্ত স্যার বি. সি. মিত্র)। অত্যাচারিত বন্দীদের অনেককেই সাক্ষ্য দিতে ডাকা হল না—যোগেশবাবুকেও সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয় নাই। সরকারপক্ষে পুলিশের বড়কর্তা প্রভৃতি সাক্ষ্য দেন। তাঁদের জেরা করবার কোন সুযোগ বন্দীদের ছিল না। অতএব এ জাতীয় তদন্তের যে ফল হওয়া স্বাভাবিক সেই ফলই ঘটল। কমিটি তাদের রিপোর্টে বললেন—"অত্যাচারের কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেল না"।

১৯২০ থেকে কাকোরী মোকর্দ্দমার সমাপ্তিকাল পর্যন্ত যোগেশ চ্যাটার্জির জীবনকাহিনী পূর্বেই উক্ত হয়েছে।

কাকোরী মোকদ্দমায় দণ্ডিত হয়ে আগ্রা জেলে আটক থাকা অবস্থায় যোগেশবাবুর Hunger strike একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। কাকোরী মোকর্দ্দমার পরে ঐ মোকর্দ্দমার তদন্তকারী গোয়েন্দা অফিসার রায় বাহাদুর জিতেন ব্যানার্জিকে গুলী করেন H.R.A.র-

সক্রিয়কর্মী মনীন্দ্র ব্যানার্জি। গুলী করবার সময়ে তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলেন—"কাকোরীর প্রতিশোধ"। ভাগ্যক্রমে রায়বাহাদুর প্রাণে বেঁচে যান—হত্যার চেষ্টার অভিযোগে মনীন্দ্রের দশ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। রাজনৈতিক বন্দীর মর্য্যাদা এবং অন্যান্য কতক-গুলী দাবীর ভিত্তিতে ফতেগড় জেলে মনীন্দ্র অনশন করেন এবং সেই অনশনের ফলে মনীন্দ্রের মৃত্যু ঘটে। যতীন দাসের পরে এই ব্যাপারে মনীন্দ্র দ্বিতীয় শহীদ। মনীন্দ্রের মৃত্যু সংবাদে ব্যথিত হয়ে যোগেশবাবু স্থির করেন—মনীন্দ্রের দাবীগুলি পূরণার্থে তিনি অনশনব্রত অবলম্বন করবেন। ফলে ১৯৩৪ এর ১৯ জুলাই যোগেশবাবু আগ্রা জেলে উক্তরূপ দাবীর ভিত্তিতে অনশন ধর্মঘট সুরু করেন। অপর কাকোরী বন্দী শচীন্ বক্সীও অনশন সুরু করেন—কিন্তু কিছুকাল পরে তার আমাশয় রোগ দেখা দিলে যোগেশবাবুর অনুরোধে তিনি অনশন ত্যাগ করেন। যোগেশবাবুর এই অনশন চলে ২৯শে নভেম্বর পর্য্যন্ত। সর্বসমেত ১৪১ দিন। অনশনের মধ্যে জেলকর্তৃপক্ষ তাঁর হাত-পা বেঁধে তাঁর নাকের মধ্যে নল পুরে দিয়ে জোর করে খাওয়ানো (force feeding) সুরু করে। force feeding party চলে যাওয়া মাত্র যোগেশবাবু গলার মধ্যে পাখীর পালক ঢুকিয়ে বমি করে সমস্ত খাদ্য উদ্গীরণ করে ফেলতেন। উপায়ান্তর না দেখে নভেম্বর মাসে জেলকর্তৃপক্ষ তাঁর মুক্তির সুপারিশ করে গভর্নমেণ্টের কাছে পত্র দেয়। সমস্ত সহকর্মীদেরকে জেলে আবদ্ধ রেখে এ ভাবে মুক্তি অর্জনের মত মানসিকতা তাঁর ছিল না। এ জন্য তিনি মুক্তির আদেশ প্রতিরোধ করবার জন্য ১৪১ দিন পরে—স্বেচ্ছায় অনশন ত্যাগ করেন। যোগেশবাবুর তৃতীয় অনশন সুরু হয়, লক্ষ্ণৌ জেলে ১৯৩৫ এর অক্টোবরে। দাবীগুলি পূর্ববৎ। এ যাত্রায় অনশন চলে একটানা ১১০ দিন।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের নূতন শাসনবিধি (১৯৩৫ এর ভারত শাসন আইন) অনুসারে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসদল

তৎকালীন সংযুক্ত প্রদেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের নেতৃত্বে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করে। তারপরে কাকোরী বন্দীগণের মুক্তিদান করা হলে যোগেশ চ্যাটার্জি বাইরে আসেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হওয়ায় ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে প্রধান প্রধান বিপ্লবীদেরকে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে আটক করা হয়। সেই সময় যোগেশবাবুকেও ঐ সালের মে মাসে গ্রেপ্তার করে লখনৌ জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেইবছরেই তিনি দেউলী বন্দীশালায় স্থানান্তরিত হন। এই দেউলীতে যোগেশবাবু তাঁর চতুর্থবারের অনশন সুরু করেন। অনশনের সপ্তদশ দিনে ৫ই নভেম্বর ১৯৪১ তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। একবছর পূর্ণ হওয়ার আগেই ১৯৪২ এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন সুরু হওয়ার সাথে সাথে তাঁকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয় এটাহ্‌ জেলে। এবারে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় কোন এক পুলিশ কর্মচারীকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে। জেলের মধ্যেই বিচার সম্পন্ন হয় এবং তাঁর প্রতি ১০ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

এর পূর্বেই ১৯৪০ সালের রামগড় কংগ্রেসের সময়ে অনুশীলন পন্থীরা কম্যুনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের বাইরে স্বতন্ত্র মার্ক্সবাদী পার্টিরূপে "ভারতের বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল" (R. S. P. I.) গঠন করেন এবং যোগেশবাবুই এই নূতন দলের প্রথম সম্পাদকপদে বৃত হন। ১৯৩৫ সালে কারাগারে আবদ্ধ থাকবার সময়েই অনুশীলনের নেতৃবর্গ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন—অতঃপর অনুশীলন দল মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স-লেনিন-নির্দ্দেশিত পথে সমাজবাদী বিপ্লবের কর্মধারা অনুসরণ করবেন। তৎকালে "ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি কম্যুনিষ্ট ইণ্টারন্যাশনালের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ষ্ট্যালিনের প্রভাবাধীন তৃতীয় ইণ্টারন্যাশনালের ভূমিকা সম্পর্কে অনুশীলন দলের নীতিগত মতপার্থক্য থাকায় অনুশীলন নেতৃবৃন্দ স্থির করেন তাঁরা স্বতন্ত্রভাবে

মার্ক্স-লেনিনবাদী পথে সমাজবাদী বিপ্লবের জন্য কাজ করবেন'
১৯৩৮এ নেতৃবৃন্দের কারামুক্তির পর অনুশীলনপন্থীগণ স্বতন্ত্র গ্রুপ হিসাবে মার্ক্স-লেনিনবাদী পথে কাজ সুরু করেন। কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে জানা গেল স্বতন্ত্র পার্টি গঠন না করে স্বতন্ত্রভাবে মার্ক্স-লেনিনবাদী পথে কাজ করা সম্ভব নয়। সেইজন্য ১৯40 এর মার্চ মাসে "বিপ্লবী সমাজবাদী দল (R. S. P.)" নাম দিয়ে স্বতন্ত্র মার্ক্সবাদী পার্টি গঠন করা হয়। তারপরেই মে মাসে যোগেশ-বাবু গ্রেপ্তার হন।

যোগেশবাবু জেলে আটক থাকবার সময়েই তাঁকে প্রধান আসামী করে লখনৌ বড়বাঁকি ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা স্থাপিত হয়। উত্তর-প্রদেশে আর. এস. পির কর্মধারা ছিল এই মোকর্দ্দমার বিষয়বস্তু। যথাস্থানে এই মোকর্দ্দমার বিবরণ প্রদত্ত হবে। এই মোকর্দ্দমায় যোগেশবাবুর উপরে ৭ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। এই সময়েও বন্দীদের প্রতি অমানুষিক ব্যবহারের প্রতিবাদ করে যোগেশবাবু অনশন করেন ১৯৪৬ সালের ১৬ই জানুয়ারী থেকে ৬ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত।

যোগেশ চট্টোপাধ্যায় ১৯১০ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল অর্থাৎ ক না ৩৭ বৎসর সক্রিয়ভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে যুক্ত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে ২৩ বৎসরকাল তাঁর কারান্তরালে কেটেছে। তিনি আর. এস. পির সাধারণ সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ১৯৫২ সাল পর্য্যন্ত।

দেওঘর ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা—১৯২৭

কাকোরী ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমায় উত্তরভারতের বৈপ্লবিক সংস্থার প্রায় সমস্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে কর্মক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে পুলিশ প্রধানেরা ভেবেছিলেন বিপ্লবীদের তারা শেষ করেছেন।

কিন্তু পরাধীন দেশে অত সহজে বিপ্লব শেষ হয় না। তাছাড়া অনুশীলন সমিতির চিরাচরিত রীতি অনুসারে বয়োজ্যেষ্ঠ নেতার বা নেতাদের অপসারণ ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে তরুণতর গোষ্ঠী সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করত। সুতরাং কাকোরীর পরে তরুণেরা নেতৃত্ব গ্রহণে এগিয়ে এলো। এই তরুণদের মধ্যে অনেকেরই বিপ্লবী হিসাবে যোগ্যতা ও দক্ষতা ছিল উচ্চমানের। ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগবতীচরণ ভোরা প্রভৃতি তরুণেরা, বয়োজ্যেষ্ঠদের অপসারণের ফলে সংগঠনে যেটুকু শূণ্যতা দেখা গিয়েছিল তা পূরণ করবার জন্য প্রযত্নশীল হলেন। বিভিন্ন প্রদেশের সংগঠনে উদ্দীপনা আনবার জন্য তরুণ গোষ্ঠীর বিশিষ্ট কমিশন প্রতি প্রদেশে ভ্রমণের কর্মসূচী গ্রহণ করলেন। ঢাকা জেলার অনুশীলন কর্মী বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিহারে H.R.A সংগঠন নিয়ে কাজ করছিলেন। ১৯২৭ সালে তিনি আসামের সংগঠনকে শক্তিশালী করবার জন্য আসামের জেলায় জেলায় ভ্রমণ করেন। আসাম থেকে ফিরে আসবার সময়ে তিনি দেওঘরে গ্রেপ্তার হন। তাঁর গৃহতল্লাসী করে দুটি 'মজার পিস্তল' (manser pistol), কিছু কার্তুজ এবং একখানি নোটবুক পুলিশ হস্তগত করে। নোটবুকে সাঙ্কেতিক লিপিতে (cypher এ) ৬৮ জন H.R.A সদস্যের নাম ঠিকানা লেখা ছিল। পুলিশ সেই সাঙ্কেতিক লিপির পাঠোদ্ধার করে বাংলা, বিহার, পাঞ্জাব, আসাম ও সংযুক্ত প্রদেশের নানা স্থানে খানাতল্লাস চালায়। এই খানাতল্লাসীর সূত্রে এলাহাবাদের ডাঃ শৈলেন্দ্র চক্রবর্তীর গৃহ থেকেও কিছু আপত্তিজনক জিনিষপত্র পাওয়া যায়। এই সাঙ্কেতিক লিপি, কার্তুজ, পিস্তল প্রভৃতির উদ্ধারকে কেন্দ্র করে "দেওঘর ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা" স্থাপিত হয়। ডাঃ শৈলেন চক্রবর্তী, বীরেন ভট্টাচার্য্য, সুরেন ভট্টাচার্য্য, শ্রীহট্টের উপেন্দ্র ধর, চট্টগ্রামের সুখেন বিকাশ দত্ত, কাছাড়-হাইলাকান্দির সুশীল সেন, হাওড়ার প্রসাদ চ্যাটার্জি, বিজন ব্যানার্জি ও

লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ, খুলনা জেলার অতুল দত্ত এবং নদীয়া-শান্তিপুরের বিশ্বমোহন সান্যাল এই মোকর্দ্দমায় আসামী ছিলেন। বিচারে শৈলেন চক্রবর্তী ও উপেন্দ্র ধরের সাত বৎসর করে কারাদণ্ড হয়। বীরেন্দ্র, সুরেন্দ্র, প্রসাদ, সুশীল ও বিজন—এদের প্রত্যেকের হয় পাঁচ বছরের কারাদণ্ড। অবশিষ্টদের প্রত্যেকের তিন বছরের কারাদণ্ড হয়। ঢাকা থেকে অনুশীলন সমিতির নেতা ও বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় দেওঘরে গিয়ে এই মোকর্দ্দমায় আসামী পক্ষ সমর্থন করেন।

দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা—১৯২৯

ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার গুরুত্ব অপরিসীম। ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর আত্মদান যতীন দাসের বজ্রকঠিন সঙ্কল্প ও তিলে তিলে প্রাণ বিসর্জন শুধু ভারতবর্ষের নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অগণিত মানুষকে চমকিত করেছিল। এই ইতিহাসের সূত্রপাত হল ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর অদ্বিতীয় দেশপ্রেমিক জননায়ক পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায়ের উপরে ইংরাজের পুলিশবাহিনীর উদ্ধত ও নৃশংস লগুড়াঘাতের মধ্য দিয়ে।

ভগৎ সিং ও চন্দ্রশেখর আজাদের নেতৃত্বে উত্তর ভারতে বিপ্লবী সংগঠন কাকোরীর ক্ষয়ক্ষতি পুরণ করে নিয়ে পুনরায় দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে। যোগেশবাবু গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে H.R.A-র নাম পরিবর্তন করে ওর মধ্যে "সোস্যালিষ্ট" শব্দটি যোগ করে নূতন নামকরণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু যোগেশবাবুর আকস্মিক গ্রেপ্তার এবং তারপর কাকোরী মোকর্দ্দমার প্রচণ্ড আঘাত সামাল দিতেই তখন বাইরের বিপ্লবীরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ায় নাম পরিবর্তনের বিষয় নিয়ে কেউ মাথা ঘামানোর সময়

পান নাই। অনুশীলন সমিতি ঐ সময়ে সাম্যবাদের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে পড়েছেন। সুতরাং ভগৎ সিং ও চন্দ্রশেখর সংগঠনকে জোরদার করবার জন্য নাম পরিবর্তনের আবশ্যকতা অনুভব করলেন। এ ব্যাপারে বাংলার অনুশীলন নেতৃবৃন্দের অনুমোদন প্রাপ্ত হয়ে ১৯২৮ সালের ৮ই ও ৯ই সেপ্টেম্বর দিল্লীর ফিরোজ শাহ্ কোটলায় প্রধান প্রধান পার্টিসভ্যগণের এক সভা আহ্বান করলেন আজাদ ও ভগৎ সিং। সেই সভায় পার্টির নাম পরিবর্তন করে নূতন নাম হল—'হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি"—"H.R.A"-র বদলে "H.S.R.A"। এ সম্পর্কে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সরকার-নিযুক্ত ইতিহাস লেখক W. H. Hale লিখেছেন—

"It is significant that the new name selected for the party was "Hindusthan Socialist Republican Army". The immediate programme of the party included rescue from Jail of Jogesh Chatterjee and Shachindra Nath Sanyal, Kakori convicts, and action against Simon Commission. It was further decided that bombmakers from Bengal should be invited to instruct members of the party in their art. Other resolutions were passed for murder of approvers in Kakori Case and the Commission of dacoity in order to raise funds.[৪২]

এর কিছুপরেই সেই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যা থেকে দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার উদ্ভব। ভারতবর্ষে স্বাধীনতার দাবী তখন ক্রমশঃই তীব্রতর হচ্ছে। কিছু কিছু রিফর্মের মোয়া ভারতীয়দের হাতে ধরিয়ে দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবর্দ্ধমান গতিবেগকে কিঞ্চিৎ প্রশমিত করবার মতলবে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট

কতটুকু স্বায়ত্বশাসন ভারতবাসীকে দেওয়া যায় তা পরীক্ষা করে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে এক কমিশন গঠন করেন। ঐ কমিটির সব সদস্যই ছিলেন শ্বেতাঙ্গ। কংগ্রেস ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের এই ঔদ্ধত্যকে জাতীয় অবমাননা বলে আখ্যাত করে এবং কমিশন ভারতবর্ষে উপস্থিত হলে তাকে সর্ব-প্রকারে বয়কট করবার জন্য ভারতবাসীগণের প্রতি আহ্বান জানায়। কমিশন যেদিন ভারতে পদার্পন করেন সেদিন ভারতব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট ও বিক্ষোভ মিছিলে সারা ভারত উত্তাল হয়ে ওঠে। তারপর কমিশন যে দিন যে প্রদেশে পদার্পন করেন সেদিন সেই প্রদেশে অনুরূপ ধর্মঘট ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হতে থাকে।

১৯২৮ সালের নভেম্বর মাসে কমিশন যেদিন পাঞ্জাব প্রদেশে পদার্পন করেন, সেদিন সমগ্র পাঞ্জাবে ধমঘট হয়। সারা পঞ্চনদ মিছিলে মিছিলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। লাহোরে সুবৃহৎ বিক্ষোভ মিছিলের নেতৃত্ব করছিলেন পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায়। লাহোর পুলিশের সুপারিণ্টেডেণ্ট Mr. Scott ও সহকারী সুপারিণ্টেডেণ্ট Mr. Saunders এর নেতৃত্বে এক পুলিশবাহিনী মিছিলের গতিরোধ করে পৈশাচিক লাঠি চাজ সুরু করে দেয়। বৃদ্ধ লালাজীর বুকে লাঠির আঘাত লেগে তাঁর বুকের হাড় ভেঙ্গে যায়। এই আঘাতের ফলে ১৮ই নভেম্বর লালাজীর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

সমস্ত দেশ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। জনচিত্ত ক্ষোভে উদ্বেল, ক্রোধে উত্তপ্ত। H. S. R. A সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে লাহোর পুলিশের অধ্যক্ষ স্কটকে হত্যা করে সাম্রাজ্যবাদী ঔদ্ধত্যের জবাব দিতে হবে।

পরিকল্পনা অনুসারে ১৭ই ডিসেম্বর (অর্থাৎ লালাজীর মৃত্যুর দিন থেকে যেদিন একমাস পূর্ণ হয় সেইদিন) ভগৎ সিং, চন্দ্র-শেখর, শিবরাম রাজগুরু, জয় গোপাল সশস্ত্র অবস্থায় পুলিশ হেড

কোয়ার্টারের সম্মুখে অপেক্ষা করতে থাকে। W. H Hale লিখেছেন—"The conspirators made elaborate plans for their escape on bicycles" [৪৩] জয়গোপাল ছিল পুলিশ হেড্ কোয়ার্টারেব কাছাকাছি। এক সময়ে পলিশের সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সণ্ডার্স বেরিয়ে আসেন, জয়গোপাল তাকেই স্কট বলে মনে করে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী সঙ্কেত প্রদান করে সহকর্মীদের জানিয়ে দেয় যে স্কট বেরিয়ে যাচ্ছে। সণ্ডার্স একখানা লাল রং এর মোটর সাইকেলে উঠে ষ্টার্ট দিতে যাবেন, এমন সময়ে শিবরাম রাজগুরু গুলী ছোঁড়ে। সণ্ডার্স মোটর সাইকেলের উপরে উপুড় হয়ে পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে ভগৎ সিং এগিয়ে এসে পর পর ৪/৫টি গুলী ছোঁড়েন। সণ্ডাসের নিষ্প্রাণ দেহ মাটির উপরে গড়িয়ে পড়ে। বিপ্লবীরা পূর্বপরিকল্পনা মত সাইকেল চেপে পালাতে থাকেন—পুলিশের কিছু লোক তাদেরকে অনুসরণ করতে থাকে। লাহোর ডি, এ, ভি কলেজের কাছাকাছি এসে চন্দ্রশেখর অনুসরণকারীদের অগ্রবর্তী হেডকনেষ্টবল চন্নন সিংকে গুলীবিদ্ধ করে; সে ধরাশায়ী হলে অন্য অনুসরণকারীরা পালিয়ে যায়। বিপ্লবীরা নিরাপদে আপন আপন গন্তব্যস্থানে প্রস্থান করতে সমর্থ হন। এই ঘটনার পরদিন পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে H.S.R A র নামাঙ্কিত পোষ্টার দেখা যায়—যার উপরে লেখা ছিল—"লালাজীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে।" সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বৈপ্লবিক ইস্তাহারও ছড়ানো হয় এই প্রতিশোধ গ্রহণের সমর্থন করে। এই ইস্তাহারে এই বলে সন্তোষ প্রকাশ করা হয় যে—"ভারতের জনগণ মরেনি—তাদের দেহের শোণিতে এখনও উত্তাপ আছে।" ইস্তাহারের শেষে লেখকের ছদ্মনাম অঙ্কিত ছিল—"বালরাজ, H.S R A-র পাঞ্জাব শাখার সর্বাধিনায়ক"।

এত বড় ঘটনা, অথচ পাঞ্জাবের গোয়েন্দাবিভাগ প্রকৃত অপরাধীদের চিহ্নিত করবার মত কোন সূত্র আবিষ্কার করতে

পারল না। চন্দ্রশেখর কাকোরী ষড়যন্ত্রের পর থেকে পুলিশের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করে পলাতক অবস্থায় সংগঠনের কাজে সর্বত্র পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন। সণ্ডার্স-হত্যার কিছু পরে বন্ধুদের পরামর্শে কলকাতায় এসে অনুশীলনের গোপন শেলটারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। লাহোর থেকে কলকাতা এই দীর্ঘপথ তাঁকে সন্দেহ-মুক্ত রাখবার জন্য ভগবতীচরণ ভোরার পত্নী বিপ্লবিনী দুর্গাবতী ভোরা ভগৎ সিং এর স্ত্রী সেজে ট্রেনে সারাপথ তাঁর সঙ্গে আসেন এবং তাঁকে অনুশীলনের আস্তানায় পৌঁছে দিয়ে যান।[৪৪] এই তেজস্বিনী মহিলাকে পরবর্তীকালে তৃতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমায় আসামী শ্রেণীভুক্ত করা হয় কিন্তু অন্যান্যদের সাথে তিনিও পলাতক হন। পরবর্তীকালে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহে অক্ষম হয়।

ওদিকে ইংরাজের পুলিশ প্রকৃত আসামীদের খোঁজে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত ছুটাছুটি করছে—এদিকে ভগৎ সিং অনুশীলন-নেতাদের সহায়তায় উত্তর-ভারতের H.S.R.A কর্মীদের 'বোমা-প্রস্তুত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছেন। বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে যত বোমা ব্যবহৃত হয়েছে, তার প্রায় সমস্তই বঙ্গদেশে প্রস্তুত করা হয়েছে। এমন কি ১৯১৫ সালে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে যে সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন হয়, তার প্রচুর পরিমাণে বোমা বাংলাদেশে প্রস্তুত করে উত্তর ভারতে পাঠানো হয়েছে। ১৯২৪ থেকে উত্তর ভারতে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সাতিশয় বিস্তৃতি ঘটায় বঙ্গদেশ থেকে বোমা নিয়ে উত্তর ভারতে ব্যবহার করবার ব্যাপারে অসুবিধা দেখা দেয় এবং এই ব্যবস্থায় যে প্রচুর বিপদের ঝুঁকি আছে, সে কথাও উত্তর ভারতের বিপ্লবীগণ অনুভব করতে থাকেন। এ ব্যাপার নিয়ে ভগৎ সিং অনুশীলন নেতাদের সাথে আলোচনা করলে তাঁরা প্রথমে নিছক সন্ত্রাসবাদী কর্মসূচী গ্রহণ না করবার জন্য ভগৎ সিংকে পরামর্শ দেন। কিন্তু ভগৎ সিং পাঞ্জাবের অবস্থা বর্ণনা

করে নানা যুক্তি সহকারে নেতাদের বুঝাতে চেষ্টা করেন যে বঙ্গদেশে বিপ্লবী কাজকর্মে sporadic violence এর যুগ অতিক্রান্ত হয়ে থাকলেও পাঞ্জাবে তার কিছু কিছু প্রয়োজন এখনও আছে। তাছাড়া, ভবিষ্যতে কোন ব্যাপক অভ্যুত্থান সংঘটনের সময় যখন আসবে, তখনও বোমার প্রয়োজন। অতএব উত্তর ভারতের কতিপয় বিপ্লবীকে বোমাপ্রস্তুত বিদ্যায় শিক্ষিত করে রাখবার প্রয়োজন আছে। শেষ পর্য্যন্ত অনুশীলন নেতারা ভগৎ সিং এর যুক্তি মেনে নিয়ে যতীন দাসকে নিযুক্ত করেন উত্তর ভারতের কতিপয় বিপ্লবীকে বোমাপ্রস্তুত সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দানের জন্য। W. H. Hale লিখেছেন—

"Towards the end of this month (December 1928), Bhagat Sing went to Calcutta where he made enquiries about bombs and endeavoured to arrange for some one to teach the party how to make explosives By 14th February 1929, several members of the party had foregathered in Agra and bomb making began under the direction of Jatindranath Das." [৪৫]

H.S.R.A র সাথে যতীন দাসের এই যোগাযোগের জন্যই দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমায় তাঁকে আসামীশ্রেণীভুক্ত করা হয়। কাকোরী ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার পূর্ব থেকেই H.R.A র সাথেও যতীন দাসের যোগাযোগ ছিল। কিন্তু কাকোরী মোকর্দ্দমার রাজসাক্ষী বানারসীলাল যতীন দাসের সঠিক নাম প্রকাশ করতে অসমর্থ হওয়ায় সেই যোগাযোগের বার্তা গোয়েন্দা দপ্তরে পৌঁছায় নাই। ভগৎ সিং একটা কোন চমকপ্রদ কাজ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। W.H. Hale লিখেছেন ভগৎ ও তাঁর সহকর্মীরা প্রথমে স্থির করেন সাইমন কমিশনের উপর বোমা ফেলা

হবে। কিন্তু পরে ঐ পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয় ও স্থির হয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় বোমা ফেলা হবে। এই ব্যাপারের পটভূমি অনুশীলন সমিতির তৎকালীন সর্বাধিনায়ক ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ) তাঁর আত্মজীবনীতে নিম্নলিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ—

"১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেসের সময় ভগৎ সিং কলিকাতা আসিয়া আমাদের সহিত দেখা করিয়াছিল। ভগৎ সিং এর সহিত লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত রামশরণ দাসও ছিলেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন সেনের আপার সার্কুলার রোডের বাসায় ভগৎ সিং, রামশরণ দাস ও আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়। ঐ আলোচনার সময়ে প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন ; ভগৎ সিং এর ধারণা ছিল—পাঞ্জাব ঘুমাইয়া আছে—পাঞ্জাবকে জাগাইতে হইলে জমকালো (Sensational) কিছু করিতে হইবে। ভগৎ সিং আমাদের নিকট কিছু বোমা ও পিস্তল চাহিল। আমরা ১৯২০ সালের পর হিংসাত্মক কর্মানুষ্ঠান ছাড়িয়া দিয়াছি। আমাদিগের মতে দেশ জাগিয়াছে, এখন লোকদেখানো কিছু (demonstration) করিবার প্রয়োজন নাই। এখন প্রয়োজন গণআন্দোলনের মারফৎ জনগণের বৈপ্লবিক চেতনা জাগানো। ব্যাপক সংগ্রামের জন্যই সংগঠন প্রয়োজন। * * * ভগৎ সিং বলিল—'পাঞ্জাব অনেক পিছনে পড়িয়া আছে, পাঞ্জাবকে জাগাইতে হইবে * * * ভগৎ সিং সন্ত্রাসমূলক কাজ (Terrorism) আরম্ভ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিল, অনেক নজির দেখাইল। অবশেষে ভগৎ সিং আমাকে বলিল—'আপনি রামশরণবাবুকে * জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিজে একবার

---

* রামশরণ দাস ১৯১৫ সালের ভারতব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজনে রাসবিহারী বসুর একজন প্রধান সহকারী ছিলেন। প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমায় তাঁর দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড হয় ; দীর্ঘদিন আন্দামানে মহারাজের সহ-বন্দী ছিলেন তিনি।

পাঞ্জাব গিয়া পাঞ্জাবের অবস্থা দেখিয়া আসুন"। * * * আমরা ভগৎ সিংকে খুশী করিবার জন্য কয়েকটা পিস্তল ও বোমা দিলাম। আমি পরে রামশরণ দাসকে বলিয়া দিলাম—'এখন এই পিস্তল বোমা ব্যবহার করিবেন না'। ভগৎ সিং খুশী হইয়া চলিয়া গেল।[৪৬]

ভগৎ সিংকে যে বোমা দেওয়া হয়েছিল তারই মধ্য থেকে একটা ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত ১৯২৯ সালের ১৮ই এপ্রিল দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন চলতে থাকাকালে সভাকক্ষে নিক্ষেপ করে। এ ব্যাপারে নলিনীকিশোর গুহ লিখেছেন :—

"ভগৎ সিং আরও বলেন—'এমন কাজ করিতে হইবে যাহাতে পৃথিবীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। দিল্লীর অ্যাসেম্বলিতে কিছু করা যায় কিনা দেখিতে হইবে।' আলোচনার পর প্রতুলবাবুরা অস্ত্র দিতে সম্মত হন। যতীন দাসও পূর্ব হইতেই কিছু একটা করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন। ভগৎ সিংকে কয়েকটা রিভলভার দিলে ভগৎ বোমাও চাহেন। যতীন দাস নূতন নূতন ধরণের যে বোমা তৈয়ারী শিখিয়াছিলেন তাহা পুরাতন পদ্ধতিতে তৈয়ারী বোমার মত* শক্তিশালী না হইলেও ভগৎ সিং

---

* 'পুরাতন পদ্ধতিতে তৈয়ারী বোমা' বলতে নলিনীবাবু 'রাজাবাজার বোমার' কথা বলতে চেয়েছেন। রাজাবাজার বোমা প্রচণ্ডরূপে শক্তিশালী ছিল। ১৯১৪ সালে রাজাবাজার বোমার কারখানা ধরা পড়ে। শশাঙ্ক হাজরার ১৫ বছর কারাদণ্ড হয়। তারপরেও চন্দননগরে 'রাজাবাজার বোমা' তৈয়ারী হয়েছে। কিন্তু ১৯২০ সালের পরে নেতারাই বোমা প্রস্তুত বন্ধ করে দেন। পরে ১৯২৬-২৭ সাল থেকে নবপর্য্যায়ের বোমা তৈয়ারী সুরু হয়। যতীন দাস এই নবপর্য্যায়ের বোমা তৈয়ারী শিখেছিলেন। এগুলি রাজাবাজার বোমার মত শক্তিশালী হয় নাই।

আর বিলম্ব করিতে চাহেন নাই। যতীনের তৈয়ারী বোমাই অ্যাসেম্বলীতে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। দিল্লী পরিষদের বোমা কার্য্যকরী অর্থাৎ মারাত্মক হয় নাই। অবশ্য, ভগৎ সিং বোমা ফাটাইতেই চাহিয়াছিলেন কাহাকেও হত্যা করিতে নহে।"[৪৭]

১৮ই এপ্রিল ১৯২৯ সাল। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন বসেছে। বিঠলভাই প্যাটেল (V. J. Patel—অর্থাৎ বল্লভভাই প্যাটেলের অগ্রজ সর্বজনমান্য দেশনেতা) তখন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অধ্যক্ষ। পূর্বোক্ত তারিখের কিছুদিন পূর্বে সরকার পক্ষ থেকে দুটি নূতন আইনের খসড়া (Bill) ব্যবস্থাপক সভার অনুমোদনের জন্য সভায় উত্থাপন করা (introduced) হয়। প্রস্তাবিত নূতন আইন দুটির একটির নাম ছিল "Public Security Bill" এবং অপরটির নাম ছিল "Trades Dispute Bill"। প্রথমটির উদ্দেশ্য ছিল কম্যুনিজম-পন্থী কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রণ। তৎকালীন বাংলা সংবাদপত্রে ঐ Bill টিকে "বলশেভিক বিতাড়ন Bill" বলে উল্লেখ করা হত। ঐ আইনে ভারতবর্ষে বিদেশী সাম্যবাদীদের আগমন ও তাদের কাজকর্মের উপরে নানা-বিধ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবার প্রস্তাব ছিল এবং এর একটি ধারায় বলা হয়েছিল যে কোন অ-ভারতীয় বাইরে থেকে এসে আপত্তিজনক মতবাদ প্রচার করছেন—এরকম জানা গেলে ঐ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে ভারত থেকে নির্বাসিত করা যাবে। আর Trades Dispute Bill এ ছিল শিল্পবিরোধ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রস্তাবিত বিধিবিধান। তখন মতিলাল নেহেরু কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিরোধী পক্ষের নেতা। Bill দুইটি সভায় উপস্থাপিত হলে বিরোধী পক্ষ থেকে বৈধতার প্রশ্ন (point of order) উত্থাপন করা হয়। Public Security Bill সম্পর্কে বিরোধী পক্ষ থেকে বলা হয় যে কম্যুনিজম দমন করতে সরকার 'মীরাট ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা' বলে আখ্যাত একটি মোকর্দ্দমা স্থাপন করেছেন। ঐ

মোকদ্দমায় সরকার পক্ষ আসামীদের বিরুদ্ধে যে সকল ঘটনার অভিযোগ এনেছেন Public Security Bill এর উদ্দেশ্য ও যুক্তিযুক্ততা সম্পর্কীয় বিবৃতিতে (Statement of Objects and Reasons এর মধ্যে) সেই সকল ঘটনার উল্লেখ আছে। অতএব বিচারাধীন মোকদ্দমার বিষয়বস্তু ব্যবস্থাপক সভায় আলোচিত হতে পারে না। অধ্যক্ষ ভি. জে. প্যাটেল সকল পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করে ১৮ই এপ্রিল (১৯২৯) তারিখে বৈধতার প্রশ্ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত (Ruling) ঘোষণা করবেন বলে দিন স্থির করেন।

১৮ই এপ্রিল যথাসময়ে ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন সুরু হল। দুটি উত্তেজনাসৃষ্টিকারী Bill এর উপরে উত্থাপিত বৈধতার প্রশ্নে সভার অধ্যক্ষ কি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তা শ্রবণের আগ্রহে দর্শকের গ্যালারী সেদিন পরিপূর্ণ। তারই মধ্যে দোতালার গ্যালারীতে আসন সংগ্রহ করেছেন ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত। যথাসময়ে তাঁরাও এসে গ্যালারীতে উপবেশন করেছেন। সবুজ রং-এর খদ্দরে প্রস্তুত President's costume পরিহিত অধ্যক্ষ প্যাটেল প্রথমে Public Security Bill টিকে বিধিবহির্ভূত বলে ঘোষণা করলেন। বললেন—যতদিন মীরাট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা বিচারাধীন থাকবে ততদিন Public Security Bill সম্পর্কে ব্যবস্থাপক সভায় কোন আলোচনা হতে পারবে না। বিরোধীপক্ষ থেকে এবং দর্শকের গ্যালারী থেকে প্রবল করতালিধ্বনির দ্বারা অধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত অভিনন্দিত হল। করতালিধ্বনি শান্ত হলে অধ্যক্ষ ঘোষণা করলেন—

"Now I proceed to pronounce my decision upon the point of order raised in respect of the Trades Dispute Bill ....."

ঐ কথাগুলি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে সভাকক্ষ প্রকম্পিত হল। ব্রাম্। ব্রাম্। একটি নয়—দুটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছে ব্যবস্থাপক সভার মেঝের উপরে—সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো লাল কাগজে মুদ্রিত কতকগুলি ইস্তাহার—শিরোনামায় বড় বড় অক্ষরে লেখা—"To make the deaf hear a great noise is required".

"The untold story" পুস্তকের লেখক বি. এম্. কাউল সেদিন ভগৎ সিংদের পাশেই দর্শকের গ্যালারীতে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি পূর্বোক্ত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। পূর্বোক্তনামা পুস্তকে তিনি লিখেছেন—

"...... Soon after, there was a commotion in the house. Two youngmen sitting next to me, whom I did not know, suddenly sprang up to their feet One of them pulled out a bundle of leaflets from under his coat and threw them in all directions. The leaflets carried the caption- 'To make the deaf hear ... motto of French Revolution, and. in a flash, two bombs had been hurled in quick succession by Bhagat Sing and B. K Dutt which exploded on the floor of the House creating a resounding blast. Pandemonium was let loose and people ran helter-skelter. A fat and frightened nominated member crawled under a bench to save his skin. Another one ran towards the lavatory. Only two leaders kept standing like rock—Vithalbhai Patel and Motilal Neheru. The latter shouted at members of his party-

"Arey bhai, bhagte keyon ho! ye to koi apna hi admi malum hote hain"[৪৮]

ভগৎ ও বটুকেশ্বর পলায়নের চেষ্টা করলেন না। ব্যবস্থাপক সভার দর্শক গ্যালারীতে নির্বিকার চিত্তে দাঁড়িয়ে রইলেন, তাঁদের গ্রেপ্তার করা হল। তখনও পর্য্যন্ত পুলিশ সণ্ডার্স-হত্যার কোন হদিস পায় নাই। ওঁদের দুজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল— "নরহত্যার চেষ্টার"—ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৭ ধারা। তার সাথে অস্ত্র-আইন ও বিস্ফোরক পদার্থ আইনের অভিযোগও যুক্ত করা হল। যদিও কোন লোককে আঘাত করবার উদ্দেশ্য ভগৎ ও বটুকেশ্বরের ছিল না এবং যে বোমা ফেলা হয়েছিল তা কারও মৃত্যু ঘটানোর মত শক্তিশালী ছিল না তথাপি ইংরাজের আদালতের বিচারে পূর্বোক্ত অভিযোগে তাঁরা উভয়েই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হলেন। W. H Hale অবশ্য লিখেছেন— ঘটনার সময়ে ভগৎ সিং কোন বিশেষ ব্যক্তিকে লক্ষ্য না করে দুই-বার তাঁর পিস্তল থেকে গুলী ছোঁড়ে (Bhagat Sing also fired two unaimed shots)। [৪৯]

পূর্বোক্ত ঘটনার সাতদিন পরে (অর্থাৎ ১৯২৯ এর ১৫ এপ্রিল) পুলিশ গোপনসূত্রে সংবাদ পেয়ে লাহোরে H. S. R. A র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হানা দেয়। সেখানে পুলিশ একটি তাজা বোমা, আটটি বোমার খোল, প্রচুর পরিমাণে বোমা প্রস্তুতের উপযোগী রাসায়নিক পদার্থ, নোটবুক, বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের নানারকম দলিলপত্র এবং অনেক 'আপত্তিজনক' পুস্তক উদ্ধার করে। ঐ কেন্দ্রে ঐ সময়ে শুক-দেব, কিশোরীলাল ও জয়গোপাল উপস্থিত ছিলেন। শুকদেবের কাছে একটি কার্তুজভরা রিভলভার ছিল। পুলিশ এঁদের তিনজনকে গ্রেপ্তার করে।

এই ঘটনার প্রায় এক মাস পরে (অর্থাৎ ১৩ই মে ১৯২৯) পুলিশ শাহারানপুরে H. S. R. A র প্রধান কর্মকেন্দ্রে হানা দেয়।

সেখান থেকে পুলিশ ছয়টি তাজা বোমা, তিনটি রিভলভার, তিনটি বোমার খোল, প্রচুর পরিমানে বোমা প্রস্তুতের মসলা (রাসায়নিক দ্রব্য) এবং বেশ কিছু সংখ্যক 'আপত্তিকর' পুস্তক উদ্ধার করে। ওর মধ্যে একখানা ছিল "Manufacture and use of explosives"। ঐদিন ওখানে উপস্থিত ছিলেন শিব ভার্মা এবং জয়দেব কাপুর—তাঁরা ধৃত হন। গয়াপ্রসাদ শাহারানপুরের কর্ম-কেন্দ্রে পুলিশ-হানার ও সহকর্মীদের গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদ অবগত ছিলেন না। শাহারানপুর কার্য্যালয়ে যে দিন পুলিশ হানা দেয় তার দুই দিন পরে তিনি ঐ কার্য্যালয়ে প্রবেশের উপক্রম করতে সেখানে পাহারারত সাদা পোষাকের পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এর পর নানাস্থানে গ্রেপ্তার চলতে থাকে। বেতিয়ার ফনী ঘোষ, এবং পাঞ্জাবের হংসরাজ ভোরা কিছু পরে ধরা পড়েন। পুলিশের অত্যাচারে জয়গোপাল, ফনী ঘোষ এবং হংসরাজ ভোরা স্বীকারোক্তি করে। তার ফলে মহাবীর সিং (এটাহ. উত্তর প্রদেশ), বিজয় কুমার সিং (কানপুর, কাকোরী ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় দণ্ডিত রাজ-কুমার সিংএর ভ্রাতা), কেবলনাথ ত্রিবেদী (চাম্পারণ, বিহার), কুন্দনলাল (বারাণসী), প্রেম দত্ত (গুজরাট), অজয় ঘোষ (কানপুর—পরবর্তীকালে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী), জিতেন সান্যাল (এলাহাবাদ—শচীন সান্যালের ভ্রাতা), রামশরণ দাস (লাহোর), ব্রহ্ম দত্ত (কানপুর), মনোমোহন ব্যানার্জি (চাম্পারণ), ললিত মুখার্জি (এলাহাবাদ) প্রভৃতি গ্রেপ্তার হন। শিবরাম রাজগুরুকে পুনা সহরে গ্রেপ্তার করা হয় ১৯২৯ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর এবং কলকাতা থেকে যতীন দাসকেও গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয়। একরারী আসামীদের কারও কারও স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ পায় যে আগ্রা সহরে একটি বাড়ী ভাড়া করে ভগৎ সিং প্রভৃতি সেখানে বোমা প্রস্তুতের একটি গোপন কারখানা স্থাপন করেন এবং সেখানে যতীন দাস H. S. R. A

কর্মীদেরকে বোমা তৈরীর কলাকৌশল শিক্ষা দিতেন। এ ছাড়া আরও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন— কেদারমণি শুক্ল, কমলনাথ তেওয়ারী, সুরেন্দ্র পাণ্ডে, আশারাম দেশরাজ এবং বৈজনাথ সিং।

জয়গোপাল, ফণী ঘোষ ও হংসরাজ ভোরার স্বীকারোক্তির ফলেই দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা * স্থাপিত হয়। ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত, যাঁরা পূর্ব থেকেই ধৃত হয়ে কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন, তাঁদেরকেও এই মোকর্দ্দমায় আসামীশ্রেণীভুক্ত করা হয়।

চন্দ্রশেখর আজাদ কাকোরী ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় পলাতক আসামী বলে ঘোষিত হয়েছিলেন। তাঁকে লাহোর ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমাতেও আসামী-তালিকাভুক্ত করা হয়। তাঁকে ধরা যায় না। অতএব শেষোক্ত মোকদ্দমাতেও তাঁকে 'পলাতক' বলে ঘোষণা প্রচার করা হয়। সেই সাথে—ভগবতীচরণ ভোরা, কৈলাসপতি, যশপাল এবং সদ্‌গুরুদয়াল অবস্থি এই চারজনকেও পলাতক আসামী বলে ঘোষণা প্রচার করা হয়। ২৪ জন আসামী গ্রেপ্তার হন এবং পাঁচজন পলাতক বলে ঘোষিত হন।

---

* সরকারী পুঁথিতে এই মোকদ্দমাকে 'প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অবশ্য, ১৯২০ সালের পরে এটিই প্রথম 'লাহোর ষড়যন্ত্র'। কিন্তু ১৯১৫ সালে প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা হয় এবং তার দুটি supplementary মোকদ্দমা হয়। আমরা ঐ তিনটি মোকদ্দমাকে একত্রে 'প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র' বলে ধরে নিয়ে, ১৯২৯ এর মোকর্দ্দমাকে 'দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা' বলে বর্ণনা করেছি। Freedom Struggle and Anushilan Samiti পুস্তকে ১৯১৫-তে দুটি ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা ধ'রে নিয়ে ১৯২৯ এর মোকর্দ্দমাকে Third Lahore Conspiracy বলে আখ্যাত করা হয়েছে।

যতীন দাসের আত্মবিসর্জন দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার এক উজ্জ্বল অধ্যায়। যতীন দাস দক্ষিণ কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলের অধিবাসী বঙ্কিমচন্দ্র দাসের পুত্র। যৌবনের প্রারম্ভে অনুশীলন সমিতির দক্ষিণ কলিকাতা শাখার নেতৃস্থানীয় কর্মী সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ধীরেন মুখোপাধ্যায়ের মাধ্যমে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ) ও প্রতুল চন্দ্র গাঙ্গুলীর সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং তিনি অনুশীলনের সক্রিয় কর্মীর মর্য্যাদা লাভ করেন। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশন উপলক্ষে অদ্বিতীয় দেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে সামরিক কায়দায় যে বিশাল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়, যতীন দাস সেই বাহিনীতে 'মেজর' (Major) পদে অধিষ্ঠিত হয়ে দায়িত্বপূর্ণ কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। H.R.A এবং H.S.R.A র সাথে তাঁর যোগাযোগের কাহিনী পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

লাহোর জেলে ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার আসামীদের 'রাজনৈতিক বন্দী'র মর্য্যাদা প্রদান করতে অসম্মত হন। তাঁদের প্রতি অমানুষিক ব্যবহার করা হত। রাজনৈতিক বন্দীর মর্য্যাদা ও মানবোচিত ব্যবহারের দাবী করে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত ১৯২৯ এর ১৪ই জুন থেকে অনশন সুরু করেন। তাঁদের অনশনের কথা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং সমগ্র ভারতের আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ৩০ শে জুন সারা ভারতে অনশনকারীদের দাবী সমর্থন করে "ভগৎ সিং-বটুকেশ্বর দিবস" উদ্‌যাপিত হয়। দোসরা জুলাই তারিখ থেকে যতীন দাসসহ আরও দশজন বন্দী ঐ অনশনে যোগদান করেন। ইতোমধ্যে দেশব্যাপী আন্দোলনের চাপে সরকারপক্ষ এক আপোষ-প্রস্তাব উত্থাপন করে বন্দীদের জানিয়ে দেন যে তাঁরা অনশন ভঙ্গ করলে সরকার তাঁদের দাবীপূরণের ব্যবস্থা করবেন। এইরূপ সরকারী প্রতিশ্রুতির বুনিয়াদে ভগৎ সিং এবং অপরাপর অনশনকারীগণ ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে অনশন

ভঙ্গ করেন। কিন্তু যতীন দাস অনশন প্রত্যাহারে সম্মত হন না। তিনি বলেন 'সরকারী প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য নাই। ওরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে অভ্যস্ত। আগে দাবী আদায় হোক তারপর অনশন প্রত্যাহার করব"। সুতরাং যতীন দাসের অনশন চলতে থাকে। দিনে দিনে তাঁর শরীর ক্ষীণ হ'তে থাকে। সহকর্মীদের অনুরোধ, দেশের নেতৃবৃন্দের অনুরোধ, নিজের পিতা ভ্রাতা প্রভৃতির অনুরোধ কিছুতেই তাঁর বজ্রকঠোর সঙ্কল্পকে নমনীয় করতে পারলো না। বলপূর্বক খাওয়ানো ও (force feeding) সম্ভব হল না। কারণ তিনি জানিয়ে দিলেন যে জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা হলে তিনি জীবন বিপন্ন করে বাধা দেবেন। তাকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করাও সম্ভব হল না। তিনি জেলকর্তৃপক্ষকে পূর্ব থেকেই জানিয়ে দিলেন—অন্যত্র সরানোর চেষ্টা হলে তিনি স্ট্রেচার থেকে লাফিয়ে পড়ে মৃত্যু বরণ করবেন।

এই সময়ে যতীন দাসের পিতা শ্রীবঙ্কিম দাস তাঁর প্রতিবেশী এবং অনুশীলন সমিতির নেতা শ্রীধীরেন মুখার্জিকে অনুরোধ করেন—লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে গিয়ে যতীনকে অনশন পরিত্যাগে সম্মত করানোর জন্য (যতীন দাস ধীরেনবাবুর মাধ্যমেই অনুশীলন দলে এসেছিলেন)। লাহোর জেলে যতীন্দ্রের সাথে সাক্ষাৎকারের ঘটনা ধীরেনবাবু নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করেছেন—

"কারা কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে যতীনের সাক্ষাৎকারের জন্য জেলের ভিতরে প্রবেশ করতেই একজন দীর্ঘ ও বলিষ্ঠদেহ পাঞ্জাবী ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। জানতে পারলাম যে ইনি ঐ জেলের ডেপুটি সুপারিণ্টেডেণ্ট। আমি প্রাক্তন রাজবন্দী এবং যতীনের প্রতিবেশী শুনে ভদ্রলোক তাঁর দুই হাত দিয়ে আমার হাতখানা চেপে ধরে আবেগের সাথে বললেন—

'Babu myself and my family shall keep ourselves bound to you in gratefulness if you succ-

eed in your mission and induce Jatin to break fast. A great soul like his should not be allowed to perish. His life must be saved."

"আমি যতীনের cell এ গিয়ে নানা কথার পর তাকে বললাম—'আমি তোর বাবাকে কথা দিয়ে এসেছি যে আমি তোর মুখে দুধ ঢেলে দেবো'। সে বললো 'তাই নাকি? তবে দিন' —বলে হাঁ করলো। আমি বোতলে করে দুধ নিয়ে গিয়েছিলাম। ভাবলাম বুঝি আমার উদ্দেশ্য সফল হল। বোতল থেকে তার মুখে দুধ ঢেলে দিলাম। সে নির্বিবাদে দুধটুকু মুখের মধ্যে গ্রহণ করলো। কিন্তু আমি থামতেই সে কু-উ-উ করে সবটুকু দুধ মুখ থেকে বের করে ফেলে দিল। বুঝলাম যতীনের সঙ্কল্প টলানোর সাধ্য আমার নাই। যতীন বললো—'এইত হল। বাবার কাছে আপনি কথা দিয়েছিলেন, আপনার কথা রক্ষা হল। আপনার কথা আমি রেখেছি—এবার আমার কথা রাখুন। দ্বিতীয়বার অনুরোধ করবেন না'। বেদনার্ত হৃদয়ে ফিরে আসতে হল।

জেল অফিসের কাছে দেখি সেই ডেপুটি সুপার দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি হলো'। আমি বললাল 'হলো না'। ভদ্রলোক কেঁদে ফেললেন। তাঁর দুচোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়লো। রুদ্ধকণ্ঠে অস্পষ্ট উচ্চারণ নির্গত হল 'How unfortunate'!" [২০]

দেশের সর্বত্র উত্তেজনা। প্রতিদিনের সংবাদপত্রে বড় বড় হেডিং এ সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। "যতীন দাসের অনশনের...দিন। ওজন হ্রাস পেয়ে ......পাউণ্ড হয়েছে...ইত্যাদি। দেশ তপ্তকটা-হের উপরে নিক্ষিপ্ত খইয়ের ধানের মত ফুটছে। ওদিকে জেলের মধ্যে যতীন্দ্র নির্বিকার। দৈহিক যন্ত্রনার কোন বহিঃপ্রকাশ নেই। এক একদিন একটি করে অঙ্গ অবশ হয়ে যাচ্ছে। মৃত্যু এগিয়ে আসছে 'হাঁটি হাঁটি—পা পা' করে। যতীন নির্লিপ্ত। জীবন আর মৃত্যুর

মধ্যে কোন পার্থক্যই যেন সে স্বীকার করে না। যেন সত্য সত্যই মৃত্যুবরণ তার কাছে নূতন বস্ত্র পরিধানের উদ্দেশ্যে জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগের মত একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।

একটি আর্ত কণ্ঠস্বর নির্গত হয় না। মুখে এতটুকু আর্তির ছায়া পড়ে না। শুধু ধূলিমুষ্টির মত জীবনকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া নয়। তিলে তিলে আত্মদান! dying inch by inch!

৬৪ দিন অনশনের পর ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯ যতীন্দ্রের জীবনদীপ নির্বাপিত হল।

শোকের ঝড় বয়ে গেল সারা ভারতবর্ষের উপর দিয়ে। বড় সহর থেকে সুরু করে সুদূর পল্লীর সাধারণ মানুষ সভা করলো, শোকমিছিল করলো। ঘরে ঘরে জননী ভগিনীরা নীরবে অশ্রু বিসর্জন করলেন। আর কান্নায় ফেটে পড়লো লাহোর জেলে শুধু যতীন্দ্রের সহকর্মীরাই নয়—অফিসার, কেরানী, জমাদার, সিপাই, মেট এবং অগণিত সাধারণ কয়েদী চোখের জলে বক্ষ সিক্ত করল। সকলের মুখে হাহাকার, বুকে পাথরচাপা দীর্ঘশ্বাস।

ভারতবাসীর শতাব্দকালব্যাপী মুক্তিযুদ্ধে দেশমাতৃকার বীর সন্তানগণকে অমিত ত্যাগ ও দুঃখবরণের মধ্য দিয়ে যে সদীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হয়েছে, যতীন দাসের মৃত্যু সেই পথের মধ্যস্থলে দেদীপ্যমান একটি সমুজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ। ১৯৩০ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলনে ভারতীয় জনচিত্তের সে বিস্ময়কর মহাবিস্ফোরণ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, যতীন দাসের গৌরবময় আত্মবিসর্জন তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমায় আরও নূতন ইতিহাস সৃষ্টি হয়। একদিকে আদালতে বিচারের প্রহসন চলেছে, অন্যদিকে বন্দীদের সংগ্রাম চলেছে জেলের মধ্যে অমানুষিক ব্যবহারের প্রতিবাদে। সরকারপক্ষ সুপরিকল্পিতভাবে এই প্রকার একটি

পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন। কারণ এই মোকর্দ্দমায় আসামীদের গুরু দণ্ড দেওয়ার সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারে নি পুলিশ কিংবা তার গোয়েন্দা বিভাগ। তাই জেলখানার অভ্যন্তরে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যার ফলে আসামীরা আদালতে যেতে এবং বিচারকার্য্যে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তখন নূতন একটি অর্ডিন্যান্স জারী করে আসামী আদালতে উপস্থিত না হলে তার অসাক্ষাতেই বিচারকার্য্য সমাধা করবার জন্য স্পেসাল ট্রাইব্যুনালকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ট্রাইব্যুনালের তিনজন বিচারপতির মধ্যে দুইজন মিঃ কেলস্ট্রীম ও স্যর আগা হায়দার বিচারাধীন কয়েদীর প্রতি অমানুষিক ব্যবহারের প্রতিবাদ করে ট্রাইব্যুনাল থেকে পদত্যাগ করেন। তাঁদের জায়গায় স্যর আব্দুল কাদের ও অপর একজন নূতন শ্বেতাঙ্গ বিচারপতি নিয়োগ করে জেলের মধ্যে একতরফাভাবে বিচারকার্য্য সমাধা করা হয়। এ ধরনের বিচার প্রহসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আসামীরা তাঁদের ডিফেন্স প্রত্যাহার করে নেন— অর্থাৎ সাক্ষীদের জেরাও হয় না, আসামীদের পক্ষে সওয়াল জবাবও হয় না। একতরফা সাক্ষ্যমূলেই আসামীগণকে কঠোরতম দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ভগৎ সিং, শুকদেব ও শিবরাম রাজগুরুর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। কিশোরীলাল, জয়দেব, শিউ ভার্মা, গয়াপ্রসাদ, মহাবীর সিং, বিজয়কুমার সিং (কাকোরী মোকদ্দমায় দণ্ডিত রাজকুমার সিং এর ভ্রাতা) এবং কমলনাথ তেওয়ারী, এঁদের সকলেরই হয় যাবজ্জীবন দীপান্তর। তা ছাড়া কুন্দনলালের সাত বছর ও প্রেম দত্তের পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ট্রাইব্যুনালের বিচারে কেউ খালাস পায় নাই। প্রাথমিক তদন্তের পর প্রমাণাভাবে অজয় ঘোষ ও জিতেন সান্যালকে মুক্তি দেওয়া হয়। জয়গোপাল, বেতিয়ার ফণী ঘোষ, চাম্পারণ জেলার মনোমোহন ব্যানার্জি, লাহোরের হংসরাজ ভোরা ও অপর দুইজন রাজসাক্ষী হয়ে আদালতের ক্ষমা লাভ করেন। চন্দ্রশেখর

আজাদ, কৈলাসপতি, ভগবতীচরণ ভোরা, যশপাল ও সদগুরু দয়াল প্রবস্থি পলাতক থাকেন। এঁদের মধ্যে ভগবতীচরণ ভোরা মোকর্দ্দমা চলতে থাকাকালেই ১৯৩০ সালের ২৬শে মে একটি শক্তিশালী বোমা প্রস্তুতের পর রাভী নদীর তীরে সেটি পরীক্ষা করার সময়ে বোমা বিষ্ফোরণে মারা যান। শহীদ ভগবতীচরণ ও তাঁর পত্নী বিপ্লবিনী দুর্গাবতী ভোরা অত্যন্ত দক্ষ বৈপ্লবিক কর্মী ছিলেন। ভগবতীচরণ উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। চন্দ্রশেখর আজাদ ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এলাহাবাদের আলফ্রেড পার্কে পুলিশের সাথে অসম যুদ্ধে নিহত হন। ১৯৩১ সালের ২৩শে মার্চ লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে ভগৎ সিং, শুকদেব রাজ ও শিবরাম রাজগুরু ফাঁসীমঞ্চের শহীদের মৃত্যু বরণ করেন।

লাহোর মোকর্দ্দমার শহীদত্রয়ীর প্রাণসংহার সারা ভারতকে পুনরায় উত্তপ্ত করে তোলে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ইতিহাস-লেখক H. W. Hale লিখেছেন—

"Public opinion, unsettled by Civil Disobedience Movement ran wild and was further excited in favour of the revolutionaries under trial by most of the nationalist newspapers which painted the accused as oppressed martyrs placed on their trial by an Imperialistic Government for purely patriotic acts. Bhagat Sing especially became a national hero and his exploits were freely lauded in the nationalist press, so that, for a time, he bade fair to oust Mr. Gandhi as the foremost political figure of the day. His photographs were to be met in many houses, and his plaster busts found a large market" [১]

তৃতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা—১৯৩০

ভগৎ সিং প্রভৃতির গ্রেপ্তারের পরে H.S.R A র যে সকল কর্মী বাইরে থেকে গেলেন, তাঁরা পার্টি সংগঠনকে প্রয়োজনমত মেরামত করে নিয়ে তাকে পুনর্বার সক্রিয় করে তোলেন। চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগবতীচরণ ভোরা ও যশপাল—এঁদের যৌথ নেতৃত্বে পার্টি পরিচালিত হতে থাকে। অনুশীলন সমিতির চিরাচরিত ঐতিহ্য অনুসরণ করে H.R.A ও H.S.R.A তেও কখনও 'নেত' উপর থেকে 'মনোনীত' বা ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হতেন না। একজন কেউ কারারুদ্ধ হলে কিংবা অন্য কারণে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে সক্রিয় সভ্যগণের সাধারণ সম্মতির ভিত্তিতে অপর কোন যোগ্যব্যক্তি 'নেতা' রূপে স্বীকৃত হতেন। নরেন্দ্রমোহন সেন সন্ন্যাস অবলম্বন করবার পর বাংলার অনুশীলন সমিতিতেও কিছুকালের জন্য যৌথনেতৃত্ব প্রবর্তিত হয়েছিল।

চন্দ্রশেখর, ভগবতীচরণ ও যশপাল—এঁরা তিনজনেই ছিলেন দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার পলাতক আসামী।

১৯২৯ এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৩০ এর নভেম্বর—এই এক বৎসরের মধ্যে কয়েকটি ছোটখাটো হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে। ২৩শে ডিসেম্বর ১৯২৯ তারিখে দিল্লীর "পুরান কিল্লা" অঞ্চলে রেল লাইনের নীচে মাইন পেতে রাখা হয়। ভারতের বড়লাট লর্ড আরউইনকে নিয়ে একটি ট্রেন ঐ রেলপথের উপর দিয়ে যাওয়ার সময়ে ট্রেনের তলায় বিস্ফোরণ ঘটে। কেউ আহত হয় না কিন্তু খানিকটা রেল লাইন উড়ে যায় ও বোমার টুকরো একটা কামরায় ঢুকে কামরার মেঝেতে আটকে যায়। এই পরিকল্পনায় চন্দ্রশেখর আজাদ আপত্তি করলেও, যশপাল, ইন্দ্রপাল হংসরাজ বেতার (Hansraj Wireless), ভগরাম প্রভৃতি এই কাজে অংশ গ্রহণ করে। এরপরে ভগৎ সিং প্রভৃতিকে মুক্ত করে বাইরে নিয়ে যাওয়ার এক ব্যর্থ চেষ্টা হয়। তারপর রাভী নদীর তীরে বোমা

বিস্ফোরণে ভগবতীচরণ নিহত হন। পাঞ্জাবের স্থানে স্থানে কয়েকটি ছোটখাটো ডাকাতি হয় ও বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। এই সব ক্ষুদ্র ব্যাপারগুলি একত্র করে তৃতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার জাল বিস্তার করা হয়। ঘটনা যেগুলি ঘটে, সেগুলি নিতান্তই নগণ্য। কিন্তু সরকারের আসল উদ্দেশ্য বিপ্লবী দলকে নিশ্চিহ্ন করা। তাই ঐ সব ক্ষুদ্র ব্যাপারগুলিকে কেন্দ্র করে "সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার আয়োজন" বলে অভিযোগ আনা হয় ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২১ ক ধারা অনুসারে। বিচারে ইন্দ্রপাল, রূপচাঁদ, জাহাঙ্গীরলাল, কুন্দন লাল ও গুলাব সিং-এর শাস্তি হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড; নাথুরাম নামক একজন আসামীর সাজা হয় সাত বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড; এ ছাড়া তিনজনের চার বছর, একজনের তিন বছর ও পাঁচজনের দুই বৎসর করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়। মোকদ্দমায় বিচারাধীন থাকাকালে বিষণলাল নামক একজন বিপ্লবী কারাগারেই প্রাণত্যাগ করেন।

চন্দ্রশেখর ও যশপালকে এই মোকর্দ্দমাতেও পলাতক বলে ঘোষণা করা হয়। তাছাড়া শ্রীমতী দুর্গা দেবী, শ্রীমতী প্রকাশ, হংসরাজ বেতার, লেখরাম, প্রেমনাথ, শ্রীমতী সুশীলা, অধ্যাপক সম্পূরণ সিং টাণ্ডন ও চৈতবিহারী—এঁদেরকেও পলাতক বলে ঘোষণা করা হয়।

তৃতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল—বড়লাটের ট্রেন ধ্বংসের প্রচেষ্টাকে নিন্দা করে মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ এবং বিপ্লবীদের তরফ থেকে ঐ প্রবন্ধে প্রকাশিত মন্তব্যের প্রতিবাদে "The Philosophy of Bomb" শিরোনামায় মুদ্রিত বিপ্লবী ইস্তাহার ছড়ানো। এই ইস্তাহার রচনা করেছিলেন চন্দ্রশেখর আজাদ ও ভগবতীচরণ ভোরা। অতি সুন্দর ভাষায় অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে বিপ্লব-পন্থাকে সমর্থন জানানো হয় এই

দীর্ঘায়তন ইস্তাহারে। সমগ্র ইস্তাহারখানি H.W. Hale এর-"Terrorism in India 1917-1936" পুস্তকে পুর্ণমুদ্রিত করা হয়েছে। তার থেকে কিছু অংশ পাঠকগণের সমক্ষে তুলে ধরছি।

দেশের স্বাধীনতার জন্য হিংসা ও অহিংসার পথ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইস্তাহারের রচয়িতাগণ বলেছেন—

"Violence in physical force applied for committing injustice, and, that is certainly not what the revolutionaries stand for. On the other hand, what generally goes by name of nonviolence, is in reality, the theory of soulforce as applied to the attainment of personal and national rights, through courting suffering, and hoping, thus finally, to convert your opponent to your point of view. When a revolutionary believes certain things to be his right, he asks for them, pleads for them, argues for them, wills to attain them with all the soulforce at his command, stands the greatest amount of sufferings for them, is always prepared to make the highest sacrifice for their attainment and also backs with all the physical force he is capable of. You may coin what other word you like to describe his methods, but you can not call it violence because that would constitute an outrage on the dictionary meaning of the word. * * * While the revolutionaries stand for winning independence by all the forces, physical as well as moral, at their command, the advocates of soul force would like to ban the

use of physical force. The question therefore, is not whether you will have violence or nonviolence, but whether you will have soulforce plus physical force or soulforce alone". [৫২]

দ্বিতীয় দিল্লী ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা—১৯৩১

ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা হিসাবে এই মোকর্দ্দমাটির বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা যখন বিচারাধীন তখন H.S.R A ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত প্রভৃতিকে কারাগার থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে বলপূবক ছিনিয়ে নেওয়ার এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এই কায্য সমাধার জন্য প্রচুর অথের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় ডাকাতির দ্বারা অর্থ সংগ্রহের কমসূচী গ্রহণ করা হয়। প্রথমে স্থির হয় রেলওয়ে কর্মচারীদের বেতন প্রদানের জন্য দিল্লী রেলওয়ে ক্লিয়ারিং অ্যাকাউণ্টস্ অফিস থেকে মোটর লরী করে প্রতিমাসের পহেলা তারিখে যে টাকা নিয়ে যায় সেই টাকা লুঠ করা হবে। তারিখ স্থির হল ১লা জুলাই ১৯৩০। কিন্তু ঐ তারিখে সহরে কোন রাজনৈতিক কারণে হরতাল হয় এবং রাস্তায় পুলিশের টহলের পরিমাণ খুব বেড়ে যায়। সুতরাং এ পরিকল্পনা কার্য্যকর হয় না। এর পাঁচদিন পরে মোটর ডাকাতি হয় দিল্লীর 'গাড়োড়িয়া স্টোর্স' নামক একটি বড় দোকানে। ১৪০০০ টাকা সেখান থেকে লুণ্ঠিত হয়। এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন—চন্দ্রশেখর আজাদ, ধন্বন্তরী কৈলাসপতি, লেখরাম এবং কাশীরাম। এদিকে লাহোর বন্দীরা আদালতে আসতে অস্বীকার করায় জেলের মধ্যে তাঁদের বিচারের ব্যবস্থা হয়। অতএব আদালতে যাতায়াতের সময়ে পথের মধ্যে ভগৎ সিং প্রভৃতিকে বলপূর্বক ছিনিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়।

তখন স্থির হয় গাড়োড়িয়া ডাকাতির টাকা দিয়ে একটা বৃহৎ বোমার কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা। পুলিশ কিছুকাল পরে ১৯৩০ এর নভেম্বর মাসে কারখানার সন্ধান পায় ও তল্লাসী করে ৬০০০ (ছয় হাজার) বোমা তৈয়ারীর উপযুক্ত মাল মসলা উদ্ধার করে। এর পূর্বেই কৈলাসপতি (লাহোর ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার পলাতক আসামী) ধরা পড়ে।

পূর্বোক্ত ঘটনার সাথে আরও দুই একটি ছোটখাটো ঘটনা জুড়ে দিয়ে দ্বিতীয় দিল্লী ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা স্থাপন করা হয় ও ঐ মোকদ্দমার বিচারের জন্য সোসাল ট্রাইব্যুনাল নিযুক্ত হয়। বিচারার্থে যাঁদের চালান দেওয়া হয় তাঁদের নাম—বিধুভূষণ (চাপড়া, বিহার), খেয়ালরাম (আগ্রা), ধন্বন্তরী (গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব), এন্. কে. নিগম (দিল্লী), বিশ্বনাথ রাও বৈশম্পায়ন (ঝাঁসী), সচ্চিদানন্দ বাৎস্যায়ন (জলন্দর), বি. পি. জৈন (মীরাট), বাবুরাম গুপ্ত (এটাহ), কাপুরচাঁদ (দিল্লী) এবং জনৈক 'পোদ্দার' (ঝাঁসী)। কৈলাসপতি রাজসাক্ষী হয়ে এক দীর্ঘ স্বীকারোক্তি প্রদান করে।

কিন্তু ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রমাণের উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণাদি যোগাড় করতে অসমর্থ হয়ে সরকারপক্ষ মোকদ্দমা প্রত্যাহার করেন। সঙ্গে সঙ্গে বিধুভূষণ ও খেয়ালরামকে ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন অনুসারে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে আটক করা হয়। পরে সাধারণ আদালতে অস্ত্র আইনের বিধিভঙ্গের অভিযোগে ধন্বন্তরী সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে ও এন্. কে. নিগম দুই বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। বিস্ফোরক পদার্থ আইন (Explosive Substances Act) অনুসারে অন্যান্য আসামীদের অল্পমেয়াদী সাজা হয়।

দিল্লী ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমায় সরকারপক্ষের সাফল্য কৈলাসপতির স্বীকারোক্তি। এই স্বীকারোক্তিতে অনুশীলন সমিতি, H.R.A

ও H.S.R.A সম্পর্কে প্রচুর তথ্য সরকারপক্ষের হাতে আসে। দীর্ঘ স্বীকারোক্তিটি "Confession of Kailashpati" নাম দিয়ে পুস্তকাকারে মুদ্রিত করে বিভিন্ন রাজ্যের গোয়েন্দা কর্মচারীদের মধ্যে প্রচার করা হয়। কৈলাসপতি বলে যে এলাহাবাদের ডাঃ শৈলেন চক্রবর্তীর মাধ্যমে সে অনুশীলন তথা H.R A তে ভর্তি হয়। পূর্বোক্ত মুদ্রিত পুস্তকের একটি কপি দিল্লীতে জাতীয় মহাফেজখানায় অদ্যাবধি রক্ষিত আছে। (File No—Home : Pol. 11/15/31)

গভর্ণর হত্যার ষড়যন্ত্র, লাহোর—১৯৩১

১৯৩০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর লাহোরে—পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও পাঞ্জাবের গভর্ণরকে হত্যার উদ্দেশ্যে H. S. R. A কর্মী হরিকিষণ Convocation Hall এর মধ্যে তাঁকে গুলী করে। গভর্ণর সাহেবের হাতে গুলী লাগে। হরিকিষণের কোন এক সঙ্গীর গুলীতে গভর্ণরের দেহরক্ষীরূপে কার্য্যরত পুলিশ কর্মচারী চন্দন সিং নিহত হয়। ঘটনাস্থলেই হরিকিষণ গ্রেপ্তার হয়। ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা খাড়া করা হয়। হরিকিষণের প্রাণদণ্ড হয়। তার সঙ্গীরা প্রথমে ধরা পড়ে নাই। পরে তারা ধরা পড়লে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে H. S. R. A কর্মী ধণবীর সিং, দুর্গাদাস ও বমনলাল—এই তিনজন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। ১৯৩১ এর ৯ই জুন পাঞ্জাবের মিনওয়ালী জেলে হরিকিষণের ফাঁসী হয়।

ডালহৌসী স্কোয়ার ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা—১৯৩০

এই ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমাটি যুগান্তরদলের কার্য্যক্রমের সাথে সংযুক্ত। এই মোকর্দ্দমার পটভূমি সম্পর্কে যুগান্তরদলের অন্যতম

নেতা মনোরঞ্জন গুপ্ত লিখেছেন যে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র কলি-কাতার নারায়ণ রায়কে দিয়ে বোমা প্রস্তুতের চেষ্টা করছিলেন যুগান্তর দলেরই আর একজন নেতা—ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত। (বিপ্লবী মহলে ইনি ছোট ভূপেন দত্ত নামে পরিচিত—বাড়ী যশোহর জেলায়)। উত্তরবঙ্গের শ্রদ্ধেয় নেতা যতীন রায়ের গোষ্ঠীভুক্ত যোগেন সরকার বোমা প্রস্তুতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁর কাছে নারায়ণ রায় বোমা তৈরীর কাজ শেখেন। মনোরঞ্জনবাবু লিখেছেন—

"আমি একদিন যুগান্তর দলের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে যারা তখনও জেলের বাইরে আছে তাদের সকলকে ডেকে আমাদের করণীয় কর্মসূচী সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলাম * * * এই সভায় যারা এসেছিল তাদের মধ্যে সাতকড়ি ব্যানার্জি, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় ও রসিকচন্দ্র দাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য" ৫২

মনোরঞ্জনবাবু লিখেছেন ঐ সভায় তাঁরা একটি কর্মসূচী প্রস্তুত করেন যার প্রথম অংশ হবে—বোমা প্রস্তুত ও বোমার ব্যবহার। "প্রত্যেক জেলার ইউরোপীয়ান ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ী অথবা সেখান-কার ইউরোপীয়ান ক্লাবে কয়েকটা করে বোমা ফেলতে হবে। তার পূর্বেই কলকাতায় টেগার্ট সাহেবের উপর বোমা নিক্ষেপের চেষ্টা করতে হবে। * * * জেলার কর্মীদের কাছে কলকাতার বোমা বিস্ফোরণটাই হবে সিগন্যাল। সঙ্গে সঙ্গে জেলায় তাদেব করণীয় কাজটা করে ফেলবে" * * আমাদের যুগান্তর দলের যে বিভিন্ন গ্রুপ আছে, তাদের মধ্যে যে গ্রুপের হাতে যে অস্ত্র ও অর্থ আছে কিংবা নিজেরা যা যোগাড় করতে পারবে তা দিয়েই প্রত্যেক গ্রুপ প্রকল্পিত কর্মসূচী অনুসারে তাদের পক্ষে যেখানে যেখানে সম্ভব, ইউরোপীয়ানদের উপর হামলা চালিয়ে যাবে" ৫৩

H. W. Hale মনোরঞ্জনবাবুর নাম উল্লেখ করেই নিম্ন-লিখিত কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন—

1. "To attempt the lives of Europeans" in hotels, clubs and cinemas simultaneously in Calcutta and the Mufussil by throwing bombs.
2. To burn the aerodrome at Damdum with petrol.
3. To attack and destrov the Orienlal Gas Works by using bombs and dynamite.
4. To disable the Electric Supply Corporation by destroying two main Stations in Calcutta.
5. To burn the petrol depot of the Burma Oil Company at Budgebudge.
6. To disorganise the tramway service in Calcutta by cutting wires.
7. To cut the telegraph lines in the mufussil.
8. To blow up bridges and railway lines by using dynamite and hand grenades"[৫৪]

মনোরঞ্জনবাবু যে বিবরণ দিয়েছেন—সেটা ১৯৭৬ সালে তার বিপ্লবী জীবনের স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে প্রদত্ত। Hale সাহেবের পুস্তক গোয়েন্দারিপোর্টের ভিত্তিতে রচিত এবং সে পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৭ সালে। সুতরাং Hale সাহেব কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণই অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়।

মনোরঞ্জনবাবু আরও লিখেছেন যে উক্তরূপ কর্মসূচী গৃহীত হওয়ার কয়েকদিন পরে ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায় এসে জানিয়ে যান যে তাঁরা (অর্থাৎ তাঁদের গ্রুপ) বোমা নিয়ে করবার কর্মসূচী অনুমোদন করেন না। তাঁরা যা কিছু করবেন তা রিভলভার নিয়েই করবেন। পূর্বোক্ত কর্মসূচী অনুসরণ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

পূর্বোক্ত কর্মসূচীর প্রথম কাজ ছিল টেগার্ট সাহেবের উপরে বোমা নিক্ষেপ। ১৯৩০ সালের ২৫শে আগষ্ট অনুজা সেনগুপ্ত ও দীনেশ মজুমদার প্রত্যেকে একটি করে বোমা ও একটি করে রিভলভার নিয়ে ডালহৌসি স্কোয়ারে স্যার চার্লস টেগার্টের মোটরগাড়ীতে বোমা ফেলেন। শুধু দীনেশ মজুমদারই বোমা ছুঁড়তে পেরেছিলেন। কিন্তু বোমাটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। টেগার্ট অক্ষত থেকে যান। গাড়ীর মধ্যে আর চারজন আরোহী ছিলেন। বোমার টুকরো লেগে সেই চারজন আরোহী আহত হন। গাড়ীর চালকও আহত হয়। অনুজা সেনের হাতে যে বোমা ছিল সেটা ছুঁড়বার পূবেই অনুজার হাতের মধ্যে ফেটে যায়। তার ফলে ঘটনাস্থলেই অনুজা নিহত হন। দীনেশের পলায়নের চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং ঘটনাস্থলেই একটি রিভলভারসহ তিনি ধরা পড়েন। সেইদিনই পুলিশ ঐ ঘটনার সূত্র অনুসরণ করে নারায়ণ রায়কে গ্রেপ্তার করে। ততদিন নারায়ণ রায় এম্. বি. পাশ করে ডাঃ নারায়ণ রায় হয়েছেন। Hale সাহেব লিখেছেন—

"He (Dr. Narayan Roy) later confessed that he had made bombs for the party, and produced from his house materials for making bombs. Still later, acting on the Doctor s Confession the police searched a house in Lalmadhab Mukherjee Lane which yielded two bombshells and other materials" ⁶⁶

লালমাধব মুখার্জি লেনে খানা তল্লাসীর সূত্রে কয়েকজন গ্রেপ্তার হন ২৬শে আগষ্ট (পূর্বোক্ত ঘটনার পরদিন)। জোড়াবাগান থানায় একটা বোমা পড়ে। কোন পুলিশ আহত হয় না। তিনজন সাধারণ নাগরিক আহত হয়। তারপর দিন (২৭ আগষ্ট) ইডেন গার্ডেন থানায় বোমা পড়ে এবং একজন চাপরাশী নিহত হয়। এই সকল ঘটনাকে একত্রিত করে একটি ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা খাড়া করা হয়। আসামীদের মধ্যে দুইজন রাজ-সাক্ষী হয়। এই মোকর্দ্দমায় ডাঃ নারায়ণ রায় ও ডাঃ ভুপাল বসু উভয়েই ২০ বছরের দীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। এছাড়া রসিক-লাল দাস (খুলনা) ও সুরেন্দ্রনাথ দত্ত (বরিশাল) এঁদের প্রত্যেকের হয় ১৫ বছেরর দ্বীপান্তর দণ্ড। রোহিনী অধিকারী (ফরিদপর) ১০ বছর দীপান্তর দণ্ডে এবং অম্বিকাচরণ রায় (২৪ পরগণা), অদ্বৈত দত্ত (কলিকাতা) ও যতীশ ভৌমিক (নোয়াখালী) এঁরা প্রত্যেকে ৮ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। হাইকোর্টের আপীলে ডাঃ নারায়ণ রায়ের দণ্ডকাল হ্রাস হয়ে তাঁর ১৫ বছরের দীপান্তর দণ্ড হয়। সেই প্রকার সুরেন দত্ত, রোহিনী অধিকারী ও যতীশ ভৌমিক এঁদের দণ্ডকাল হ্রাস হয়ে যথাক্রমে ১২ বছর, ৫ বছর ও দুই বছরের কারাদণ্ড হয়। দীনেশ মজুমদার (যিনি ২৫শে আগষ্ট ঘটনাস্থলেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন) ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩২ মেদিনী-পুর জেল থেকে পলায়ন করেন। দীর্ঘকাল পলাতক থাকবার পর ১৯৩৩ সালের ২২শে মে পুলিশ তাঁকে ১৩৬/৩বি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট থেকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়। এক পৃথক মোকর্দ্দমায় স্পেসাল ট্রাইব্যুনালের সমক্ষে তাঁকে বিচারার্থ উপস্থিত করা হয় এবং বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়।

আলিপুর জেলে দীনেশ মজুমদার নির্ভীক ও নির্বিকার চিত্তে ফাঁসীর মঞ্চে আত্মদান করে বীরত্বের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন।

ডাঃ নারায়ণ রায় আন্দামানে দণ্ডভোগকালে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হয়েছিলেন এবং জনদরদী সুচিকিৎসক বলে খ্যাতি অর্জন ক'রেছিলেন।

মনোরঞ্জনবাবু ও তাঁর সহকর্মীগণ ঠিক কোন্ সময়ে পূর্বোক্ত-রূপ কর্মসূচীর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, তা উল্লেখ করেন নি। তবে তিনি লিখেছেন যে ভুপেন্দ্রকুমার দত্ত গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ার পরে তিনি পূর্বোক্তরূপ পরামর্শ বৈঠকের আয়োজন করেন। ভুপেনবাবু ধৃত হন ১৯৩০ এর জুন মাসে। বৈঠকটা তা হ'লে জুন থেকে আগস্ট (১৯৩০) এরই মধ্যে কোন সময়ে হয়েছিল। বোঝা যাচ্ছে যে ঐরূপ দুঃসাহসিক কর্মসূচীর রূপায়ণের প্রস্তুতি গড়ে তুলতে যে সময় লাগে, দলের কর্মীরা সেই সময়টুকু অপেক্ষা করতে পারেন নাই। তার ফলে প্রথম "অ্যাক্সনের" পরে আর ঐ কর্মসূচী অনুসারে উল্লেখযোগ্য কোন কাজ হয় নাই। ঐ সময়ে অধিকাংশ বিপ্লবী ছিলেন কারারুদ্ধ। সুতরাং ঐ প্রকার দুঃসাহসিক কর্মসূচী রূপায়ণের উপযুক্ত লোকবল মনোরঞ্জনবাবুদের থাকবার কথা নয়। উপযুক্ত লোকবল যে ছিল না সেকথা মনোরঞ্জনবাবু নিজেই পরোক্ষে স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন :—

"যদিও টাকা ও বোমা বিলির কাজ পুরোপুরিই সম্পন্ন হয়েছিল কিন্তু যারা করবে ব'লে ভার নিয়েছিল তারা সময়মত কাজটা করে উঠতে পারে নি। টেগার্টের উপরে বোমা পড়ার পরদিন থেকেই টেগার্ট একদিক থেকে ছেঁকে সব বিপ্লবী কর্মীকেই গ্রেপ্তার করতে লাগলো। তার ফলে যাদের কাছে বোমা ছিল তারা কেউই করণীয় কাজটা করতে পারলো না।" ৬

কর্মসূচী প্রস্তুতের পরে অত তাড়াতাড়ি আঘাত হানার ব্যাপারে মনোরঞ্জনবাবুর অনুমোদন ছিল বলে আমার মনে হয় না।

অসহিষ্ণুতাবশতঃই প্রথম "অ্যাক্সনের" সাথে সাথে কর্মসূচী কবরে সমাধি লাভ করলো।

আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা—১৯৩২-৩৩

ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমাটি নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ অপরাপর যে সকল ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার বিবরণ এযাবৎ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, সেগুলির কাঠামো সাধারণতঃ কোন গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক হত্যাকাণ্ড বা হত্যার চেষ্টা অথবা একটি বা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক ডাকাতিকে ঘিরে রচনা করা হয়েছে। ১৯১৫ সালের প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা ও তার আনুসঙ্গিক মোকর্দ্দমাগুলির বিষয়বস্তু ছিল রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন, যে আয়োজনকে ইংরেজ শাসকশক্তি চরম মুহূর্তে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়। প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র ও তার সাথে সম্পর্কযুক্ত মোকর্দ্দমাগুলি ছাড়া ইতঃপূর্বে বর্ণিত অন্য সকল ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমাতেই কেন্দ্রীয় ঘটনা কোন বিশেষ রাজনৈতিক হত্যা বা হত্যার প্রয়াস অথবা এক বা একাধিক ডাকাতি। আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় ঐরূপ কোন বিশেষ ঘটনার প্রাধান্য ছিল না। অনুশীলন সমিতি নামক সর্বভারতীয় একটি বিপ্লবীদলের প্রসার ঘটানো যার উদ্দেশ্য ছিল কোন অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎকালে ভারতব্যাপী সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সরকারের উচ্ছেদ ও ভারতের শাসনাধিকার থেকে ভারতসম্রাটকে অর্থাৎ ইংলণ্ডের রাজাকে বঞ্চিত করা—এরই বনিয়াদে এই ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা স্থাপিত হয়।

এই মোকর্দ্দমার অপর উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব হল সারা ভারতবর্ষ থেকে এই মোকর্দ্দমায় আসামী ধৃত করা হয়। ষড়যন্ত্রের অভিযোগে

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কিঞ্চিদধিক ৫০০ বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হয়। শেষ পর্য্যন্ত ৬৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। অবশিষ্টদেরকে কিছুকাল হাজতবাস করিয়ে ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা থেকে ছেড়ে দিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনে (B.C.L.A তে) গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়।

মোকর্দ্দমার রায়দানকালে ট্রাইব্যুনালের বিচারপতিগণ মন্তব্য করেন—"the main object of the conspiracy was the building up of an organisation in preparation of a general armed rising throughout the country at such future time as might find the organisation completed".

উদ্দিষ্ট সশস্ত্র অভ্যুত্থান কোন্ কালে হবে তা যদিও অনিশ্চিত তবু অজানা ভবিষ্যতে ভারতব্যাপী সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটানোর মতলব নিয়ে আসামীরা একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পরস্পরের সহযোগিতায় একত্র কাজ করেছে, এটাই প্রধান অভিযোগ।

এই ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার পশ্চাৎপট সম্পর্কে আগে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

অনুশীলন সমিতি ১৯২২/২৩ সাল থেকেই spectacular sporadic violence বা "চমকপ্রদ ও বিচ্ছিন্ন বলপ্রয়োগের" পথ পরিহার করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁদের মতে বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রাথমিক স্তরে দেশের মানুষকে বিপ্লব-সচেতন করবার জন্য ও ভয়ভাঙ্গার কর্মসূচী হিসাবে sporadic violence বা বিচ্ছিন্নবল প্রয়োগের সার্থকতা ছিল। কিন্তু ১৯১৫।১৬ সালের পরে আন্দোলন সেই প্রাথমিক স্তর পার হয়ে নূতনতর স্তরে উন্নীত হয়েছে। খুব চমকপ্রদ ও দুঃসাহসিক sporadic violence দেশের লোকের মনে হয়ত একটা রোমাঞ্চক উন্মাদনা জাগাতে

পারে। কিন্তু শুধু সেই রোমাঞ্চক উন্মাদনাকে সম্বল; করে এত বড় দেশে সাম্রাজ্যবাদী দখলদারীর উচ্ছেদসাধন সম্ভব নয়। কেবলমাত্র ব্যাপক সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমেই ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী দখলদারীর উচ্ছেদ ও ভারতবাসীদের দ্বারা ক্ষমতদখল সম্ভবপর হতে পারে। এইরূপ বিদ্রোহ সংগঠিত করতে হলে তার কর্ণধার স্বরূপে ব্যাপক ও শক্তিশালী পার্টি সংগঠন গড়ে তোলা, ব্যাপক প্রস্তুতি ও প্রয়োজনানুরূপ অস্ত্র সম্ভার সংগ্রহ অত্যাবশ্যক। রোম্যাণ্টিক দুঃসাহস-প্রবণতা ব্যাপক বিদ্রোহের যথাযোগ্য প্রস্তুতি গড়ে তোলার কাজে সহায়ক হয় না—বিঘ্ন ঘটায়। এই মনোভাব থেকেই অনুশীলন নেতৃবৃন্দ ১৯২৩ সালে যোগেশ চ্যাটার্জীকে সমিতির উত্তর-ভারতীয় সংগঠনের পুনরুজ্জীবনের কাজে নিযুক্ত করেন। পরবর্তীকালে ব্রহ্মদেশে এবং দক্ষিণ ভারতেও অনুশীলন সংগঠনের বিস্তার ঘটে। আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা যখন স্থাপিত হয়, তার পূর্বেই ব্রহ্মদেশে ও মাদ্রাজ প্রদেশে সমিতির শক্তিশালী সংগঠন গড়ে উঠেছে। (ব্রহ্মদেশ তখন ভারতের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রদেশ ছিল)।

বঙ্গদেশে বিপ্লবী নেতৃবৃন্দকে সরকার বেশীদিন কারাগারের বাইরে থাকতে দেন নি। ১৯০৮ থেকে ১৯২৬ পর্য্যন্ত নানা বৈপ্লবিক মোকর্দ্দমায় যাঁরা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং ১৯১৫ সালের ভারত শাসন আইন ও ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন অনুসারে যে বিপুল সংখ্যক বিপ্লবীকে বিনা বিচারে আটক রাখা হয় তাঁরা প্রায়শ বাইরে আসেন ১৯২০ সালে—প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ঘোষিত "সার্বিক বন্দীমুক্তির" (General Amnesty র) সুযোগে। এক বছরের মধ্যেই ১৯২১ এর শেষভাগে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের শরিক হয়ে এঁদের অনেকেই পুনরায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। ১৯২২ এ অসহযোগ বন্দীরা বহুলাংশে মুক্তি লাভ করেন।

শীর্ষস্থানীয় বিপ্লবী নেতৃবৃন্দকে পুনরায় ধৃত করা হয় ১৯২৩ এর সেপ্টেম্বর ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশণ অনুসারে এবং তার-পর ১৯২৪ এর অক্টোবরে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী অডিন্যান্স (B.C.L.O) জারী করে বিপ্লবীদের ব্যাপক গ্রেপ্তার সুরু হয়ে যায়। তখনকার সংবিধান অনুসারে "অডিন্যান্সের" মেয়াদ থাকতো মাত্র ছয় মাস—অর্থাৎ ৬ মাস অতীতে হওয়ার পূর্বেই লাটসাহেবের ঘোষণার দ্বারা বিধিবদ্ধ অডিন্যান্সকে বিধান সভার মাধ্যমে 'পাশ' করিয়ে "আইন" বা Act এ পরিণত করে নিতে হত। ১৯২৫ এর মার্চ মাসে অডিন্যান্সের অনুচ্ছেদগুলিকে একটি Bill আকারে তৎকালীন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হয়। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে স্বরাজ্যদলের প্রবল বিরোধিতার ফলে ব্যবস্থাপক সভা Bill টি অগ্রাহ্য করেন—অর্থাৎ সরকার পক্ষ Bill টি পাশ করিয়ে নিতে অসমর্থ হন। ১৯১৯ এর ভারতশাসন আইনে প্রাদেশিক গভর্ণরের এই ক্ষমতা ছিল যে ব্যবস্থাপক সভায় কোন সরকারী Bill নামঞ্জুর হলে গভর্ণর সার্টিফিকেট দিয়ে নামঞ্জুর Billটিকেই (Act এ) পরিণত করতে পারতেন। এ ক্ষেত্রেও গভণর তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক নামঞ্জুর-হওয়া Bill টিকে "মঞ্জুর" বলে সার্টিফিকেট দিয়ে তাকে আইনে পরিণত করলেন। ফলে ১৯২৪ এর B.C.L.O ১৯২৫ এর B.C.L.A তে পরিণত হল। এই আইনে বাংলার বিপ্লবীদেরকে ঝাড়ে বংশে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে আটক করা হল। এঁরা সকলে মুক্তি পেলেন ১৯২৮ সালে। দু বছর পুর্ণ হওয়ার আগেই ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবীগণের দ্বারা অবিস্মরণীয় দেশ-প্রেমিক সূর্য্য সেনের নেতৃত্বে ইতিহাস-বিখ্যাত অভ্যুত্থান (uprising) সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে সরকার পুনরায় ১৯৩০ এর B.C.L.O জারী করেন—(পরে এটি যথারীতি ১৯৩০ এর B.C.L.A তে পরিণত হয়)। ছোট বড় সকল শ্রেণীর বিপ্লবীকে এই আইনের

বেড়াজালে ধৃত করে বিনা বিচারে আটক করা হয়। যাঁরা ঐ বেড়াজাল এড়াতে পেরেছিলেন তাঁরাও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন ১৯৩০ এর ভারতব্যাপী গণ-অভ্যুত্থান অর্থাৎ "আইন অমান্য আন্দোলনের" সম্পর্কে ধৃত হ'য়ে। এই বেড়াজালের বাইরে থাকতে পেরেছিলেন মাত্র কতিপয় নিষ্ঠাবান আত্মগোপনকারী বিপ্লবী। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩০ সাল থেকে দলীয় সংগঠনের পরিচালনা ও তার নানা কর্মকাণ্ডে আত্মগোপনকারী (underground) বিপ্লবীদের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। এঁরা অনেকেই সে সময়ে ছিলেন বয়সে তরুণ। কিন্তু এঁরা নিজ নিজ ভূমিকা প্রশংসনীয়ভাবে এবং যথোচিত কর্মদক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে পালন করেছিলেন।

যে ৪/৫ হাজার বিপ্লবীকে বিনাবিচারে আটক করা হয়েছিল তাঁদের অনেককেই আটক রাখা হয়েছিল তিনটি বিশেষ বন্দীনিবাস বা ডিটেনসন ক্যাম্পে এবং কতক আটক বন্দী ছিলেন বিভিন্ন জেলে এবং আরও অনেককে রাখা হয়েছিল বিভিন্ন থানার পাশে অস্থায়ী ঘর তুলে দিয়ে village internment বা অন্তরীনাবদ্ধ অবস্থায়। অপরিচিত ও অস্বাস্থ্যকর গ্রামে প্রায় নিঃসঙ্গ অন্তরীনাবদ্ধ অবস্থায় সামান্য জীবিকা-ভাতা বা subsistence allowance এর উপরে নির্ভর করে নির্বাসন ভোগ করতে করতে এঁদের অনেকেরই স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, অনেকে দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে অথবা সর্পাঘাত প্রভৃতির ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনটি বন্দী নিবাসের একটি ছিল খড়গপুর স্টেশন থেকে দেড় মাইল দূরবর্তী হিজলী নামক এক গ্রামে—লোকালয় শূণ্য এক বিশাল প্রান্তরের মাঝখানে। একটি জলপাইগুড়ি জেলার অরণ্যসঙ্কুল এলাকায় 'বক্সাদুর্গ' নামে একটি বহুকাল পরিত্যক্ত প্রাচীন দুর্গে এবং তৃতীয়টি স্থাপিত হয়েছিল রাজস্থানের আজমীর জেলার মরু অঞ্চলে 'দেউলি' নামক জনশূণ্য এলাকায়। নেতাদের মধ্যে অনেককে আটক রাখা হয়েছিল ব্রহ্মদেশে অথবা দক্ষিণ ভারতের কারাগারে।

সরকারপক্ষের অভিযোগ পত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল যে "ভারত সম্রাটকে সাম্রাজ্যচ্যুত করবার উদ্দেশ্যে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্রের সূচনা হয়েছিল বক্সাদুর্গ বন্দীনিবাসে, তবে ঠিক কোন্ সময় থেকে ষড়যন্ত্র সুরু হয় তা নির্ণয় করা যায় না। কারণ আসামীগণ পূর্ব থেকেই অনুশীলন সমিতির সভ্য হিসাবে সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক কার্য্যে লিপ্ত ছিল"।

সরকারপক্ষ থেকে যাঁকে ষড়যন্ত্রের নেতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে সেই প্রভাত চক্রবর্তী (দলীয় নাম মাস্টার মহাশয় |) ১৯৩০ এর ২২শে নভেম্বর থেকে ১৯৩১ এর ২৮শে জুলাই পর্য্যন্ত বক্সা বন্দীনিবাসে আটক ছিলেন। ঐ সময়ে ঐ বন্দীনিবাসে পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, জিতেন গুপ্ত, প্রতাপ রক্ষিত প্রভৃতিও আটক ছিলেন। প্রভাতবাবুকে ২৮শে জুলাই ১৯৩১ বর্দ্ধমান জেলার অন্তগত ফরিদপুর নামক গ্রামে ভিলেজ ইণ্টার্ণমেণ্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বড়লাট উইলিংডন ও বঙ্গদেশের তাৎকালিক গভর্নর কুখ্যাত স্যর এণ্ডারসনের পরিচালনায় বঙ্গদেশের সরকারী প্রশাসনযন্ত্র তখন পুরোপুরি হিংস্রতম 'দলনযন্ত্রে' (torture apperatus এ) পরিণত হয়েছিল এবং বঙ্গবাসী নারী ও পুরুষের দেহ, মন, সম্মান, মর্য্যাদা ও সর্বপ্রকার মানবিক অধিকার ঐ নিমম দলনযন্ত্রের চাকার তলায় দলিত-পিস্ট-মথিত-চুর্নিত হচ্ছিল। অসহায় মানুষের অপ্রকাশ্য অশ্রংধারায় সিক্ত হচ্ছিল প্রতিদিন শত শত নিরপরাধের গৃহাঙ্গন।

এই পরিস্থিতিতে বক্সা বন্দীনিবাসে আবদ্ধ কয়েকজন দায়িত্বশীল বিপ্লবী পরস্পর পরামর্শক্রমে এইরূপ একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন যে তৎকালীন পরিস্থিতিতে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে অনুশীলনের সংগঠনকে বলীয়ান করে তুলে, তার মাধ্যমে আসন্ন ভবিষ্যতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সশস্ত্র ও ব্যাপক অভ্যুত্থানের প্রস্তুতিকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বন্দীনিবাস,

কারাগার ও ভিলেজ ইণ্টার্ণমেণ্ট থেকে কয়েকজন দায়িত্বশীল ও দক্ষ সংগঠক পলায়ন করবেন। এঁরা বাইরে গিয়ে আত্মগোপন করে প্রথমতঃ সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন দলীয় সম্পর্কের সূত্রগুলির পুনরুদ্ধার করবেন সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এবং আসন্ন ভবিষ্যতে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিকে দৃষ্টি রেখে তার প্রস্তুতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। উপযুক্ত সময়ে বিভিন্ন কারাগার থেকে দণ্ডিত ও বিনাবিচারে আটক বিপ্লবী বন্দীগণকে বলপ্রয়োগের দ্বারা মুক্ত করে নিয়ে আসা হবে। বক্সা বন্দীনিবাসে তৎকালে অনুশীলনের যে সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আবদ্ধ ছিলেন, তাঁরা এই পরিকল্পনা অনুমোদন করেন।

এই পরিকল্পনার প্রাথমিক কার্য্য হিসাবে স্থির হয় বক্সা বন্দী নিবাস থেকে জিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও কৃষ্ণপদ চক্রবর্তীর পলায়নের ব্যবস্থা করা হবে। প্রভাত চক্রবর্তী, পরেশ গুহ এবং আরও কোন কোন দক্ষ সংগঠক ভিলেজ ইণ্টার্ণমেণ্ট গা ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে এসে এঁদের সাথে মিলিত হবেন।

বক্সা বন্দীনিবাস থেকে পলায়ন করা খুবই দুরূহ ব্যাপার ছিল। প্রাচীন দুর্গের চারপাশ ঘিরে শক্ত কাঁটাতারের ডবল-বেড়া দিয়ে দুর্গটিকে সুরক্ষিত করা হয়েছে। 'ডবল বেড়া' অর্থে ভিতরের দিক থেকে প্রথম বেড়াটি উচ্চতায় ছোট। তার পর ৫/৬ হাত দূর দিয়ে বাইরের দিকে আর একটি কাঁটাতারের বেড়া সেটা বেশ উঁচু। দুই বেড়ার মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায় প্রাচীর-প্রহরী সঙ্গীন-চড়ানো বন্দুক কাঁধে নিয়ে টহল দিচ্ছে। পালাতে হলে দুটি বেড়াই টপকাতে হবে। তারপর নিকটতম রেল ষ্টেশন সাত মাইল দূরে, এই সাত মাইল পথ অতিক্রম করতে হবে গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। দূরে দূরে পাহাড়িয়াদের ২/১ টি ঝুপড়ী ঘর ছাড়া জঙ্গলে আর কোন লোকালয় নাই। সর্প প্রভৃতি সরীসৃপ ও বন্য জন্তুর ভয় আছে। স্থির হল যে পালানো হবে রাত্রিতে।

সুতরাং এই পলায়নপর্ব এক প্রকার অসাধ্য সাধন।

বিপ্লবীদের সাহস ও বিচক্ষণতা সেই অসাধ্য সাধনকেই সম্ভব করে তুললো। স্থির হলো—১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩২ জিতেন গুপ্ত ও কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী বক্সা বন্দীনিবাস থেকে পলায়ন করবেন। কিছুদিন ধরে বন্দীনিবাসের অফিসার ও সিপাহীদের সাথে হৃদ্যতা-পূর্ণ ব্যবহার করা হতে লাগলো তাঁদের সতর্কতায় শিথিলতা আনবার উদ্দেশ্যে।

বন্দীনিবাসে বন্দীরা মাঝে মাঝে নাটক, জলসা প্রভৃতি প্রমোদ অনুষ্ঠান করতেন। কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী খুব ভাল অভিনয় করতে পারতেন। ১১ই ফেব্রুয়ারী একটি থিয়েটারের আয়োজন করা হল এবং নাটকের প্রথম দিকে অভিনয়ের জন্য একটি ভূমিকা দেওয়া হল কৃষ্ণপদ চক্রবর্তীকে। জেলের কর্মচারী প্রহরী সকলকে নিমন্ত্রণ করা হল নাটকের আসরে। তারাও লোকালয় থেকে দূরে জঙ্গলে পড়ে আছে—আমোদ প্রমোদের সুযোগ পায় না, সুতরাং নাটক দেখার আকর্ষণ সকলেরই প্রবল।

সন্ধ্যার পরে নাটক সুরু হল। বন্দীনিবাসের কর্মচারীরা অফিস ছেড়ে থিয়েটারে এসে বসলেন। পাহারাওয়ালারাও যার যার নির্দ্দিষ্ট স্থান ছেড়ে এসে থিয়েটার দেখায় মত্ত। অস্বাভাবিক কিছু ঘটতে পারে, এমন আশঙ্কা নাই কারও মনে। নাটকের প্রথম দুই দৃশ্যে কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী অভিনয় করলেন। ঐ নাটকে তারপরে আর তাঁর কোন ভূমিকা ছিল না।

থিয়েটার চলছে—অভিনয় জমে উঠেছে। সকলের অলক্ষ্যে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন—জিতেন গুপ্ত ও কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী। তারের বেড়ার কাছে কোন পাহারা নাই,—সবাই গিয়েছে থিয়েটার দেখতে। দুই সাহসী বিপ্লবী বিনা বাধায় কাঁটাতারের উচ্চ বেড়া টপকিয়ে জঙ্গলে পৌঁছালেন। রাত্রির অন্ধকারে সাত মাইল

বিপজ্জনক পথ পার হয়ে পৌছালেন বক্সাদুয়ার রেলষ্টেশনে। সেখান থেকে কলকাতা।

এত বড় কাণ্ড! বন্দীনিবাসের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য নাই। দৈনন্দিন কাজকর্ম যথারীতি চলছে। গুনতি সিপাই যথারীতি ভোর বেলায় বিভিন্ন ওয়ার্ডের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মশারী গুণতি করে চলে যাচ্ছে। পলায়িত দুজন বন্দীর খাটেই মশারী টাঙানো থাকে—মশারীর মধ্যে মানুষ আছে কিনা অত খোঁজ কে করে? সন্ধ্যার গুণতি সিপাই এসে "বাবুলোগ—ঠিক হ্যায়?" জিজ্ঞাসা করে চলে যায়। অতএব দুই দিনের মধ্যে বন্দীনিবাসের কর্তৃপক্ষ দুজন বন্দীর পলায়ন সম্পর্কে কিছু জানতেই পারলেন না। ১৪ই ফেব্রুয়ারী কলকাতার গোয়েন্দা অফিস থেকে টেলিগ্রাম গেল বক্সায়—"তোমাদের ক্যাম্প থেকে বন্দী পালিয়েছে।" পলাতকদের মধ্যে একজনকে কোন একজন গোয়েন্দা কর্মচারী কলকাতার রাস্তায় দেখতে পেয়েছে। বন্দীনিবাসে তখন হৈ চৈ সুরু হল। কিন্তু পাখী তখন শিকারীর বন্দুকের পাল্লার বাইরে বহুদূরে উড়ে চলে গিয়েছে।

বক্সা থেকে কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী ও জিতেন গুপ্তের পলায়নের পূর্বেই ১৯৩২ এর ৯ই জানুয়ারী রাত্রিযোগে বর্দ্ধমান জেলার ফরিদপুর গ্রামে অন্তরীণাবদ্ধ প্রভাত চক্রবর্তী তাঁর অন্তরীণাবাস পরিত্যাগ করে পলাতক হন। কলকাতা ৪নং আহেরীটোলা ফার্ষ্ট লেনে পার্টির গোপন শেলটারে অবস্থান করে তিনি গুপ্তবৈপ্লবিক কার্য্যসমূহ নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন।

আটক আইনে (B. C. L. Act এ) এবং প্রকাশ্য গণসংগ্রাম দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলনে কয়েক সহস্র অনুশীলন কর্মী কারারুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অনুশীলনের সংগঠন ভেঙে পড়ে নাই। আলোচ্য সময়ে শুধু কলকাতা সহরেই অনেকগুলি গোপন শেলটার ছিল, আত্মগোপনকারী বিপ্লবীগণ এই সব শেলটারে অবস্থান করে

সময়োচিত কর্মসূচী রূপায়ণে রত ছিলেন। পারস্পরিক সংযোগসূত্র রক্ষার দায়িত্ব ছিল প্রভাত চক্রবর্তীর উপরে।

আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমায় এইরূপ শেলটার সমূহের যেগুলি সাক্ষ্য প্রমাণের মধ্যে এসে পড়েছে, সেগুলি হল—৯ দর্মা-হাটা ষ্ট্রীট ; ৩৫ শিবঠাকুর লেন ; ২২১ দর্মাহাটা ষ্ট্রীট ; ২০৭ হ্যারিসন রোড , ১১ শিবতলা লেন ; ৪ আহেরীটোলা ষ্ট্রীট ; ৪৮ গ্রে ষ্ট্রীট ; ৮২ আপার সার্কুলার রোড ; ২১ বাদুর বাগান লেন ; ৪৭ কাঁকুড়গাছি সেকেণ্ড লেন ; ৬/২ ট্যাংরা রোড ; ১২এ চক্রবেড়িয়া রোড ; ১১ জামির লেন ; ১০৭ হ্যারিসন রোড ; ৪১ হরিসভা লেন (খিদিরপুর) ও ২৫৫ সার্কুলার রোড (হাওড়া)।

১৯৩২ সালে কয়েকটি ছোটোখাটো ঘটনা ঘটে। ১৫ই ফেব্রুয়ারী ময়মনসিংহ জেলার মির্জাপুর থানার অধীন চাউলি-চরপাড়া গ্রামে একটী ডাকাতি হয়। ৬ নভেম্বর তারিখে দিনাজ-পুরের বিশিষ্ট অনুশীলন কর্মী পরেশ গুহ খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত শ্যামনগর গ্রামের অন্তরীণাবাস থেকে পলায়ন করতঃ আত্মগোপন করে 'সক্রিয় কর্মীর' ভূমিকা পালন করতে থাকেন। অনুশীলন সমিতির ব্রহ্মদেশ শাখার 'অর্গ্যানাইজার নরেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ চাউলি-চরপাড়া ডাকাতি সম্পর্কে ঢাকা সহরে ধরা পড়েন। ২৯ নভেম্বর নোয়াখালি জেলার বিজয়পুরে একটি ডাকাতি হয় ১৮ নভেম্বর রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলে সুপারিণ্টে-ণ্ডেণ্ট মিঃ লিউক তাঁর মোটর গাড়ীতে সস্ত্রীক সান্ধ্যভ্রমণ উপভোগ করছিলেন। এমন সময় সাইকেল আরোহী তিনজন বিপ্লবী হত্যা করবার উদ্দেশ্যে তাঁকে আক্রমণ করে। প্রথমে একজন তার সাইকেলটাকে আড়ভাবে লিউক সাহেবের মোটরের সামনে ছুঁড়ে দেয়। মোটরের গতি রুদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে তিনটি রিভলভার থেকে তাঁর উপরে গুলী বর্ষিত হয়। লিউক সাহেবের চোয়াল উড়ে যায়। কিন্তু তিনি প্রাণে বেঁচে যান। বিপ্লবীরা শূন্যে গুলী ছুঁড়তে

ছুঁড়তে পালিয়ে যায়। পরে এই ঘটনা সম্পর্কে ভোলানাথ রায় কর্মকার নামক এক অনুশীলনকর্মীকে বিচারার্থ চালান দেওয়া হয়। বিচারে তিনি সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। রাজসাহী জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহার ও তাঁদের উপরে নিয়ত অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণার্থে লিউক-হত্যার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

বৈপ্লবিক 'অ্যাক্‌সন" হিসাবে উপরিলিখিত ঘটনাগুলির কোনটিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয় অনুশীলন সমিতি ঐ সময়ে সংগঠনের বিস্তার ও দৃঢ়ীকরণের দিকেই সবাধিক মনোযোগী ছিলেন। ছোটোখাটো sporadic violence পরিহার করাই তখন পার্টির নীতি ছিল। কিন্তু সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে ভারতব্যাপী বিশাল সংগঠনের সকল প্রান্তে যথোচিত যোগাযোগ রক্ষা করা তখন সম্ভব ছিল না। এই জন্য sporadic violence সম্পূর্ণ বর্জন করা সম্ভব হয় নাই।

ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে H W. Hale কর্তৃক সঙ্কলিত রিপোর্টে বলা হয়েছে—

"For some time it had been known that Pravat Chakraborty and Jiten Gupta had been leading a very strong and active group of Anushilan Jiten had escaped from Buxa Camp iu February 1932, but he was rearrested on 17 Decamber 1932". ‘‘

জিতেন গুপ্ত বন্দীশালা থেকে পলায়নকারী বিপ্লবী। সুতরাং তাঁর পলায়নের পর থেকেই গোয়েন্দা পুলিশ তাঁর সন্ধানে তৎপর ছিল। পুলিশ কোনো সূত্রে সংবাদ পায় যে দর্মাহাটা স্ট্রীটে জিতেন বাস করছেন। তারা দর্মাহাটা স্ট্রীট ও স্ট্র্যান্ড রোডের সংযোগ স্থলে সাদাপোষাকের ওয়াচার মোতায়েন করে। ২৮শে ডিসেম্বর জিতেনবাবু তাঁর গোপন আবাস থেকে নির্গত হয়ে স্ট্র্যান্ড রোড ও

দর্মাহাটার সঙ্গমস্থলে পৌঁছানো মাত্র তথায় অপেক্ষারত গোয়েন্দা পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ইতোমধ্যে পুলিশ সংবাদ পায় যে গভর্নমেণ্ট কর্তৃক 'পলাতক' বলে ঘোষিত হেম ভট্টাচার্য্য আত্ম-গোপন করে ৩৫ শিবঠাকুর লেনে অবস্থান করছেন। পুলিশ ঐ বাড়ীর সম্মুখে সাদাপোষাকের watcher মোতায়েন করে এবং ৩০ ডিসেম্বর হেম ভট্টাচার্য্য ঐ বাড়ী থেকে বাইরে এসে রাস্তায় পা দেওয়া মাত্র তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঐ দিনই অর্থাৎ ৩০ ডিসেম্বর ১৯৩২ তারিখে ৩৫ নং শিব ঠাকুর লেনের সামনে বেলা ২ ঘটিকায় পুলিশ গ্রেপ্তার করে কিশোরী দাশগুপ্তকে এবং তার এক ঘণ্টা পরে ঐ একই স্থান থেকে বিমল ভট্টাচার্য্য গ্রেপ্তার হন। কিশোরীবাবু ও বিমলবাবুকে সঙ্গে নিয়ে বেলা তিনটায় পুলিশদল ৩৫ নং শিবঠাকুর লেনের বাড়ী তল্লাসী করে। ঐ সময়ে বিপ্লবীদের ভাড়া নেওয়া ঘরে উপস্থিত ছিলেন সুরেন্দ্র ধরচৌধুরী ও জ্যোতিষ মজুমদার। তল্লাসীতে পুলিশ ঘরের ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে একটি রিভলভারের কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অংশ, কিছু তাজা কার্তুজ (যা চিনেবাদাম ও তেজপাতা ভর্তি মাটির হাঁড়ির মধ্যে লুকানো ছিল) উদ্ধার করে। সুরেন্দ্র ধরচৌধুরীর গায়ে যে কোট ছিল তার পকেটে আরও নয়টি তাজা কার্তুজ এবং একটা 'মজার' (mauser) পিস্তলের পিছনের অংশ পুলিশ হস্তগত করে। (পরে ১০ জানুয়ারী, ১৯৩৩ ঐ পিস্তলের অপরাংশ পুলিশের হস্তগত হয় ২০১ নং হ্যারিসন রোডের বাড়ী তল্লাসীর সময়ে)। শিবঠাকুর লেনের শেলটার তল্লাসীর সময়ে পুলিশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র উদ্ধার করে—যার মধ্যে ঐ সময়ে যে সকল অনুশীলন কর্মী বাইরে কর্মরত ছিলেন তাঁদের কতক নাম ঠিকানা সাঙ্কেতিক লিপিতে লেখা ছিল। ৯ নং দর্মাহাটা স্ট্রীটে জিতেন গুপ্ত ও কিশোরী দাশগুপ্তের, গোপন আবাস তল্লাসী করেও পুলিশ অনুরূপ একটি cypher list আবিষ্কার করে। এই সব গ্রেপ্তারের অল্পদিন পরে সত্যেন মজুমদারকে B.C.L.A তে গ্রেপ্তার

করে, পরে তাঁকে ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমায় আসামী তালিকাভুক্ত করা হয়।

১৪ই জানুয়ারী ষড়যন্ত্রের নেতারূপে চিহ্নিত প্রভাত চক্রবর্তীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। প্রভাতবাবুর গ্রেপ্তারের পর বাইরের কাজকর্মের নেতৃত্ব ন্যস্ত হয় পরেশ গুহের উপরে। পরেশবাবু, সুধীর ভট্টাচার্য, হরিপদ দে, হাস্যবালা দেবী এবং মায়া নাগ ৪৭ নং কাঁকুড়গাছি সেকেণ্ড লেনের গোপন শেলটারে আত্মগোপন করে বাস করছিলেন। এই সময়ে পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, সত্যেন মজুমদার প্রভৃতি ছিলেন প্রেসিডেন্সী জেলে। ঐ জেলে আবদ্ধ বিপ্লবী বন্দীগণকে বলপূর্বক মুক্ত করে নিয়ে যাওয়ার এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয় প্রেসিডেন্সি জেলে আবদ্ধ বন্দীগণ ও কাঁকুরগাছি শেলটারের গুপ্তপথবাহী পারস্পরিক যোগযোগের মাধ্যমে। তারিখ ও সময় নির্দ্দিষ্ট হয়। স্থির হয় যে নির্দ্ধারিত তারিখে বাইরের বিপ্লবীরা মোটর গাড়ী, ফোল্ডিং ল্যাডার ও প্রচুর বোমা ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রেসিডেন্সি জেলের নিকটে এসে সবুজ আলোর সঙ্কেতদান করবেন। জেল থেকে বন্দীরা লাল আলোর সঙ্কেতদান করে প্রত্যুত্তর দিলেই বোঝা যাবে বন্দীরা প্রস্তুত। তখন একযোগে বাহির থেকে ও জেলের ভিতর থেকে সমবেত আক্রমণ চালিয়ে কারারক্ষীদের মনোবল নষ্ট করে দিয়ে বন্দীরা বাইরে চলে আসবেন ও মোটরগাড়ী করে তাঁদেরকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হবে। হরিপদ দে ছিলেন এঞ্জিনিয়ার ও কেমিষ্ট। তিনি folding ladder প্রস্তুত করে ফেললেন। আক্রমণের সময়ে কারারক্ষীগণকে বিভ্রান্ত করবার উদ্দেশ্যে ধূম্র যবনিকা বা Smoke screen সৃষ্টির ফর্মুলা প্রস্তুত করে তদনুযায়ী মাল মসলা সংগ্রহ করলেন। বোমা পিস্তল ইত্যাদিও জড়ো করা এবং একখানি মোটর গাড়ীও খরিদ করা হল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে সবুজ আলোর সঙ্কেতের অপেক্ষার নির্দ্দিষ্টস্থানে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ওয়ার্ড থেকে রাত্রিকালে প্রহরীদের চোখ এড়িয়ে নির্দ্দিষ্টস্থানে পৌঁছতে তাঁদেরকে snail movement tactics (অর্থাৎ শামুকের মত বুকে হেঁটে নিঃশব্দে এগিয়ে যাওয়ার কৌশল) অবলম্বন করতে হয়েছিল। এ কৌশল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও অভ্যাস-সাধ্য। কিন্তু বাইরে থেকে সবুজ আলোর সঙ্কেত এলো না। ফলে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। পরে সংবাদ পাওয়া যায় যে কাঁকুড়গাছি শেলটার থেকে বিপ্লবীরা মোটর এবং সমস্ত সাজ সরঞ্জাম নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু এসে দেখতে পান প্রেসিডেন্সিজেলের দেয়ালের বাইরে সশস্ত্র পুলিশ বেষ্টনী। তাঁরা বুঝতে পারেন পুলিশ পূর্বাহ্নেই খবর পেয়ে গিয়েছে। সুতরাং তাঁরা ফিরে যেতে বাধ্য হন। প্রকৃতপক্ষে জিতেন নাহাই পুলিশকে এই প্রচেষ্টার খবর জানায় এবং মোকর্দ্দমায় রাজসাক্ষী হিসাবে সে এই প্রচেষ্টার বর্ণনা প্রদান করে।

ঐ পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার পরেই, ২৭শে মে তারিখের কয়েকদিন আগে পরেশবাবুরা ৪৭ নং কাঁকুড়গাছি লেনের বাড়ী পরিত্যাগ করে ১২এ চক্রবেড়িয়া রোডে নূতন শেলটারে চলে যান। পুলিশ ২৭শে মে তরিখে কাঁকুড়গাছি শেলটার ঘেরাও করে তখন ঐ শেলটারে কেউ ছিল না। পুলিশ ঐ বাড়ী থেকে H. S. R. A র গঠনবিধির একটি কপি হস্তগত করে। ৩০ শে মে রাত্রে ১১ নং জামির লেনের সম্মুখে মোটর গাড়ীখানি পুলিশ দেখতে পায়—ঐ সময়ে গাড়ীর মধ্যে নিরঞ্জন ঘোষাল ও হরিপদ দে নিদ্রিত অবস্থায় ছিলেন। পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে ও গাড়ীখানি সীজ করে।

২৯শে মে থেকে ৩১ মে—এই সময়ের মধ্যে হাওড়া থেকে ভোলানাথ দাস ও কলকাতা থেকে প্রভাত মিত্র গ্রেপ্তার হন।

পরেশবাবু ৬/২ ট্যাংরা রোডের বাড়ী সম্মুখে গ্রেপ্তার হন। পুলিশ ঐ বাড়ী তল্লাসী করে কিছু কম্যুনিষ্ট সাহিত্য ও কতকগুলি

বৈপ্লবিক পুস্তক হস্তগত করে। এছাড়া, "Military Engineering" ও Machine Gunners' Hand Book নামে দুইখানা পুস্তক, কিছু বোমা প্রস্তুত ও বিস্ফোরকদ্রব্য ব্যবহারের ফর্মুলা, কয়েকটি বৈপ্লবিক পরিকল্পনার খসড়া এবং সাঙ্কেতিক লিপিতে লিখিত কতকগুলি নামঠিকানা উদ্ধার করে।

দর্মাহাটা স্ট্রীট ও শিবঠাকুর লেনের শেলটারে সামনে থেকে ক্রমে ক্রমে গ্রেপ্তার হন দ্বিজেন রায়, যতীন চক্রবর্তী ও সন্তোষ চ্যাটার্জি।

কিশোরী দাশগুপ্ত ও ভুপেন মজুমদার ঐ সময়ে আত্মগোপনকারী নেতাদের মধ্যে সংযোগসূত্র (linkman) হিসাবে কাজ করতেন। পুলিশ সংবাদ পায় যে ভুপেন মজুমদার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করবার জন্য পুলিশ হাসপাতালে যায়। কিন্তু তার পুর্বেই শয্যা থেকে রোগী পলাতক। ঐ রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছিলেন কবিরাজ লক্ষীনারায়ণ শর্মা। ২০১ নং হ্যারিসন রোডে তাঁর ডিসপেন্সারী ছিল। আর, ঐ বাড়ীটিই ছিল অনুশীলন সমিতির আর একটি গোপন শেলটার। ঐ বাড়ী থেকে পুলিশ শর্মাজীকে ও তাঁর সহকারী শ্যামবিহারী শুক্লাকে গ্রেপ্তার করে এবং ঐ বাড়ী থেকে উদ্ধার করে "স্বাধীন ভারত" এবং ইস্তাহারের মাথায় ছোরা ও পিস্তলের ছবি মুদ্রিত করবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত দুটি "প্রিন্টিং ব্লক"।

এত সব গ্রেপ্তারের খবর যাতে বাইরে প্রকাশ হয়ে না পড়ে সে সম্পর্কে পুলিশ খুবই সতর্কতা অবলম্বন করেছিল। তারা জানত যে গ্রেপ্তার ও তল্লাসীর খবর প্রকাশ হয়ে পড়লেই "পালের গোদা" যারা বাইরে আছে তারা জাল কেটে বেরিয়ে গিয়ে অগাধ জলের তলায় ঢুকবে—তাদের আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রভাত চক্রবর্তী কোন সংবাদ পান নাই। তবে যাদের আসবার

কথা তারা আসছে না দেখে সন্দেহ করলেন—অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটেছে। তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর গোপন আস্তানা ৪ নং আহেরীটোলা ফার্স্ট লেন থেকে সরিয়ে নিয়ে তারই কাছাকাছি অপর একটা বাড়ীতে—১১ নং শীতলা লেনে স্থানান্তরিত করলেন।

১৯৩৩ সালের ১৪ই জানুয়ারী পুলিশ ৪ নং আহেরীটোলা ফার্স্ট লেনে হানা দেয়। সেখানে প্রভাতবাবু ছিলেন না। স্থানীয় লোকে প্রভাতবাবুর বৈপ্লবিক পরিচয় জানতো না। তারা মনে করে সাধারণ পুলিশী তদন্তের ব্যাপার। তারা জানায় এখানে যে বাবু থাকতেন তিনি ১১ নং শীতলা লেনের বাড়ীতে উঠে গেছেন। শেষোক্তস্থানে আতকিতে হানা দিয়ে পুলিশ প্রভাতবাবুকে গ্রেপ্তার করে। তার কাছে তখন একটি গুলী ভর্তি রিভলভার ছিল। এছাড়া ওখানে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র পুলিশ হস্তগত করে। প্রভাতবাবু গ্রেপ্তার হলেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাগজ যা পুলিশের হাতে পড়ে তা হল সাঙ্কেতিক লিপিতে লেখা একগাদা নাম-ঠিকানা। সারা ভারতে ছড়ানো পার্টির linkman দের নাম-ঠিকানা।

এই নামঠিকানাগুলি থেকেই অনুশীলন সমিতির সংগঠনের ব্যাপকতার একটা আভাস পাওয়া যাবে। সাঙ্কেতিক লিপির পাঠোদ্ধারের পর দেখা যায় নামের তালিকায় নিম্নলিখিত স্থানগুলির অধিবাসীদের নাম আছে ঃ—

কলকাতা ; হুগলী ; যশোহর ; ফরিদপুর ; রাজসাহী ; রংপুর ; লাহোর ; পাটনা ; পূর্ণিয়া ; বর্দ্ধমান ; মেদিনীপুর ; ঢাকা ; চট্টগ্রাম ; মালদহ ; কোচবিহার ; কাশী ; গয়া ; মানভূম ; বহরমপুর ; খুলনা ; মৈমনসিংহ ; নোয়াখালি ; জলপাইগুড়ি ; দিল্লী ; বুলন্দশহর ; জামসেদপুর ; হাজিপুর (বিহার) ; বীরভূম ;

নদীয়া ; বরিশাল ; ত্রিপুরা ; দিনাজপুর ; অমৃতসর ; শাহজাহানপুর (উত্তরপ্রদেশ) ; মুঙ্গের ; হাজারীবাগ ; মুজাফফরপুর ; মাদ্রাজ; ওয়ালটেয়ার ; রেঙ্গুন ; মান্দালয় ; শ্রীহট্ট।

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাসীর হিড়িক পড়ে যায়। পাঁচশতাধিক ব্যক্তি ধৃত হয়—অন্ততঃ ১০০০ বাড়ী খানাতল্লাসী হয়। তথাপি ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার জালের গ্রন্থিগুলি শক্ত করবার উপযুক্ত মালমসলায় ঘাটতি থাকে। এই ঘাটতি পূরণ হল ১৬ মে, ১৯৩৩ জিতেন নাহার গ্রেপ্তারের পরে। জিতেন ধরা পড়েই স্বীকারোক্তি করে, কিন্তু পুলিশ তাকে কোন মোকদ্দমায় অভিযুক্ত না করে বিনা বিচারে আটক বন্দী হিসাবে প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠিয়ে দেয়। জিতেন নিঃসন্দেহে পুলিশের এজেণ্ট হয়েই প্রেসিডেন্সি জেলে স্থানলাভ করেছিল। কারণ সে সময়ে পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত প্রভৃতি অনুশীলনের দায়িত্বশীল সক্রিয় সভ্যগণ ঐ জেলে ছিলেন। জিতেন তাঁদের সাথে মিশে যাতে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই তাকে 'ডেটিনিউ' হিসাবে প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠিয়ে দেয়। পরে জিতেনকে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমায় আসামী-শ্রেণীভুক্ত করা হয়। জিতেন নাহা ও ঋষিকেশ দাশগুপ্ত রাজসাক্ষী হয়ে আদালতের ক্ষমা লাভ করে। এই ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা সম্পর্কে সর্বশেষ গ্রেপ্তার হয় ২৭শে জুন, ১৯৩৩। ঐদিন ১২ ক চক্রবেড়িয়া লেন থেকে অমূল্য সেন, সন্তোষ চ্যাটার্জি, মায়া নাগ ও হাস্যবালা দেবীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঐ বাড়ী তল্লাসী করে পুলিশ যে সকল জিনিষপত্র উদ্ধার করে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল সাঙ্কেতিক-লিখিত একখানা চিঠি যা প্রেসিডেন্সি জেল থেকে বাইরের কোন আত্মগোপনকারী বিপ্লবীর কাছে প্রেরিত হয়েছিল। ঐ সাঙ্কেতিক লিপির পাঠোদ্ধার করলে দেখা যায় এতে তৎকালীন অন্তরীণাবদ্ধ সত্যেন মজুমদার ও পুলিন বক্সীকে আত্মগোপন করবার নির্দ্দেশ এবং প্রেসিডেন্সি জেল থেকে বিপ্লবী বন্দীগণকে মুক্ত করে

নেওয়ার প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে বলে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। বিপ্লবী রাজবন্দীরা যখন প্রেসিডেন্সি জেল থেকে প্রেরিত হবেন—সেই সময়ে পাথিমধ্যে শিকল টেনে ট্রেন থামিয়ে বন্দীদেরকে বলপূর্বক মুক্ত করে নিয়ে যাওয়ার একটি পরিকল্পনা বিবৃত করা হয়েছে।

শেষ পর্য্যন্ত ৪০ জনের বিরুদ্ধে "ভারত সম্রাটকে সাম্রাজ্যচ্যুত করবার উদ্দেশ্যে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ষড়যন্ত্রের" অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ক ধারা অনুসারে মোকর্দ্দমা দায়ের হয় এবং অবশিষ্ট ধৃত ব্যক্তিদের প্রায় সকলকেই বিনা বিচারে আটক করা হয়।

যে ৪০ জনকে বিচারার্থে সোপরদ্দ করা হয় হয় তারা হলেন ঃ— ত্রিপুরার প্রভাত চক্রবর্তী, বিমল ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্র ধর চৌধুরী, কালিমোহন দে, জ্যোতিষ মজুমদার, যতীন চক্রবর্তী, অবনীমোহন ভট্টাচার্য্য, সুধীর চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ধীরেন ভট্টাচার্য্য ; নোয়াখালির কিশোরী মোহন দাশগুপ্ত ; চট্টগ্রামের হেম ভট্টাচার্য্য, মনীন্দ্রলাল চৌধুরী ; ঢাকার পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, হরিপদ দে, অমূল্য সেনগুপ্ত, অমিয় পাল, জিতেন নাহা ; বরিশালের ইন্দুভূষণ মজুমদার, জ্যোতিমুকুল ঘোষ ; রাজসাহীর দ্বিজেন্দ্র তলাপাত্র ; ফরিদপুরের জীতেন গুপ্ত, সীতানাথ দে, সন্তোষ চ্যাটার্জী, নিরঞ্জন ঘোষাল ; খুলনার অবনী রঞ্জন সরকার ; দিনাজপুরের পরেশ গুহ ; কলিকাতার প্রবোধ কুমার ঘোষ ; হাওড়ার ভোলানাথ দাস ; হুগলীর প্রভাত কুমার মিত্র ; মেদিনীপুরের সুধীর ভট্টাচার্য্য ; জলপাইগুড়ির অজিত কুমার বসু ; শিলিগুড়ির সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার ; বিহার-কলিকাতার লক্ষীনারায়ণ শর্মা ; সাহজাহান-পুর-সংযুক্ত প্রদেশের শ্যামবিহারীলাল শুক্ল ; এবং বার্মার সঞ্জীব কুমার মুখার্জী ও নরেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ।

এছাড়া ছিলেন ঋষিকেশ গুপ্ত, ভুপেন মজুমদার, দ্বিজেন রায়, ও সুশীল রায় চক্রবর্তী।

পূর্বোক্ত ৪০ জনের মধ্যে জিতেন নাহা ও ঋষিকেশ গুপ্ত রাজ-সাক্ষী হয় ও মার্জনা লাভ করে। প্রাথমিক তদন্তে দ্বিজেন রায়ের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে মুক্তি দিয়ে তৎক্ষণাৎ B. C. L. A আইনে পুনরায় গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। সুধীর ভট্টাচার্য্য বিকৃত মস্তিষ্ক সাব্যস্ত হওয়ায় তাঁর বিচার স্থগিত রাখতে হয়। ভূপেন মজুমদার ফেরারী ছিলেন, পুলিশ তাঁকে ধরতে পারে না। অবশিষ্ট ৩৫ জনকে বিচারার্থ দায়রায় সোপরদ্দ করা হয়।

এই মোকর্দ্দমার বিচারের জন্য মিঃ টি. বি. জেম্‌সনের অধি-নায়কত্বে একটি স্পেসাল ট্রাইব্যুনালের অপর দুইজন সভ্য ছিলেন —মিঃ আর. সি সেন ও মিঃ ওয়াই. সিরাজী।

মোকর্দ্দমা বিচারাধীন থাকাকালে একটি ঐতিহাসিক ও চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। ১৯৩৪ সালের ৩১শে জুলাই পূর্বোক্ত বিচারাধীন আসামীদের মধ্যে চারজন নেতৃস্থানীয় বিপ্লবী প্রকাশ্য দিবালোকে কারারক্ষীদের সতর্কতা বিফল করে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের উঁচু প্রাচীর ডিঙিয়ে জেল থেকে পলায়ন করেন। এই পলায়ন পর্বের মধ্য দিয়ে বিপ্লবীগণের অত্যন্ত উচ্চমানের দূরদৃষ্টি, বিচক্ষণতা, দুঃসাহসিকতা, ও আত্মোৎসর্গ-প্রবণতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। পলায়নের পরিকল্পনা-রচনা ও প্রস্তুতির পর্বের মধ্যে বিপ্লবীরা তাঁদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অধ্যবসায়, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ও আদর্শের জন্য চরমতম ত্যাগ স্বীকারের প্রেরণা প্রকাশ পায়। এই চাঞ্চল্যকর পলায়ন বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্ব-পূর্ণ ঘটনা। মোকর্দ্দমায় সরকার পক্ষে সওয়াল করবার সময়ে বক্সাদুর্গ বন্দীনিবাস থেকে জিতেন গুপ্ত ও কৃষ্ণপদ চক্রবর্তীর পলায়ন কাহিনী ইতঃপূর্বে বিবৃত হয়েছে। ঐ দুইজনের পলায়নের সময়ে পূর্ণানন্দবাবু বক্সাদুর্গ বন্দীনিবাসে আটক ছিলেন এবং তাঁদের পলায়ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কৌশল রচনার

ব্যাপারে পূর্ণানন্দবাবুর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। উক্ত দুজনের পলায়নের পর ঐ বন্দীনিবাসে এমন একটি ঘটনা ঘটে, যার ফলে পূর্ণানন্দবাবুকে ঐ বন্দীনিবাস থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে হয়। ঘটনাটি এই—পূর্বোক্ত বন্দী দুজনের পলায়নের পরে ঐ বন্দীনিবাসে আটক বন্দীদের প্রতি বন্দীশালার অধ্যক্ষ মিঃ কোটামের (Mr. Cottam এর) ব্যবহার ক্রমশঃ রূঢ় হতে থাকে এবং তাঁর বাক্যে ও আচরণে প্রায়শঃ অহেতুক ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেতে থাকে এবং কথাবার্তা ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। ক্রমাগত উত্যক্ত হয়ে বিপ্লবীরাও ধমকের জবাবে ধমক লাগানোর কৌশল গ্রহণ করলেন। সাহেব অতঃপর বন্দীদের সাথে সাক্ষাৎকার বন্ধ করে দিলেন। তিনি বন্দীনিবাসের ভিতরে আসেন না, দৈনিক রাউণ্ড দেন না, দরখাস্ত করলে বা স্লিপ পাঠালে জবাব দেন। ফলে বন্দীদের অভাব অসুবিধা ইত্যাদি ব্যাপারে অভিযোগ জানানোর পথ বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায় বন্দীরা স্থির করেন সাহেবের অফিসে গিয়ে তাঁকে 'শাস্তি' দিতে হবে। শাস্তিটা কি? যে শাস্তি স্থির হল সেটা অভিনব—কোন ছলে সাহেবের অফিসে প্রবেশ করে তাঁকে প্রহার—অন্য কিছু দিয়ে নয়—জুতা দিয়ে অর্থাৎ সাহেবকে পাদুকার দ্বারা পেটানো। সাহেবের চেয়ারের দুই পাশে দাঁড়িয়ে থাকে দুই পিস্তলধারী পাহারা—আশে পাশে কোমরবন্ধে পিস্তল ঝোলানো ৩/৪ জন অফিসার—দরজায় ও বাইরের দিকে রাইফেলধারী পাহারা। এইরূপ সুরক্ষিত চক্রব্যূহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সাহেবের শ্রীঅঙ্গে পাদুকাঘাত করে জীবন নিয়ে ফিরে আসা প্রায় অসম্ভব। অনুশীলনের নেতা বীরেন চট্টোপাধ্যায় ডেকে বললেন 'মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে অসাধ্য সাধনের গৌরব অর্জনে আগ্রহ যার আছে, সে এগিয়ে এসো। অনেকেই 'আমি যাবো' 'আমি যাবো' করে এগিয়ে এলো। তার মধ্য থেকে বীরেনবাবু বেছে নিলেন দুজনকে—পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত এবং দক্ষিণ কলিকাতার খ্যাতনামা অনুশীলনকর্মী ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপা-

ধ্যায়। স্থির হল প্রথম দিন যাবেন পূর্ণানন্দবাবু তার ২/১ দিন পরে ধীরেনবাবু।

নির্দ্দিষ্ট দিনে পূর্ণানন্দবাবু সাহেবের কাছে স্লিপ পাঠালেন— খুব জরুরী প্রয়োজন, দেখা করতে চাই। অনুমতি পেয়ে পূর্ণানন্দবাবু গিয়ে চেয়ারে বসলেন—দুজনে মুখোমুখী, মাঝখানে টেবিল। কথাবার্তার মাঝখানে পূর্ণানন্দবাবু পা থেকে চটিজুতা খুলে নিয়ে মুহূর্ত মধ্যে সাহেবের গালে পাদুকাঘাত করলেন। তারপর যা হবার তাই হল। সাহেবের অনুচরেরা ঘরের মেঝেয় পূর্ণানন্দবাবুকে পেড়ে ফেলে উত্তম-মধ্যম দিতে লাগলো। শরীর রক্তে ভেসে গেল, নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগলো— হতচেতন অর্দ্ধমৃত অবস্থায় তাঁকে স্ট্রেচারে করে বয়ে এনে সাহেবের অনুচরেরা বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দিল। কয়েকদিন পরে ধীরেন মুখার্জ্জি একই উপায়ে অনুরূপ কৌশলে সাহেবের গালে দ্বিতীয় পাদুকাঘাত করলেন এবং রক্তাক্ত, অচেতন ও অর্দ্ধমৃত অবস্থায় স্ট্রেচারশায়ী হয়ে বন্ধুদের কাছে পৌঁছালেন।

সাহেব দুজনের নামে থানায় এজাহার পাঠালেন। ওঁরা দুজন গ্রেপ্তার হলেন। বিচার হবে জলপাইগুড়ি কোর্টে অতএব বক্সা বন্দী নিবাস থেকে ওঁরা স্থানান্তরিত হন জলপাইগুড়ি জেলে। বিচার অন্তে সাজা ভোগের জন্য পূর্ণানন্দবাবুকে পাঠালো প্রেসিডেন্সি জেলে, সেখান থেকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলেই পূর্বোক্ত ঐতিহাসিক পলায়নপর্ব পরিকল্পিত হয়।

একদিকে অমিতশক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পাশবিক হিংস্রতার সমস্ত গুপ্ত ভাণ্ডার অর্গলমুক্ত করে দিয়ে ভারতভূমির উপরে ইংরাজের দখলদারীকে নিরঙ্কুশ করবার উদ্দেশ্যে সর্বশক্তি একত্রিত করে দানবীয় অভিযানে প্রমত্ত হয়েছে—অন্যদিকে দেশ প্রেমের ভাগীরথী-ধারায় বিধৌত পবিত্রহৃদয় তরুণের দল যারা

অত্যাচার ও দুঃসহ ক্লেশের কণ্টকশয্যায় হাসিমুখে গড়াগড়ি দেয়—যারা মৃত্যুকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে দৃপ্ত পদক্ষেপে বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করে যায়—প্রয়োজন হলে আপন জীবনটাকেই প্রশান্তচিত্তে পথের ধূলায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়—পরাধীনতার বন্ধনশৃঙখল থেকে স্বদেশকে মুক্ত করবার অটুট সঙ্কল্পকে অনির্বাণ অগ্নিশিখার মত বুকের মাঝে জ্বালিয়ে রেখে। এই যুদ্ধ তখন চলছে ভারত জুড়ে। কারাগার থেকে, বন্দীনিবাস থেকে, শিকল কেটে বেরিয়ে আসা এই যুদ্ধেরই অপরিহার্য্য অঙ্গ। দানবের প্রয়াস—শুভশক্তিকে নিশ্চিহ্ন করা। দানববিরোধী শক্তি অজস্র মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নিরন্তর নূতন নূতন সংগ্রামী সৃষ্টি করে চলেছে দানবসৈন্যের রক্তচক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে। এটাই যুদ্ধের আঙ্গিক।

আলিপুর জেলে আবদ্ধ অনুশীলন বিপ্লবীরা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে কয়েকজন দায়িত্বশীল কর্মীকে বাইরের সংগঠন পরিচালনার জন্য জেলের প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে বাইরে গিয়ে আত্মগোপন করতে হবে। কিন্তু কাজটা ত খুব সহজ নয়। মহানগরীর অত্যন্ত জনবহুল এলাকায় আলিপুরের কেন্দ্রীয় বন্দীশালা। শুধু উঁচু প্রাচীর ডিঙিয়ে বাইরে পড়লেই হল না—কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আদিগঙ্গা সাঁতরিয়ে পার হয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে হবে।

ছয়মাস সময় হাতে রেখে প্রস্তুতি সুরু হল। স্থির হল যে পালাতে হবে দিনের বেলায় কারণ রাত্রে একে ত জেলে বন্দীদের রাখা হয় তালাবন্ধ করে। দ্বিতীয়তঃ আদিগঙ্গা সাঁতরিয়ে ডাঙ্গায় উঠে গা ঢাকা দেওয়া দিনের আলোয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে অদৃশ্য হতে হবে। কারণ প্রকাশ্য দিবালোকে পলায়ন বড় জোর পাঁচ মিনিটের মধ্যে জানাজানি হয়ে যাবে। সিপাহী তার বাঁশী বাজাবে—সঙ্গে সঙ্গে প্রবলশব্দে বেজে উঠবে 'পাগলাঘণ্টি' বা 'alarm'। টাওয়ারের বড় ঘড়িতে একটানা বেজে চলবে

ঢং ঢং ঢং ঢং—বিকট আওয়াজ। সুপার, জেলার-অফিসারদল জমাদার, সিপাহী, সশস্ত্র শাস্ত্রী সকলে মিলে সঙ্গীন-চড়ানো রাইফেল, লাঠি, ডাণ্ডা নিয়ে মার্চ করে ছুটবে দৈত্যবাহিনীর মত সদর্প পদক্ষেপে, ওয়ার্ডে এসে সব তছনছ করবে—সামনে লকআপের বাইরে যাকে পাবে তাকে লাঠির বাড়ি ও সঙ্গীনের খোঁচায় থেঁতলে মৃতপ্রায় করে ফেলবে। বিকট ঢং ঢং ঢং ঢং আওয়াজ শুনে আশপাশের সবাই জেনে যাবে জেল থেকে কয়েদী পালিয়েছে এই ভেবে। সুতরাং সে অবস্থায় ভিজা কাপড়ে চারজন মানুষকে রাস্তায় দেখলেই সকলে বুঝবে এরাই জেল-পালানো কয়েদী আর নেকড়ের মত রাস্তার লোকেরা পলাতকদের ছিঁড়ে খাবে। সুতরাং পাঁচমিনিটের মধ্যেই সব কাজ সারা হওয়া চাই।

পরামর্শ করে স্থির হল—পালাতে হবে বৃষ্টির দিনে। অতএব বর্ষাকাল পর্য্যন্ত চলবে প্রস্তুতিপর্ব। জুলাই মাসের শেষভাগ বাংলা পঞ্জিকার শ্রাবণ মাস—কিন্তু রোজ ত বৃষ্টি হয় না। কবে বৃষ্টি হবে?

এ দুরূহ প্রশ্নেরও সমাধান হল। মোকর্দ্দমার অন্যতম আসামী দ্বিজেন রায় ছিলেন স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে "আবহবিদ্যা" পাঠরত ছাত্র। তিনি বললেন—"বৃষ্টির পূর্বাভাস আমি দিতে পারব"। কয়েকমাস ধরে পরীক্ষা করা হল তাঁর প্রদত্ত 'পূর্বাভাস' কি পরিমাণে নির্ভরযোগ্য হয়। পরীক্ষায় প্রমাণিত হল দ্বিজেন বাবুর forecast শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে ঠিক হয়।

ওদিকে উঁচু প্রাচীর ডিঙানোর ব্যাপারটাও সহজ নয়। স্থির হল ছয়জন বন্দী পালাবেন। পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, হরিপদ দে, সীতানাথ দে ব্রহ্মচারী, নিরঞ্জন ঘোষাল, সত্যেন মজুমদার ও ভোলানাথ দাস—এই ছয়জন মনোনীত হলেন প্রস্তাবিত দুঃসাহসিক কর্মের জন্য।

ছয়জন বন্দীকে প্রাচীর ডিঙিয়ে পালাতে হবে তিন মিনিট সময়ের মধ্যে। পরামর্শ করে আরও স্থির হল যে প্রাচীর ডিঙানোর

জন্য বাইরের শেলটার থেকে কোন প্রকার সাহায্যের উপরে নির্ভরশীল হওয়া চলবে না। কারণ এর পূর্বে দেখা গিয়েছে পূর্বনির্দ্ধারিতমত বাইরের সতীর্থদের সাহায্য অনেক সময়েই নির্দ্দিষ্ট সময় অনুসারে পৌঁছুতে পারে না। দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেয়ালে কত সারি ইঁট আছে তা গণনা করে দেয়ালের উচ্চতার একটা পরিমাপ পাওয়া গেল। দেখা গেল যে যদি একজনের কাঁধের উপরে আর একজন দাঁড়ানো যায় এবং তার পরে যদি ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তির কাঁধের উপরে আরও একজন উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সেই তৃতীয় ব্যক্তি হাত বাড়িয়ে প্রাচীরের মাথা ধরতে পারে। একজনের কাঁধের উপরে আর একজন দাঁড়ানো খুব কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু পূর্বোক্তমত দ্বিতীয় ব্যক্তির কাঁধের উপরে তৃতীয় আর একজন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দুইহাতে দেয়াল আঁকড়ে ধরে শরীরটাকে মুহূর্তের মধ্যে দেয়ালের মাথার উপরে নিয়ে যাওয়া এবং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সেখান থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়া খুব কঠিন ব্যাপার।

সুতরাং বেশ কিছুদিন মহড়া দিয়ে কায়দাটা রপ্ত করতে হবে। হাতে সময় থাকবে তিন মিনিটের মত। প্রতি মিনিটে দুজন করে দেয়াল পার হতে পারলে তিন মিনিটে ছয়জনের wall scaling সমাধা হতে পারে। অতএব দুটি সারিতে wall scaling হবে। প্রত্যেক সারিতে একজন করে base man—তাঁর শরীর হবে একটু পালোয়ানী ধরনের; তাঁর কাঁধে দ্বিতীয় ব্যক্তি বা middle-man আর এই দ্বিতীয় ব্যক্তির কাঁধে উঠবেন Top-manরা—অর্থাৎ যাঁরা পলায়নকারী। দুই সারিতে দুজন base-man—দুজন middle man তিন বারে ছয়জন top-manকে পার করবেন। Top-man ছয়জনেরই শরীর হালকা হওয়া চাই।

জেলের মধ্যে প্র্যাক্‌টিস বা রিহার্সাল চলতে লাগলো। সেওত সহজ ব্যাপার নয়। তবে একটা সুযোগ জুটে গেল।

অনুশীলনের এককালীন সর্বোচ্চ নেতা, প্রখ্যাত বিপ্লবী নরেন্দ্রমোহন সেন এ সব ঘটনার বহুপূর্বেই সন্ন্যাস গ্রহণ করে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করে নরেন মহারাজ নামে পরিচিত হয়ে বেলুড় মঠে বাস করছিলেন। কিন্তু গায়ে বিপ্লবের গন্ধ রয়েছে। সুতরাং আণ্ডাসনী সাঁড়াশী তাঁকে বেলুড় মঠের সাধনাগার থেকে টেনে এনে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে পুরে দিল। স্পেসাল ইয়ার্ডের একটি cell এ তাঁর বাসস্থান নির্দিষ্ট হল। তিনি সাধু সন্ন্যাসী মানুষ, সারাদিন ধ্যান এবং শাস্ত্রপাঠরত— নির্জনতা লাভের জন্য তিনি তাঁর cell এর দরজায় একখানা কম্বল টাঙিয়ে রাখতেন— যাতে বাইরে থেকে কোন কিছু দেখা না যায়। জেলের সিপাহী জমাদারেরা ত 'সাধুবাবা' বলতে অজ্ঞান। তারা বিশ্বাস করত— সাধুবাবা অলৌকিক শক্তির অধিকারী।

নরেন মহারাজের cell এর মধ্যেই কাঁধে চড়ার প্র্যাক্টিস চলতে লাগলো। সিপাহী মহলে প্রচার করে দেওয়া হল প্র্যাক্টিস-কারীরা সাধুবাবার কাছে হঠযোগ ও কুম্ভক অভ্যাস করেন।

এই ভাবে তিন চার মাস ধরে base man, middle man ও top manগণ প্রত্যহ তালিম নিয়ে নিজেদেরকে প্রস্তুত করলেন।

অতঃপর বাদল-ঝরা শ্রাবণ এলো। ২৯শে জুলাই দ্বিজেনবাবু বললেন—"আগামী পরশু দুপুর বারোটা থেকে বৃষ্টি হবে। অতএব be ready"।

ইয়ার্ডের ভিতরে একজন সিপাই। আর Ironbars দিয়ে তৈরী enclosure এর কাছে আর একজন সিপাহী থাকে। বিপ্লবীরা স্থির করলেন পলায়নপর্ব সুরু হওয়ার আগে enclosure এর সিপাহীকে কোন কৌশলে অন্যত্র পাঠিয়ে দিতে হবে।

২/১ মিনিটের মধ্যেই পলায়নের ব্যাপার প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং জেলে পাগলাঘণ্টি বেজে উঠবে, একথা বিপ্লবীরা বুঝেছিলেন।

পাগলাঘণ্টির পরে যখন সশস্ত্র বাহিনী দানবীয় উত্তেজনায় ছুটে আসবে, সেই সময়ে ঐ বাহিনীকে ২/৪ মিনিট ঠেকিয়ে রাখা প্রয়োজন হবে। কারণ পলায়নকারীরা যাতে নিরাপদে আলিপুরের এলাকা ছেড়ে চলে যেতে পারেন সেই সময়টুকু তাঁদের পাওয়া দরকার। দানবীয় বাহিনীকে তাদের মার্চের মুখে যে ব্যক্তি বাধা দেবে, বাহিনী তখন সেই ব্যক্তির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে—এতে ইয়ার্ডে প্রবেশ করতে তাদের ৪/৫ মিনিট দেরী হওয়া সম্ভব। কিন্তু যিনি বাধা দিতে যাবেন—মৃত্যু নিশ্চিত জেনেই তাঁকে ঐ কাজে ব্রতী হতে হবে।

বিপ্লবীরা যে কত সহজে জীবন বিসর্জনের জন্য প্রস্তুত হতে পারতেন, বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে তার বহুতর পরিচয় তাঁরা রেখে গিয়েছেন। ৩১শে জুলাই ১৯৩৪ আলিপুর জেলে তার আর একটি পরিচয় লিপিবদ্ধ হল। স্বেচ্ছায় এগিয়ে এই দুঃসাহসিক কর্মের ভার গ্রহণ করলেন আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার অন্যতম আসামী অমূল্য সেন।

৩১শে জুলাই ঝির ঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে। ইয়ার্ডের সিপাহী জুলাই মাসের দুর্দ্দান্ত গরমে বৃষ্টির আমেজে ইয়ার্ডের মধ্যে একটি গুমটিঘরের বারান্দায় বসে চোখ বুঁজে নিদ্রাসুখ উপভোগ করছে। বাকি রইল enclosure এর সিপাহী। নির্দ্ধারিত সময়ের অল্পক্ষণ পূর্বে একজন আধপাগলা বন্দী অকস্মাৎ উন্মাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদ। বিপ্লবীরা enclosure এর সিপাহীকে ডেকে বললেন—"হঠাৎ ক্ষেপে গিয়েছে, শীগগীর একে হাসপাতালে নিয়ে যাও। সিপাহী নিঃসন্দিগ্ধ মনে পাগলকে ধরে নিয়ে হাসপাতালে চলে গেল। ইয়ার্ডের সিপাহীও গুমটিঘরের বারান্দায় বসে চোখ বুঁজে ঢুলছে। সুতরাং নিরাপদ মুহূর্ত্ত।

বিপ্লবীরা আর কালক্ষেপন করলেন না। পূর্বপরিকল্পনামত দুজন base man দেয়ালের ধারে দাঁড়িয়ে গেলেন। দুজন middle

man তাঁদের কাঁধে উঠলেন। মুহূর্ত মধ্যে দুই top man পূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত ও সীতানাথ দে ব্রহ্মচারী গঙ্গার ধারের দেয়াল অতিক্রম করে গঙ্গার পাড়ে লাফিয়ে পড়লেন। তৎক্ষণাৎ আরও দুজন top man নিরঞ্জন ঘোষাল এবং এঞ্জিনিয়ার হরিপদ দে দেয়াল অতিক্রম করলেন। ঠিক সেই সময়ে ইয়ার্ডের সিপাহীর ঘুম ভেঙে গেল। ব্যাপার বুঝতে পেরে সে তার বাঁশী বাজালো। সঙ্গে সঙ্গে পাগলা ঘণ্টি—টাওয়ারের রাক্ষুসে ঘণ্টায় বিকট শব্দে বেজে চলেছে ঢং ঢং ঢং ঢং। পলায়নকারী চারজন তখন আদিগঙ্গা সাঁতরে পার হয়েছেন। কিন্তু মনোনীত অপর দুজন ভোলানাথ দাস ও সত্যেন মজুমদার পলায়নের অবকাশ পেলেন না।

সঙ্গীনচড়ানো বন্দুক, লাঠিসোটা নিয়ে ছুটে এলো জেল সুপারের নেতৃত্বে দানববাহিনী। Enclosure এর গেট বন্ধ করে বলিষ্ঠদেহ দিয়ে গেট চেপে ধরে তাদের ইয়ার্ডে প্রবেশে বাধা দিলেন নির্ভীক বিপ্লবী অমূল্য সেন। বিশাল বাহিনীর সাথে শুধু হাতে একা যুদ্ধ করবার যা পরিণাম তা তিনি জানতেন। তাঁর উদ্দেশ্য সময়ক্ষেপণ, আপন জীবনের মূল্যে। ২/৪ মিনিট এভাবে তাঁর উপরে মার-পিটের কাজে সিপাহীদেরকে নিযুক্ত রাখতে পারলে পলায়নকারী বিপ্লবীরা নিরাপদে আলিপুরের এলাকা ছেড়ে যেতে পারবেন। বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যসাধনের কাজে বিপ্লবীরা নিজের জীবনের পরোয়া করে না। বন্দুকের কুঁদা, পাকা বাঁশের লাঠি ও বুটজুতার|আঘাতে আঘাতে অমূল্যবাবুর দেহ ওরা থেঁতলে দিতে লাগলো। অমূল্য সেন চেতনা হারালেন তাঁর রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দেহকে৷বিগতপ্রাণ বিবেচনায় ফেলে রেখে ইয়ার্ডে প্রবেশ করলো Alarm squad।

ওদিকে পলায়নকারী চার বিপ্লবী বুঝতে পারলেন মনোনীত অপর দুই জনের পলায়ন প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। এঁরা চারজন পূর্ব-পরিকল্পনা৷ অনুযায়ী, যেন তাঁরা সদ্য শবদাহ করে ফিরছেন এই ভাবে আলাপ করতে করতে এগিয়ে গেলেন ট্যাক্সীর কাছে।

পূর্ণানন্দবাবু, সীতানাথ ব্রহ্মচারী ও নিরঞ্জন ঘোষাল ট্যাক্সিতে উঠেছেন—এমন সময় হরিপদ দে বললেন নিকটে তাঁর ভগ্নিপতির বাড়ী আছে, তিনি সেখানে কাপড় বদল করে বিকালে গোপন শেলটারে বন্ধুদের সাথে মিলিত হবেন। ট্যাক্সী চললো হাওড়া—সেখানে গোপন শেলটারে ওঁদের সাময়িক আশ্রয়ের বন্দোবস্ত পূর্ব থেকেই করা ছিল।

হরিপদ দে সহযাত্রীদের সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁর আত্মীয়ের বাড়ী যাওয়ার পথে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বালিগঞ্জ ষ্টেশনের প্লাটফর্মে অর্দ্ধচেতন অবস্থায় পড়েছিলেন। সেইদিনই বিকালে এক গোয়েন্দা অফিসার তাঁকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে। পূর্ণানন্দবাবু টিটাগড়ে এক বস্তীর মধ্যে ঘর ভাড়া করে শ্যামবিনোদ পাল ও অনুশীলনের নেতৃস্থানীয় কর্মী কুমিল্লার অমূল্য মুখার্জির ভগ্নী কুমারী পারুল মুখার্জির সাথে সেখানে অবস্থান করে দলের কার্য্য পরিচালনা করতে থাকেন। ১৯৩৫ সালের ২১শে জানুয়ারী পুলিশ ঐ বস্তীর ঘর থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করে। এই গ্রেপ্তারের বিস্তারিত বিবরণ "টিটাগড় ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা" প্রসঙ্গে বিবৃত হবে। নিরঞ্জন ঘোষাল ১৯৩৫ এর ২৫শে এপ্রিল টিটাগড় ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার সংশ্রবে পুনরায় গ্রেপ্তার হন। সীতানাথ দে ব্রহ্মচারী আত্মগোপন করে উত্তর ভারতে এবং দক্ষিণ ভারতে পার্টি সংগঠন সুদৃঢ় করবার কাজে রত থাকেন এবং মোকর্দ্দমা শেষ হওয়ার পূর্বে পুলিশ তাঁকে ধরতে পারে না। সেই জন্য তাঁর অনুপস্থিতিতেও তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করা এবং ঐরূপ সাক্ষ্যপ্রমানের ভিত্তিতে তাঁর অনুপস্থিতিতেই তাঁর প্রতি দণ্ডাদেশ প্রদান করা যাবে—এই মর্মে প্রচলিত আইন সংশোধন করে (বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনের সংশোধন করে) একটি নূতন আইন বিধিবদ্ধ করা হয়।

এই মোকর্দ্দমায় অবিভক্ত ভারতের নানা প্রদেশ থেকে সংগৃহীত প্রায় ৫০০ সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হয় সরকারপক্ষে। প্রায়

2000 দলিল একজিবিট স্বরূপে মোকর্দ্দমার নথিভুক্ত করা হয়। বিচার সুরু হয় ৭ই আগষ্ট ১৯৩৩ তারিখে। দিনের পর দিন শুনানী চলে ১৯৩৪ এর ২রা অক্টোবর পর্যন্ত। ১৯৩৫ এর দোসরা মে তারিখে রায় ঘোষিত হয়। রায় প্রস্তুত করতে বিচারকদের সময় লাগে সাত মাস। রায়টি বৃহদায়তন। টাইপ করা কাগজের ৭০০ পৃষ্ঠা। আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

বিচারকগণ ৩১ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে তাঁদের উপরে বিভিন্ন মেয়াদের দণ্ডাদেশ প্রদান করেন। রাজসাক্ষী জিতেন নাহা ও ঋষিকেশ দাশগুপ্ত বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারস্বরূপ আদালতের ক্ষমা লাভ করে। লক্ষীনারায়ণ শর্মা, সঞ্জীব মুখার্জি, কালীমোহন দে ও ভোলানাথ দাশ—এই চারজন নির্দোষ সাব্যস্তে মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে ভোলানাথ দাশ আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে বন্দীদের পলায়নের ব্যাপারে লিপ্ত থাকার অভিযোগে দণ্ডিত হয়ে পূর্ব থেকেই কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন। সেই জন্য তিনি জেলের বাইরে যেতে পারলেন না। তাঁর উক্তরূপ দণ্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তাঁকে জেলগেট থেকেই পুনরায় গ্রেপ্তার করে B. C. L. Act অনুযায়ী বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। ভূপেন মজুমদার মোকর্দ্দমার বিচার চলতে থাকাকালে পলাতক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

যে ৩১ জনকে ট্রাইব্যুনাল দোষী সাব্যস্ত করেন তাঁদের মধ্যে ছয়জনের ভাগ্যে ঘটে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড। এই ছয়জন হলেন—প্রভাত চক্রবর্তী, জিতেন গুপ্ত, নরেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, সীতানাথ দে ব্রহ্মচারী ও ধীরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মোকর্দ্দমার শুনানীকালের প্রায় আগাগোড়াই সীতানাথ দে আদালতে অনুপস্থিত ছিলেন। কারণ ঐ সময়টায় তিনি পলাতক অবস্থায় উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের অনুশীলন সংগঠনগুলিকে

শক্তিশালী করে তুলবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলেন। তার অনুপস্থিতি-তেই তাঁর প্রতি দণ্ডাদেশ ঘোষিত হয়।

পরেশ গুহ, কিশোরী দাশগুপ্ত ও মনীন্দ্র চৌধুরী এই তিনজন দশ বৎসরের দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। আপীলে হাইকোর্টে এই তিনজনের দণ্ডহ্রাস করে সাত বৎসরের দীপান্তর দণ্ড বহাল রাখেন। যতীন্দ্র চক্রবর্তী, দ্বিজেন তলাপাত্র, অবনী ভট্টাচার্য্য, প্রভাত মিত্র, সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার, হরিপদ দে, নিরঞ্জন ঘোষাল, অমূল্য সেন ও অমূল্য পাল—এই ৯ জনের হয় সাত বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড।

ছয় বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন—হেম ভট্টাচার্য্য, বিমল ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্র ধরচৌধুরী ও জ্যোতিষ মজুমদার। এঁদের সম্পর্কে ট্রাইব্যুনাল মন্তব্য করেন—'এদের ক্ষেত্রে দশ বছর কারাদণ্ডই আমাদের মতে যোগ্য শাস্তি। কিন্তু অস্ত্র আইনের অভিযোগে এরা গত চার বছর দণ্ডভোগ করছে বলে এদের লঘুতর দণ্ড দেওয়া হল।' সুধীর ভট্টাচার্য্য পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। সন্তোষ চক্রবর্তী, শ্যামবিহারী লাল শুক্ল, ইন্দুভূষণ মজুমদার, প্রবোধ ঘোষ, অজিত বসু ও সুশীল কুমার চক্রবর্তী—এই ছয় জনের প্রত্যেককে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অবনী সরকার অন্য একটি মোকর্দ্দমায় দণ্ডিত হয়ে প্রায় তিনবছর কারাদণ্ড ভোগ করেছেন, এই বিবেচনায় তাঁর প্রতি এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। জ্যোতির্ময়কুল ঘোষ বিচারাধীন অবস্থায় কারারুদ্ধ থাকাকালে তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। এজন্য তাঁকে একবছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে রাঁচীর উন্মাদ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বিচারকগণ তাঁদের রায়ে মন্তব্য করেন—

"Murder of an individual is heineous and terrible enough. But treason is murder of the

State, and of all crimes the most universally disastrous and one which must be stamped out with all the force that the State commands".

বিচারপতিগণের মন্তব্য থেকে স্বাধীনতার সৈনিকদের প্রতি তৎকালীন ইংরেজভক্ত সরকারী কর্মচারীগণের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। যারা সাতসমুদ্র পার থেকে এসে একটা স্বাধীন দেশকে দখল করে তারা "রাষ্ট্রের হত্যাকারী" নয়—যারা আপন দেশকে পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করে—বিচারকগণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী তারাই "রাষ্ট্রের হত্যাকারী"। ট্রাইব্যুনালের বিচারকগণ মোকর্দ্দমার আসামীগণের প্রতি পৈশাচিক দণ্ড দানের সমর্থন করতে আরও মন্তব্য করেন যে—

"With open rebellion the State can deal openly with those forces which exists for its preservation, but the idea of future rebellion is something entirely different. It works below the surface, it is disseminated by insidious means. Those who are its devotees are enemies of the State, they are outcasts of the community. They not only flout the law, they deny its authority, and get when caught they claim its protection, and to such protection, they, as citizens, are entitled, But once a competent court finds them guilty of an offence of conspiracy to wage war against the King, or in other words, to wreck the State which is by law established, they would be deserving utmost punishment".

অনুশীলন সমিতির সাথে "হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাব্লিকান আর্মি"র সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ট্রাইব্যুনাল মন্তব্য করেন—

"The eventual aims of both parties are the same ; so may be their immediate aims, and they may well work together for the same immediate ends. It has been stated that they were one and the same party, the name 'Anushilan' being used in Bengal and H. S. R. A in the Punjab. This is not outside the boards of possibility."

এই মোকর্দ্দমার মধ্য দিয়েই অনুশীলনের সর্বভারতীয় ব্যাপকতার সাক্ষ্যপ্রমাণ সরকারপক্ষের গোচরে আসে। অবশ্য, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বারাণসী ষড়যন্ত্র সামলাতেও বিচারপতি মন্তব্য করেছিলেন যে বাঙলার অনুশীলন দল এবং বিহার, পাঞ্জাব ও সংযুক্ত প্রদেশের বিপ্লবীদলসমূহ একই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত।

টিটাগড় ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা—১৯৩৫

কলকাতার উপকণ্ঠে ছোট শিল্পনগরী টিটাগড়। এখানকার নানা কলকারখানার মধ্যে টিটাগড় পেপার মিলস সমধিক পরিচিত। ঘটনাচক্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের সাথে এই ক্ষুদ্র সহরের নাম যুক্ত হয়ে গিয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে টিটাগড় ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমাটিকে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার পরিপূরক (Supplementary) মোকর্দ্দমা হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। উভয় মোকর্দ্দমারই লক্ষ্য এক এবং দুটি মোকর্দ্দমাই অনুশীলন সমিতির কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে রচনা করা হয়।

আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমায় সারা ভারতব্যাপী জাল বিস্তার করে অসংখ্য গ্রেপ্তার ও তল্লাসীর পরে প্রায় ৫০০ বিপ্লবীকে বিনা বিচারে আটক করে ও ৪০জনকে বিচারার্থ চালান দিয়ে শাসকগণ আত্মসন্তুষ্টির উত্তাপসেবনে রত হয়ে 'সোয়াস্তি'র আমেজে নিশ্চিন্ত দিনযাপন করছিলেন। ভেবেছিলেন এতদিনে সত্য সত্যই বিপ্লবের কালসাপকে তাঁরা নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের নিদ্রালস নিশ্চিন্ততার আমেজ দীর্ঘস্থায়ী হল না। বিপ্লবীরা "রক্ত-বীজের ঝাড়"। খাতাপত্রে এবং গুপ্তচর মারফতে যত জনের নাম জানা যায়, তাদেরকে ঝাড়ে বংশে বেড়াজালে আটকানোর পরেও অকস্মাৎ দেখা যায় মৃত্তিকার গর্ভ থেকে বাচ্চা কেউটেরা মাটি ফুঁড়ে মাথা তুলছে। অকস্মাৎ অজ্ঞাত অখ্যাত যুবক—যে কখনও সন্দেহের আওতায় আসেনি—সে নেতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রকার পরিস্থিতির মধ্য থেকেই দানা বেঁধে ওঠে আর একটি বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা, যা ভারতের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে "টিটাগড় ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা" নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

কর্তৃপক্ষ বিপ্লবনিধনপর্ব সমাধা করেছেন মনে করে আত্ম-তুষ্টিতে নিমগ্ন। কিন্তু তার পরেও এখানে ওখানে কয়েকটি ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গেল—যেগুলির কার্য্যক্রম বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টতঃ বোঝা যায় যে সেগুলি বৈপ্লবিক ডাকাতি। যে ২/১ জন জাল ছিঁড়ে বাইরে গিয়ে আত্মগোপন করেছে তাদেরকে ধরবার কোন সূত্রই পুলিশের হাতে আসছে না। ১৯৩৩ এর আগষ্ট মাসে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার শুনানী শুরু হয়, এর আড়াই মাস পরে দিনাজপুর জেলার হিলী রেলষ্টেসনে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়। এই ডাকাতি সম্পর্কে কয়েকজন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবক ধরা পড়েন—অনুসন্ধানে জানা যায় তাঁরা অনুশীলন সমিতির

লোক। এই চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক ডাকাতির বিস্তারিত বিবরণ অন্যত্র প্রদত্ত হয়েছে *। বিনয়-বাদল দীনেশ কর্তৃক রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণের কালে নিহত বঙ্গদেশের কারাসমূহের মহাধ্যক্ষ (I. G. of Prisons) সিমসন সাহেবের ভ্রাতা রাজসাহী জেলার তদানীন্তন জেলা ও দায়রা জজ ই. জে. সিমসন সাহেবের নেতৃত্বে গঠিত এক স্পেসাল ট্রাইবুনালে উক্ত ডাকাতি সম্পর্কে ধৃত ব্যক্তি-গণের বিচার হয়। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সভ্য ছিলেন অবসর প্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ বিপিন মুখার্জি এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এমদাদ আলি। ঐ মোকর্দ্দমায় বিচারকগণ প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, সত্যব্রত চক্রবর্তী, ঋষিকেশ ভট্টাচার্য্য ও সরোজ বসু—এই চারজনের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। প্রফুল্ল নারায়ণ সান্যাল, কিরণচন্দ্র দে ও ডাঃ আব্দুল কাদের চৌধুরীর প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয় এবং হরিপদ বসু, কালিপদ সরকার ও রামকৃষ্ণ সরকার দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। একটি সাপ্লিমেণ্টারী মোকর্দ্দমায় বিজয় ব্যানার্জী ওরফে বিজয় চক্রবর্তীরও দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। আপীলে মহামান্য হাইকোর্ট প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত চারজনের প্রাণদণ্ড মকুব করে তাদেরকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করেন। প্রফুল্ল সান্যাল ও হরিপদ বসুর কারাদণ্ড হ্রাস করে তাঁদেরকে যথাক্রমে দশ বছর ও সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদত্ত হয়। কাদের চৌধুরী, রামকৃষ্ণ ও কিরণ দে—এঁদেরও দণ্ড হ্রাস করে প্রত্যেককে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। হাইকোর্ট কালিপদ সরকারের মুক্তির আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু মুক্তির সাথে সাথেই তাঁকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে আটক করা হয়।

---

* **Freedom Struggle and Anusihilan Samiti, Vol II, Appendix II** দ্রষ্টব্য।

হিলি ডাকাতির ফলে সরকার যে কতটা বেসামাল হয়েছিলেন তার প্রমাণ মিলবে হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ থেকে বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করবার সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে। আসামীদের দণ্ডহ্রাসের বিরুদ্ধে সরকারপক্ষ প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করেছিলেন। কিন্তু প্রিভি কাউন্সিল সে আপীল সরাসরি অগ্রাহ্য করেন।

বিনাবিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দী ধনেশ ভট্টাচার্য্য কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ হয়েছেন এই অভিযোগে তাঁকে বাঁকুড়ার সরকারী কুষ্ঠ চিকিৎসালয়ে আটক রাখা হয়েছিল। এই অসহনীয় দুর্দ্দশা থেকে অব্যাহতিদানের উদ্দেশ্যে অনুশীলন বিপ্লবীরা তাঁকে সুকৌশলে কুষ্ঠচিকিৎসালয় থেকে মুক্ত করে আনেন ও গোপন শেলটারে লুকিয়ে রাখেন। আন্তঃপ্রদেশিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার শুনানী চলতে থাকার সময়ে এই ঘটনা ঘটে।

১৯৩৪ এর ৮ই মার্চ বরিশাল সহরে অনুশীলন-সভ্য শান্তি মিত্রের গৃহতল্লাসী করে পুলিশ তৎকালে আত্মগোপনকারী বিপ্লবী প্রফুল্ল সেনের হস্তাক্ষরযুক্ত একখানি সন্দেহজনক পত্র উদ্ধার করেন। প্রফুল্ল সেন ১৯৩০ সাল থেকেই আত্মগোপন করে দলীয় সংগঠন সুদৃঢ়করণের কার্য্যে রত ছিলেন। তৎকালীন আইন অনুযায়ী তাঁকে পলাতক ঘোষণা করে এবং পুলিশের কাছে আত্ম-সমর্পণপূর্বক তাঁর সম্পর্কিত আটক আদেশ (detention order) গ্রহণ করবার আহ্বান জানিয়ে কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল। তৎসত্ত্বেও তিনি পাঁচ বৎসরকাল আত্মগোপন করে বিভিন্ন জেলায় পরিভ্রমণ করে পার্টি সংগঠন দৃঢ়ীকরণের কাজ করে যাচ্ছিলেন।

১৯৩৪ এর ১২ই নভেম্বর ফরিদপুর জেলার ভিজামাণিক গ্রামের বালকসংঘ নামক প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী জীবন কৃষ্ণ

ধূপীকে গ্রেপ্তার এবং তাঁর গৃহতল্লাসী করে পুলিশ "লক্ষ্য ও আদর্শ" নামক একখানি বৈপ্লবিক পুস্তক উদ্ধার করে। এই ঘটনার কিয়ৎ-কাল পরে রাজসাহী জেলার পুঠিয়া নিবাসী দেবেন্দ্র করগুপ্তের গৃহ-তল্লাসী করে পুলিশ "বিপ্লব-শিক্ষা" নামক একখানি পুস্তিকা উদ্ধার করে এবং তারপরেই পুঠিয়ার রাজকাছারী তল্লাসী হয় এবং সেখানে কিঞ্চিদধিক তিন হাজার কপি "বিপ্লব-শিক্ষা" পাওয়া যায়। এর পরেই ১৯শে ডিসেম্বর কলিকাতার উপকণ্ঠবর্তী বেলঘরিয়ার একটি বাড়ীতে পুলিশ হানা দেয়। ঐ সময়ে ঐ বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন—শ্রীহট্ট নিবাসী প্রতিরঞ্জন দাস পুরকায়স্থ। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। প্রকৃতপক্ষে ঐ সময়ে ঐ বাড়ী অনুশীলন সমিতির গোপন শেলটার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। ঐ বাড়ীতে একখানি ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে বাস করছিলেন প্রীতিরঞ্জন, দেবপ্রসাদ সেন ও শান্তিরঞ্জন সেন। প্রীতিরঞ্জনের গ্রেপ্তারের সংবাদ না জানা থাকায় দেবপ্রসাদ সেন অসন্দিগ্ধ অবস্থায় ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন। প্রবেশ পথেই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

এরপরের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল প্রফুল্ল সেনের গ্রেপ্তার। ঐ সময়ে প্রফুল্ল সেন (নিবাস কুমিল্লা) আত্মগোপন করে বেলঘরিয়ায় বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মোসউটিক্যাল ওয়ার্কস-এর কর্মচারীদের একটি মেসে অবস্থান করছিলেন। তাঁর গ্রেপ্তার খুবই চাঞ্চল্যকর ঘটনা। ১৯৩৩ এর ১৬ই জানুয়ারী পূর্বোক্ত মেস থেকে বেরিয়ে তিনি টিটাগড় সহরের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রফুল্লবাবু বেঁটে মানুষ হলেও ঐ সময়ে তাঁর চেহারা ছিল পালোয়ানী ধরনের। তার উপর কয়েকদিন স্নান না করায় তাঁর মাথার চুল ছিল অবিন্যস্ত। স্থানীয় গ্রামরক্ষী বাহিনীর ক্যাপ্টেন সুরেন ঘোষ হুইসেল বাজিয়ে লোক জড়ো করে প্রফুল্লবাবুকে ঘিরে ফেলেন। প্রফুল্লবাবু প্রচণ্ডভাবে লড়াই করেন। কিন্তু শুধু হাতে

বহুলোকের সাথে লড়াই করে জয় অর্জন সম্ভব নয়। অতএব গ্রামরক্ষী বাহিনী তাঁকে ধরে টিটাগড় থানায় সমর্পণ করে। থানার পুলিশ প্রফুল্লবাবুর বৈপ্লবিক পরিচয় অবগত ছিলেন না। কিন্তু ঐ সময়ে সমস্ত থানার উপরে সরকারী নির্দ্দেশ ছিল যে অপরিচিত সন্দেহজনক ব্যক্তি ধরা পড়লেই গোয়েন্দা বিভাগের গোচরে আনতে হবে। থানা থেকে খবর পেয়ে লর্ড সিংহ রোড থেকে আই. বি পুলিশ আসে। প্রফুল্লবাবু পলাতক থাকায় তাঁর ফটোগ্রাফ পুলিশ গেজেটে ছাপা হয়েছিল। সেই ফটোগ্রাফের সাথে মিলিয়ে আই. বি পুলিশ প্রফুল্লবাবুকে পলাতক বিপ্লবী প্রফুল্ল সেন বলে সনাক্ত করে।

এরপর এই পর্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে ১৯৩৫ এর ২০শে জানুয়ারী। ১৯৩৪ এর ৩১শে জুলাই পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত সহ অপর তিনজন বন্দী আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের উঁচু প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে জেল থেকে পলায়ন করেন—এ কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। পলায়নের পর পূর্ণানন্দবাবু টিটাগড়ের এক বস্তির মধ্যে ঘর ভাড়া করে সেখানে লুক্কায়িত থেকে দলীয় সংগঠন চালাতে থাকেন। তাঁর সাথে সহকারী হিসাবে থাকেন শ্যামবিনোদ পাল চৌধুরী। তাছাড়া ঐ গোপন আবাসকে একটা গৃহস্থবাড়ীর রূপ দিয়ে ক্যামোফ্লেজ সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে এঁদের সাথে বাস করতে থাকেন অনুশীলনের বিশিষ্ট নেতা কুমিল্লার অমূল্য মুখার্জির ভগ্নী কুমারী পারুল মুখার্জী। পারুল মুখার্জী সে সময়ে সুন্দরী যুবতী। পূর্ণানন্দবাবু বস্তির বাসা থেকে বাইরে যেতে হলে মুসলমানের ছদ্মবেশে যাতায়াত করতেন। সুতরাং কিছু লোকের সন্দেহ হয়—সম্ভবতঃ কোন মুসলমান কোন হিন্দু মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে এসে ওখানে রেখেছে। তারা টিটাগড় থানায় তাদের সন্দেহের বিষয় জানায়। থানা থেকে খবর যায়

গোয়েন্দা বিভাগে। গোয়েন্দাপুলিশ কয়েকদিন ধরে গোপনে ও বস্তির উপরে নজর রেখে জানতে পারে যে পলাতক বিপ্লবী দুর্ধর্ষ পূর্ণানন্দ দাশগুপ্তই বস্তির ঐ ভাড়াটিয়া ঘরে লুকিয়ে রয়েছেন।

সুতরাং ১৯৩৫ এর ২০শে জানুয়ারী কয়েকজন গোয়েন্দা অফিসারের নেতৃত্বে এক বিশাল পুলিশ বাহিনী পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে পূর্ণানন্দবাবুর আবাসস্থল ঘিরে ফেলে। পুলিশের বিবরণ অনুসারে—বাড়ী ঘেরাও হতে দেখে পূর্ণানন্দবাবু এবং তাঁর সহকারী শ্যামবিনোদ—এঁরা দুজনে বস্তি বাড়ীর ছাতে ওঠেন এবং শ্যামবিনোদ পালকে কোন একটা জিনিষ ছুঁড়ে ফেলে দিতে দেখা যায়। পুলিশ পার্শ্ববর্তী একটি বাড়ীর উঠান থেকে একটি কার্তুজ-ভরা পিস্তল উদ্ধার করে। ইতোমধ্যে কুমারী পারুল মুখার্জী একটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে আপত্তিকর কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলতে থাকেন। পুলিশের মতে—"অনেক প্রকার ভীতিপ্রদর্শন ও মিষ্ট বাক্যবর্ষনের পর পারুল ঘরের দরজা অর্গলমুক্ত করেন"। পুলিশ ঘরে প্রবেশ করে দেখতে পায় কতকগুলি কাগজপত্র তখনও পুড়ছে। পুলিশ ঘরের মধ্যে থেকে কিছু অর্দ্ধদগ্ধ কাগজ উদ্ধার করে এবং সেখানে আরও পায় কিছু রাসায়নিক পদার্থ যা সাধারণতঃ শক্তিশালী বোমা প্রস্তুতের জন্য এবং 'ধূম্রযবনিকা' (Smoke screen) সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয় এবং কিছু ছদ্মবেশধারণের উপকরণ, কতকগুলি বোমার নক্সা এবং বোমা প্রস্তুতের ফর্মুলা, বোমা প্রস্তুত ও বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার সম্পর্কিত কয়েকখানি পুস্তক এবং কিছু অর্দ্ধদগ্ধ কাগজ ও কিয়ৎপরিমাণ ছেঁড়া কাগজের টুকরো।

ঐ আধপোড়া এবং টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলা কাগজগুলিতে সাঙ্কেতিক লিপিতে লিখিত বহু নামঠিকানার সূত্র পাওয়া যায়।

পুলিশের মতে, ধূম্র যবনিকা সৃষ্টির ফর্মুলা সংগ্রহ করা হয়েছিল বিভিন্ন কারাগার থেকে বিপ্লবী বন্দীগণকে মুক্ত করে বাইরে নিয়ে যাওয়ার কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে পুলিশ মনে করে যে পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত কারাগারে আটক থাকাকালে প্রফুল্ল সেনের উপরেই সংগঠনের নেতৃত্ব অর্পিত ছিল। সীতানাথ দে ব্রহ্মচারী প্রভৃতির সাথে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে পলায়নের পর বাইরে এসে পূর্ণানন্দ বাবু পুনরায় নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

পূর্বোক্ত ঘটনাসমূহকে একত্র করে পুলিশ আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার মত আর একটি ব্যাপক ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার কাঠামো প্রস্তুত করে। আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার মতই এই নূতন ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার প্রস্তুতিপর্বে ভারতবর্ষের নানা স্থান থেকে বহু সংখ্যক আসামী ধরা হয়। তারমধ্যে বেশীর ভাগ লোককে কিছুদিন হাজতে আটক রেখে শেষ পর্য্যন্ত ছেড়ে দেওয়া হয় এবং পরমুহূর্তেই পুনরায় গ্রেপ্তার করে তাদেরকে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। টিটাগড়েই এই ষড়যন্ত্রের প্রধান কার্য্যালয় ছিল —এই বিবেচনায় এই মোকর্দ্দমার নাম দেওয়া হয়—"টিটাগড় ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা"।

সর্বসমেত ৩১ জন আসামীকে বিচারার্থ চালান দেওয়া হয়। তাঁদের নাম—

১। পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত ২। প্রফুল্লচন্দ্র সেন, ৩। কুমারী পারুল মুখার্জী, ৪। শ্যামবিনোদ পাল চৌধুরী, ৫। ধনেশ ভট্টাচার্য্য, ৬। দেবপ্রসাদ ব্যানার্জি, ৭। দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, ৮। শান্তিরঞ্জন সেন, ৯। মহেশ্বর দে, ১০। সন্তোষকুমার সেন, ১১। বিভূতি ভট্টাচার্য্য, ১২। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৩। বিজয় কৃষ্ণ পালচৌধুরী, ১৪। মাখন কর, ১৫। জগদীশ ঘটক, ১৬। অজিতলাল মজুমদার, ১৭। নিরঞ্জন ঘোষাল, ১৮। নীরদ

ব্যানার্জি, ১৯। জীবনকৃষ্ণ ধুপী, ২০। জগদীশ চক্রবর্তী, ২১। সীতানাথ দে ব্রহ্মচারী, ২২। কালিপদ ভট্টাচার্য্য, ২৩। বীরেন্দ্র নাথ বসু, ২৪। ধীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি, ২৫। প্রীতিরঞ্জন দাস পুরকায়স্থ, ২৬। দেবব্রত রায়, ২৭। হরেন্দ্র নাথ মুন্সী ২৮। জুড়ান গাঙ্গুলী, ২৯। সুধাংশু বিমল দত্ত, ৩০। কার্তিক সেনাপতি, ৩১। ধীরেন্দ্রনাথ ধর।

এঁদের মধ্যে সীতানাথ দে ব্রহ্মচারী মোকর্দ্দমার প্রথম থেকেই পলাতক ছিলেন। পলাতক অবস্থায় তিনি মাদ্রাজে উতকামুণ্ড ব্যাঙ্ক ডাকাতি সংগঠিত করেন।

ধৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে ১৫ জন ছিলেন ফরিদপুর জেলার অধিবাসী, ৫ জন ঢাকা জেলার, বরিশাল জেলার ৪ জন, শ্রীহট্টের ২ জন এবং ত্রিপুরা, যশোহর, চট্টগ্রাম ও হাওড়া জেলার এক জন করে। ধীরেন্দ্রনাথ ধর ছিলেন কলিকাতার অধিবাসী। পরবর্তী জীবনে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ও বধান সভার সভ্য হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন।

মোকর্দ্দমার উদ্‌বোধনকালে সরকারী উকীল বলেন যে আসামীগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নাম ধারণ করতেন। তিনি বলেন ষড়যন্ত্রের মূল হোতা পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত দলীয় মহলে 'বড়দাদা' নামে অভিহিত হতেন। প্রফুল্ল সেনের দলীয় নাম ছিল—'রাঙ্গাদা'। কুমারী পারুল মুখার্জি গ্রেপ্তার হওয়ার সময়ে তাঁর নাম বলেছিলেন —'সুরমা দেবী'। জুড়ান গাঙ্গুলীর দলীয় নাম ছিল "গুরুদেব" এবং ধনেশ ভট্টাচার্য্যের পরিচিতি ছিল—"দীন ভিখারী" নামে। সরকারী উকীল আরও বলেন, আসামীরা সকলেই 'অনুশীলন সমিতি' নামক বৈপ্লবিক সংগঠনের সভ্য। তারা কলিকাতায় এবং জেলায় জেলায় বহু সংখ্যক গোপন "শেলটার" সৃষ্টি করে সেই সব শেলটারে আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের আশ্রয় দান করত, বক্তৃতা দান ও পুস্তক, ইস্তাহার প্রভৃতি বিলি করার মাধ্যমে ভাবপ্রবণ

যুবকদের মন ধীরে ধীরে বিষাক্ত করে তুলতো এবং আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতিকূলতায় তাদেরকে দীক্ষিত করত। তারপর রাজনৈতিক হত্যাকারীদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে 'দেশ-মাতৃকার চরণে আত্মবলিদানের মাধ্যমে শহীদ' হওয়ার জন্য তাদের মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করত।

টিটাগড় মোকর্দ্দমার সময়ে গোয়েন্দাবিভাগ রাজনৈতিক আসামীদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করবার এক নূতন কৌশল আবিষ্কার করে। ইতঃপূর্বে কীড স্ট্রীটে কিংবা লর্ড সিংহ রোডে এই উদ্দেশ্যে যে কৌশল প্রযুক্ত হত সেটা আবহমান-কাল-প্রচলিত বর্বর পৈশাচিকতার কৌশল। একজন আসামীর নিকট থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তার শরীরের উপরে দিনের পর দিন বীভৎস নিষ্ঠুরতা চালানো হত। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অবর্ণনীয় বর্বরতা সত্বেও পুলিশের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হত। অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশী কঠোরতা বিপ্লবীমানসকেও কঠোরতর করে তুলত এবং বর্বরতার ফলে বিপ্লবীদের মনোবল দৃঢ়তর হত। সব দেশেই গোয়েন্দা দপ্তরের একটি করে গবেষণা শাখা থাকে। এই শাখা গোয়েন্দাগিরির কর্মকৌশলকে উন্নত করার জন্য এবং গোয়েন্দা কর্মচারীদের দক্ষতার মানবৃদ্ধির জন্য নিরন্তর নূতন নূতন পন্থা উদ্ভাবন করে চলে। বাংলার গোয়েন্দারা তাই শারীরিক ও মান-সিক যন্ত্রনাপ্রদানের পাশাপাশি এক সুকৌশলী 'নরম-পন্থার পরীক্ষা নিরীক্ষা' চালাতে লাগলেন। এর কৌশল হল, প্রথমতঃ স্বীকা-রোক্তি পাওয়া যেতে পারে এরূপ বন্দী বাছাই করা। যে ব্যক্তি সংগঠনের অন্তর্গোষ্ঠীর (inner circle এর) বিশেষ কিছু জানে না, তার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। দ্বিতীয়তঃ 'নরমপন্থা'র প্রাথমিক কাজ হবে বাছাই করা 'শিকার' (target) এর মনের উপরে সুকৌশলে ক্রমাগত মানসিক চাপ সৃষ্টি করে যাওয়া। তারজন্য টার্গেটকে তার সহবন্দীদের

থেকে বিচ্ছিন্ন করে এমন কোন জায়গায় তাকে আটক রাখতে হবে, যেখানে নিঃসঙ্গতা ব্যাপারটিই তার পক্ষে দুর্বহ হয়। সে সারা-দিনের মধ্যে কথা বলবার মত কোন লোক পাবে না। যার সাথে ভাল মন্দ যা হোক, দু'চারটি কথা বলা যায় এমন যে কোন একজন মানুষের সঙ্গলাভের ক্ষুধায় তার মন ছটফট্ করতে থাকবে। দিনের শেষে উপযুক্ত ট্রেনিং প্রাপ্ত সুদক্ষ গোয়েন্দা অফি-সার যাবেন আলাপন বা interrogation এর জন্য। প্রথমতঃ বন্দীর পরমহিতৈষীর ভূমিকায় নিজেকে স্থাপিত করে, তার ঘর বাড়ী আত্মীয়স্বজনের কুশল কামনা করে আলাপ সুরু করবেন। তারপর ধীরে ধীরে যে মোকদ্দমায় বন্দীকে ধরা হয়েছে সেই মোকর্দ্দমা সম্পর্কে সুকৌশলী ভাষণ রচনা—যেমন করে তাঁতী টানা ও পোড়েনে নানা রংএর সুতা ব্যবহার করে তার পরিকল্পনা-মাফিক চিত্র-বিচিত্র নক্সা ফুটিয়ে তুলে চিত্রাঙ্কিত বস্ত্রখণ্ড প্রস্তুত করে-সেইভাবে গোয়েন্দা অফিসার ভয়, লোভ, হিতকামনা ও সহান-ভূতির টানাপোড়েনে বাগবিস্তার করতে থাকবেন। কখনও বিপ্লবী-দের ত্যাগ ও চরিত্রের প্রশংসা, কখনও কোন শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী সম্পর্কে গোপন খবর প্রকাশের ছলে তাঁর কোন কল্পিত অধঃপতনের মিথ্যা সংবাদের সুকৌশলী পরিবেশন, কখনও বা মোকদ্দমার শেষ পরি-ণাম সম্পর্কে ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা, কখনও বা সরকারের সাথে সহযোগিতা করলে সরকারের সহায়তায় বিদেশে শিক্ষালাভ করে সুখী ও সম্মানাস্পদ জীবনের ফাপানো ছবি তুলে ধরা—এই ভাবে কৌশলী কথার মালা গাঁথা চলবে তিন-চার ঘণ্টা ধরে এবং যতদিন না উক্ত বন্দী মনের দিক দিয়ে একেবারে ভেঙ্গে না পড়ছে অথবা ঐ বিপ্লবীর ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত না হচ্ছে, ততদিন প্রত্যহ তিন চার ঘণ্টা ধরে এই মগজ ধোলাইয়ের প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। শুধু ঐ তিন-চার ঘণ্টা ছাড়া অন্য কোন সময়ে ঐ বন্দী দিনের মধ্যে আর কোন সময় আর কোন ব্যক্তির সাথে কথাবার্তা

বলবার সুযোগ পাবে না। আত্মীয় স্বজনের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পাবে না। অবশ্য, তাকে খাওয়া দাওয়া ভাল দেওয়া হবে। এইভাবে টার্গেটের মনের উপরে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত মাত্রায় চাপ বা tension সৃষ্টি হতে হতে এমন মুহূর্ত উপস্থিত হবে যখন টার্গেট যদি অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি না হয়, তা হলে সে ভেঙে পড়বে। একবার ভেঙে পড়লেই সুদক্ষ গোয়েন্দা অফিসার ভয় আর লোভের সাঁড়াশী দিয়ে টার্গেটের গলা এমনভাবে চেপে ধরবেন যে তার আর এদিক ওদিক নড়বার সাধ্য থাকবে না। পরাজয়বোধজনিত অবসাদের চাপে তার দেহ মন অবশ হয়ে যাবে—এই অবস্থায় প্রশ্নের পর প্রশ্নের শরবর্ষণ করে করে গোয়েন্দা অফিসার ঐ ব্যক্তির মনের মধ্যে যা কিছু লুকানো ছিল সব টেনে বার করবেন। এর পর আর তাকে সহবন্দীদের মধ্যে ফিরে যেতে দেওয়া হবে না। সে চিহ্নিত হয়ে যাবে একবারী আসামী বা Confessing accused বলে। তারপর চলতে থাকবে সত্য মিথ্যা মিশিয়ে সাক্ষ্য রচনা ও সাক্ষ্যদানের ট্রেনিং। তারপর আদালতে তাকে দেখা যাবে রাজসাক্ষী বা approver রূপে। টিটাগড় ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমায় ধৃত আসামীদের মধ্যে হরেন্দ্র মুন্সী ছিল বিজ্ঞানের ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। প্রথমে গোয়েন্দারা টার্গেট হিসাবে হরেন্দ্রকে নির্বাচন করে। তাকে সহবন্দীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আসে ডায়মণ্ডহারবার সাবজেলে। সাধারণতঃ ছোটোখাটো সাবজেলে দুটি মাত্র ওয়ার্ড থাকে—একটি Male ward ও একটি Female ward। Male ward-এ সাধারণ আসামীদের সাথে রাজনৈতিক আসামীকে রাখা চলে না। সুতরাং হরেন্দ্র একাকী স্থান পেলো Female ward-এ। মফঃস্বলের সাবজেলগুলিতে Female ward সাধারণতঃ খালি থাকে, কারণ মফঃস্বলে নারী আসামী কদাচিৎ জেলে আসে। হরেন্দ্র খুব দৃঢ়চেতা ছিল। কিঞ্চিদধিক একমাসের চেষ্টাতেও তার মনোবল খর্ব করতে অসমর্থ হয়ে গোয়েন্দারা তাকে আলিপুর

সেণ্ট্রাল জেলে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয় ও তার অল্প পরেই নিয়ে যায় সন্তোষ সেনকে। সন্তোষ বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের রসায়ন বিভাগে পাঠরত ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র ছিল। সন্তোষকেও ডায়মণ্ড-হারবার সাবজেলে একই ভাবে আটক রেখে মাসাধিক কাল যাবৎ তার উপরে পূর্বোক্তরূপ প্রক্রিয়া প্রযুক্ত হতে থাকে।

প্রথম দিকে বিপ্লবীসুলভ মনোবলের পরিচয় দেওয়া সত্বেও শেষ পর্য্যন্ত সন্তোষ প্রতিরোধের শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং স্নায়ুযুদ্ধে পরাজিত হয়। ফলে সে শত্রুশিবিরে স্থান গ্রহণ করে এবং রাজ-সাক্ষী হয়। বিজয় পালচৌধুরী, রবি ঘোষ এবং জগদীশ ঘটক, এই তিনজনের উপরেও পূর্বোক্ত প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে পুলিশ তাদের থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করতে সমর্থ হয়। কিন্তু রবি ঘোষ ও জগদীশ ঘটক পরে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে এবং তাদের বিচার হয়। সন্তোষ সেন ও বিজয় পালচৌধুরী রাজসাক্ষী হয়ে আদালতে সাক্ষ্য দেয়।

১৯৩৫ এর ১৬ই নভেম্বর সিনিয়র আই. সি. এস মিঃ এইচ. জি. এস. বিভারের নেতৃত্বে গঠিত এক স্পেসাল ট্রাইব্যুনালের সমক্ষে টিটাগড় মোকর্দ্দমার বিচার সুরু হয়। ট্রাইব্যুনালের অপর দুইজন সদস্য ছিলেন—আই. সি. এস মিঃ কে. সি. দাশগুপ্ত এবং রায় বাহা-দুর এন. কে. বসু। সুদীর্ঘ দেড় বছর যাবৎ দিনের পর দিন বিচার চলতে থাকে। ১৯৩৭ এর ২৭ এপ্রিল বিচারকগণ মোকর্দ্দমার রায় ঘোষণা করেন। মোকর্দ্দমায় ৫০৪ জন সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং কিঞ্চিদধিক ২০০০ দলিল এক্‌জিবিট হিসাবে প্রমাণে ব্যবহৃত হয়।

বিচারকগণ পূর্ণানন্দ দাশগুপ্তকে এই ষড়যন্ত্রের প্রাণপুরুষ (mastermind of the conspiracy) বলে বর্ণনা করেন। আরও বলা হয় যে এই ষড়যন্ত্রে পূর্ণানন্দের পরেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল প্রফুল্ল সেনের। উক্তরূপ মন্তব্য করে ট্রাইব্যুনালের বিচাপতিগণ

পূর্ণানন্দবাবুকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে এবং প্রফুল্লবাবুকে ১২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ইতঃপূর্বেই আন্তঃ-প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমায় পূর্ণনন্দবাবুর প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হয়েছিল। তা ছাড়া আলিপুর জেল থেকে পালানোর অপরাধে পৃথক মোকর্দ্দমায় তাঁর প্রতি তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছিল। আদেশ হয় যে একটি দণ্ডের ভোগ শেষ হয়ে যাওয়ার পর অপর দণ্ডের ভোগ সুরু হবে।

অপর যাঁরা দোষী সাব্যস্ত হয়ে কমবেশী দণ্ড লাভ করেন, তাঁদের মধ্যে শ্যামবিনোদ পাল চৌধুরীর প্রতি দশ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। দেবপ্রসাদ সেন ও নিরঞ্জন ঘোষালের প্রতি যথাক্রমে আট বৎসর ও সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। নিরঞ্জনবাবুও ইতঃপূর্বে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমায় সাত বৎসর ও জেল থেকে পালানোর জন্য পৃথক মোকর্দ্দমায় তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। শান্তিরঞ্জন সেন, জগদীশ চক্রবর্তী ও জীবন ধূপী—এঁরা প্রত্যেকে পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। দেবপ্রসাদ ব্যানার্জি ও জগদীশ ঘটক—এঁদের দুজনের ভাগ্যে ঘটে চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। কুমারী পারুল মুখার্জী, প্রীতিরঞ্জন দাস পুরকায়স্থ, বিভূতি ভট্টাচার্য্য, কার্তিক সেনাপতি ও হরেন্দ্র মুন্সী—এঁদের প্রত্যেককে তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সুধাংশু বিমল দত্ত নাবালক ছিলেন বলে তাকে এক বৎসরের কারাদণ্ড দান করে বোর্ষ্টাল জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

যে ১২ জনের প্রতি নির্দোষ সাব্যস্তে খালাসের হুকুম হয়, তাঁরা হলেন—ধনেশ ভট্টাচার্য্য, সীতানাথ দে ব্রহ্মচারী, অজিত মজুমদার, যজ্ঞেশ্বর দে, জীবন দে, জুড়ান গাঙ্গুলী, রবি ঘোষ,

দেবব্রত রায়, মাখন কর, কালিপদ ভট্টাচার্য্য, ধীরেন বসু ও ধীরেন্দ্র নাথ ধর।

১৯৩৫ সালের পর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে নূতন যুগের অভ্যুদয় ঘটে। ১৯৩৬এ সারা ভারতে যে কয়টি বৈপ্লবিক হিংসাত্মক কর্ম অনুষ্ঠিত হয়েছে তার সংখ্যা নগণ্য। বিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অস্থির ও বিস্ফোরণমুখী হয়ে উঠতে সুরু করে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে মহান নভেম্বর বিপ্লবের সাফল্যের মধ্য দিয়ে রুশ দেশে পুঁজিবাদী সমাজের উচ্ছেদ ও সমাজবাদী রাষ্ট্রের অভ্যুদয় বিশ্বরাজনীতির অঙ্গনে শক্তি-সমাবেশের রূপ পরিবর্তন ঘটাতে থাকে। একদিকে অক্টোবর বিপ্লব থেকে প্রেরণা লাভ করে পৃথিবীর দিকে দিকে শোষিত মানুষ উৎসাহিত হয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে থাকে, অন্যদিকে সঙ্কটমগ্ন পুঁজিবাদী দুনিয়া আত্মরক্ষার আপ্রাণ প্রচেষ্টায় পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভারসাম্য রক্ষার কোন পথ খুঁজে না পেয়ে দিশেহারা হয়ে একে অপরের দেহের রক্ষণাবেক্ষণের দ্বারা নিজ দেহের শোণিতের ঘাটতি পূরণের পথ বেছে নেয় এবং পারস্পরিক আঘাত প্রতিঘাতে মত্ত হয়। আর, পুঁজিবাদী দুনিয়ার এই বিপর্য্যস্ত অবস্থার গর্ভজাত ফ্যাসিবাদ নামক উদ্ধত দানবের আসুরিক চীৎকার ও শস্ত্রাস্ফালন একসাথে পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী শিবিরে আতঙ্ক বিস্তার করতে থাকে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির আসর স্পষ্টতঃ পুঁজিবাদী, সমাজবাদী ও ফ্যাসিবাদী—এই তিন শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষেও নূতন চিন্তা বিস্তার লাভ করতে থাকে। অনুশীলন সমিতি বিশের দশকের প্রথম ভাগ থেকেই সমাজবাদ সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৯২২ সালে অনুশীলনের

একক্কালীন সভ্য অবনী মুখার্জি* সোভিয়েট রাশিয়া থেকে ভারতে আসেন তাঁর প্রাক্তন সহকর্মীগণকে কম্যুনিজমে অনুরাগী করে তুলবার উদ্দেশ্য নিয়ে। ফাঁসীর দণ্ডাদেশ মাথায় নিয়ে তিনি ১৯১৫ সালে সিঙ্গাপুর দুর্গে আবদ্ধ থাকবার সময়ে অদ্ভুত কৌশলে সেখান থেকে পলায়ন করেছিলেন। এই জন্য ভারতে এসে তাঁকে আত্মগোপন করে অবস্থান করতে হয়। অনুশীলন সমিতি তাঁকে ঢাকা সহরে গোপন শেলটারে লুকিয়ে রাখেন। অনুশীলন বিপ্লবী-গণ তাঁর প্রস্তাবের উত্তরে তাঁকে জানান কম্যুনিজম ও সোভিয়েট রাষ্ট্র সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞান অর্জন না করে কম্যুনিজমের পথ গ্রহণ করা বা না করা সম্পর্কে তাঁরা কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। দেড় বছর ভারতে থেকে কমরেড মুখার্জি রাশিয়ায় ফিরে যান। তারপর গোপন পথে প্রচুর পরিমাণে কম্যুনিষ্ট সাহিত্য অনুশীলনপন্থীদের হস্তগত হতে থাকে। দীর্ঘদিন ধরে অনেক পড়াশোনা অনেক তর্কবিতর্ক (inner party deliberation) ইত্যাদির মাধ্যাম বৈপ্লবিক সমাজবাদের দিকে অনুশীলন সভ্যদের মানসিক প্রবণতা অগ্রসর হতে থাকে।* * ১৯৩৫ সালে কারাগারের অন্তরালে আবদ্ধ থাকা অবস্থায় অনুশীলনের নেতা ও সক্রিয় সভ্যগণ বৈপ্লবিক সংগ্রামের পুরাতন পথ পরিত্যাগ করে

---

* অবনী মুখার্জি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে সিঙ্গাপুর কোর্টে আবদ্ধ থাকার সময়ে পলায়ন করে সমুদ্র সাঁতরিয়ে একখানা জেলেডিঙ্গির সাহায্যে মালয়ে যান। সেখান থেকে বহু ক্লেশ স্বীকার করে শেষে রাশিয়ায় পৌঁছান ও সেখানে গিয়ে কম্যুনিজমে দীক্ষিত হন। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ Freedom Struggle and Anushilan Samiti পুস্তকের ৩১২—৩১৩ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে।

* * ডক্টর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য প্রণীত Origins of the R. S. P নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

বৈপ্লবিক সমাজবাদকে দলীয় আদর্শ বলে গ্রহণ করেন এবং তাঁদের কর্মপথও নূতন ভাবে রূপায়িত হয়। শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য ব্যাপক গণসংগ্রামের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের উচ্ছেদ—এই আদর্শ তাঁরা গ্রহণ করেন। বৈপ্লবিক সংগ্রামের পুরাতন কর্মপন্থা পরিত্যক্ত হয়। চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব থেকেই সমাজবাদী আদর্শের প্রতি অনুশীলনপন্থীরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সেই কারণেই উত্তর ভারতীয় সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে H. R. A. (Hindusthan Republican Association) এর স্থলে H. S. R. A. (Hindusthan Socialist Republican Army) এই নাম গ্রহণ করা হয় ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে। ১৯২৪ সালে কানপুরে H. R. A-র সম্মেলনে সংস্থার যে গঠনবিধি অনুমোদিত হয় তার মধ্যেই—"Eradication of all exploitation of man by man"— সংস্থার লক্ষ্য বলে ঘোষিত হয়।

অনুশীলন নূতন আদর্শ ও কর্মপন্থা গ্রহণ করার ফলে অনুশীলনপন্থীরা নিজেরাই পুরাতন ধারার হিংসাত্মক বৈপ্লবিক কাজকর্ম বন্ধ করে দেন। বঙ্গদেশের যুগান্তর দলও ১৯৩৮ সালে বিবৃতি দিয়ে পুরাতন পন্থার বৈপ্লবিক কর্মধারা পরিত্যাগ করে কংগ্রেসের মাধ্যমে জনগণের সংগ্রামে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করাই স্থির করেন। ১৯৩৮'এর পূর্বে সক্রিয় বিপ্লবীরা প্রায় কেহই বাইরে ছিলেন না। ১৯৩৫ সালই পুরাতন ধারার বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের শেষ বৎসর। টিটাগড় ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা উক্ত ধারার সাথে যুক্ত সর্বশেষ ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা।

অ্যাণ্ডারসনী তাণ্ডব বিপ্লব (অর্থাৎ সরকারের ভাষায় Terrorism) বন্ধ করতে পারে নাই। মত ও পথের নবরূপায়ণের ফলে বিপ্লবীরাই সন্ত্রাসবাদী কার্য্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু পুরাতন কর্মপন্থা যতদিন প্রচলিত ছিল অর্থাৎ ১৯০২ থেকে

১৯৩৫ সাল এই তেত্রিশ বৎসর ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অত্যন্ত সমুজ্জ্বল স্বাক্ষরযুক্ত ঐতিহাসিক কাল। এই তেত্রিশ বছর ভারতের ইতিহাসে কত ত্যাগ, কত বীরত্ব, কত দুঃসাহসিকতা, কত মনুষ্যত্ব, কত আত্মবলিদান, কত দেশপ্রেম ও কত কর্মদক্ষতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে তা চিন্তা করতে গেলে সীমাহীন বিস্ময় ও গৌরববোধে চিত্ত ভরপুর হয়ে ওঠে। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে 'জাতীয় ইতিহাসে বিপ্লবীদের অবদান কি?' তাহলে নির্দ্বিধায় বলা যায় জাতীয় ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায় বিপ্লবীরা রচনা করে গিয়েছেন—যে অধ্যায় সম্বরণের মত তপস্যা ও দধীচির মত আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে ভরপুর।

বিহার প্রদেশের বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা-১৯৩০-৩৫

স্বতন্ত্র বিহার প্রদেশের বয়স বেশী নয়। ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের বৈপ্লবিক ধারা যতদিন সক্রিয় ছিল, ততদিন 'বিহার' নামে কোন স্বতন্ত্র প্রদেশ ছিল না। ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত 'বিহার ও উড়িষ্যা' একত্রে একটি প্রদেশ বলে গণ্য হত। বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশটিও গঠিত হয় ১৯১২ সালে ১২ই ডিসেম্বর বঙ্গবিভাগ রদ হওয়ার সাথে সাথে। তার পূর্বে ১৯০৫ থেকে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা একটি প্রদেশ বলে গণ্য হত। ১৯৩৬ সালে 'বিহার' এবং 'উড়িষ্যা' দুটি পৃথক প্রদেশে পরিণত হয়। 'বিহার প্রদেশের ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা' বলে যে মোকর্দ্দমাগুলিকে উল্লেখ করতে যাচ্ছি যেগুলি প্রকৃতপক্ষে ঘটেছিল 'বিহার ও উড়িষ্যা' প্রদেশে। কিন্তু ঐ প্রদেশের উড়িষ্যা অংশে বিশেষ কোন বৈপ্লবিক কার্য্য ঘটে নাই। শুধু ১৯১৫ সালে বালেশ্বরে বৈপ্লবিক তৎপরতা দৃষ্ট হয়েছিল। সেই কারণে আমরা 'বিহার ও উড়িষ্যা' না বলে শুধু 'বিহার' প্রদেশের উল্লেখ করছি।

অনুশীলন সমিতির উদ্যোগে বৈপ্লবিক সংগ্রাম সুরু হওয়ার সময় থেকেই বিহারের সাথে বৈপ্লবিক কর্মধারার একটা যোগসূত্র গড়ে ওঠে। বারীনবাবুরা বোমা প্রস্তুত করবার পর সেটা পরীক্ষা করেন দেওঘর পাহাড়ে গিয়ে। এই পরীক্ষা কার্যে রংপুরের প্রফুল্ল চক্রবর্তী জীবন হারায়। বিপ্লবীদের হাতের যে প্রথম আঘাত শাসকবর্গকে এবং সারা দেশকে সচকিত করেছিল সেই "মজঃফরপুর মার্ডার" অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিহারের এলাকায়। সেসন জজ কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে ক্ষুদিরাম ভুল করে শ্রীমতী কেনেডি ও তাঁর কন্যা মিস কেনেডিকে হত্যা করে। ক্ষুদি-রামের বিচার ও ফাঁসী হয় মজঃফরপুরে। ক্ষুদিরামের ফাঁসী বৈপ্লবিক ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই ঘটনা থেকেই দুঃসাহসিক পথে বিপ্লবীদের যাত্রা সুরু হয়। এটা থেকেই দেশের মানুষ নূতন পথের বার্তা শ্রবণ করে। এই ঘটনাকে দেশের ঘুমন্ত মানুষের নিদ্রাভঙ্গের ঘটনা বলে আখ্যাত করা যায়।

বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে অনুশীলন সমিতি বিহারে সংগঠন গড়ে তুলবার জন্য উদ্যোগ সুরু করেন। রেবতী নাগ, জিতেশ লাহিড়ী, নলিনী বাগচি, দীনেশ বিশ্বাস প্রভৃতিকে বিহারে প্রেরণ করা হয়। ঐ সময়ে তাঁরা মজঃফরপুর, ভাগলপুর, পাটনা ও আরও কিছু কিছু অঞ্চলে অনুশীলনের শাখা সংগঠন গড়ে তোলেন। স্থানীয় লোকদের মধ্যে যাঁরা বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে অনুশীলনের সাথে যুক্ত হন, তাঁদের মধ্যে অর্জুনলাল শেঠী, রাম-বিনোদ সিং, ধ্বজাপ্রসাদ, আনন্দমোহন সহায়, বেতিয়ার ফনী ঘোষ ও পাটনার বঙ্কিম মিত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ঐ সময়ে যাঁরা নিয়মিত আর্থিক সাহায্য দান করে এবং আরও নানাভাবে সাহায্য করতেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—মজঃফরপুরের উকীল কালিদাস বসু (যিনি ক্ষুদিরামের মোকর্দ্দমায় প্রধান ডিফেন্স-প্লীডার ছিলেন), অধ্যাপক জে. বি. কৃপালনী (যিনি পরবর্তীকালে আচার্য্য

কৃপালনী নামে বিখ্যাত হয়েছেন), অধ্যাপক মালকানি প্রভৃতি।

বঙ্কিম মিত্র বারানসী ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমায় দণ্ডিত হয়েছিলেন।

বিহার প্রদেশে অনুশীলনের তৎপরতা জোরদার হয়ে ওঠে বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে—H. R. A. স্থাপিত হওয়ার পরবর্তী কালে। ঐ সময়ের দেওঘর ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার কথা আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৫—এই সময়ের মধ্যে বিহার প্রদেশে বেশ কয়েকটি বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা রুজু হয়। এর সবগুলিই অনুশীলন সমিতির উত্তর ভারতীয় সংগঠন H. S. R. A র কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত। আমারা এক এক করে এই ষড়যন্ত্র মোকদ্দমাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করছি।

ত্রিহুত ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা—১৯৩০

১৯২৮ সালে বিহারের সংগঠনে মজঃফরপুর জেলার জালালপুর নিবাসী যোগেন্দ্র সুকুল একজন সক্রিয় সভ্যরূপে যোগদান করেন। যোগেন্দ্র পূর্ব থেকেই পাঞ্জাব ও সংযুক্ত প্রদেশে H.R.A র কর্মীরূপে কাজ করে খ্যাতি অর্জন করেন। যোগেন্দ্র, বেতিয়ার ফনী ঘোষ ও সারণ জেলার মালকাচক নিবাসী রামবিনোদ সিং বিহার সংগঠনের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হন। রামবিনোদ ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। মুক্তির পর মালকাচকে 'গান্ধী কুটির' নামে একটি আশ্রম স্থাপন করে সেখানে বাস করতে থাকেন। ঐ সময়ে মনোমোহন ব্যানার্জি নামে এক ব্যক্তি বিহারে H. S. R. A. সংগঠনে যোগদান করে। ১৯২৯ সালে বেতিয়া জেলার মৌলানিয়ায় একটি রাজনৈতিক ডাকাতি হয়। পরে ভগৎ সিং প্রভৃতির সাথে দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমায় ধরা পড়ে মনোমোহন ব্যানার্জি স্বীকারোক্তি করে ও তার স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায় যে মৌলানিয়া ডাকাতির সংগঠক

ছিলেন যোগেন্দ্র সুকুল। ১৯৩০ এর ২৯শে মে দ্বারভাঙ্গা জেলার ঝাঝ্রায় একটি মোটর ডাকাতিতে ৬৫০০ টাকা লুণ্ঠিত হয়। এর দুই দিন পরে চাম্পারণ জেলার ধেলুয়াহাতে আর একটি মোটর ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। এখানে লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৪০০০ টাকা। পুলিশ ১১ই জুন মালকাচকের 'গান্ধী কুটীর' তল্লাসী করে। ঐ সময় যোগেন্দ্র সুকুল সেখানে ছিলেন। পুলিশের সাথে বীরত্বপূর্ণ লড়াই করে যোগেন্দ্র শেষ পর্য্যন্ত পরাজিত হন ও পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তার হাতে তখন কার্তুজভর্তি রিভলভার ছিল। দশ দিন পরে রামবিনোদের বাড়ী তল্লাসী করে পুলিশ সেখান থেকেও একটি রিভলভার উদ্ধার করে। এই সব ঘটনা একত্রিত করে পুলিশ ত্রিহুত ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা খাড়া করে। বিচারে যোগেন্দ্র সুকুলের দশ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। একটি পৃথক মোকর্দ্দমায় মৌলানিয়া ডাকাতির জন্য তাঁর আরও দশ বছর কারাদণ্ড হয়। যোগেন্দ্রকে আশ্রয় দানের অভিযোগে রামবিনোদ সিং দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। যোগেন্দ্র আন্দামান সেলুলার জেল থেকে ১৯৩৮-এ মুক্তি লাভ করেন এবং ১৯৪০-এ বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল (R. S. P) যেদিন গঠিত হয় সেই দিনই R. S. P তে যোগদান করেন। স্বাধীনতার পরে রামবিনোদ সিং বিহার বিধান সভার সভ্য হয়েছিলেন।

ছাপরা ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা—১৯৩১

যোগেন্দ্র সুকুল, রামবিনোদ সিং ও রামদেনী সিং* ১৯৩০ এর আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে, সেই সংস্রবে দণ্ডিত হয়ে কারাগারে অবস্থানের সময়ে রামভবন সিং ও রামানুজম সিং নামক দুইজন সহবন্দীকে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। মুক্তির পরে তারা

* হাজিপুর ষ্টেশন ডাকাতির মোকর্দ্দমায় ১৯৩২ সালে রামদেনী সিং এর ফাঁসী হয়। ঐ ডাকাতি হয়েছিল ১৯৩১ এর ১৫ই জুন।

উভয়ে H. S. R. A তে যোগদান করে। ১৯৩১ এর এপ্রিল মাসে তারা পুলিশ ও মদ্যব্যবসায়ীদের প্রতি ভীতিপ্রদর্শনমূলক কিছু ইস্তাহার H. S R. A. র নাম দিয়ে প্রকাশ করে এবং বিভিন্ন এলাকায় সেই ইস্তাহার ছড়ানো হয়। ভগৎ সিং প্রভৃতির মোকর্দ্দমায় আসামীপক্ষ সমর্থনের ব্যয়নির্বাহের জন্য রামভবন সিং এর নেতৃত্বাধীন এই নূতন ইউনিট ছাপরা জেলার ফুলওয়ারিয়া নামক স্থানে একটি ডাকাতির পরিকল্পনা করে। জনশ্রুতি ছিল যে ঐ মঠের মোহান্তের জিম্মায় দুইখানা স্বর্ণময় ইষ্টক (অর্থাৎ দুইখানা ইষ্টকের তুল্য ওজনের সোনা) জমানো আছে। পর পর তিনবার তাদের উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। ১৯৩১ এর ২২শে আগষ্ট তাদের চতুর্থ বারের উদ্যম কার্য্যকর হয়। ঐদিন তারা ছয়-সাত জন সহকর্মী-সহ ফুলওয়ারিয়ার মঠে হানা দিলে মঠের অধিবাসীরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাধা দেয়। দলের মধ্যে একজন বোমা ছুঁড়লে বাধাদান-কারীদের মধ্যে একজনের উরু জখম হয়, পরিণামে তার সেই পা-খানি কেটে ফেলতে হয়। আর একটি বোমা রামভবন সিং-এর হাতেই ফেটে যায় এবং রামভবনের একখানি হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আক্রমণকারীরা অতঃপর আত্মরক্ষার জন্য স্থানত্যাগ করে অর্থাৎ উক্ত মঠে ডাকাতি করবার চতুর্থ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। কিন্তু ছিন্ন হাতের সূত্র ধরে পুলিশ রামভবন ও তার সহকারীগণকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়। এই সব ঘটনা একত্রিত করে পুলিশ ছাপরা ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা খাড়া করে। রামভবনের সাড়ে দশ বছরের কারাদণ্ড হয় এবং অপর ছয়জন বিভিন্ন মেয়াদের দণ্ডে দণ্ডিত হয়।

পাটনা ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা

পাটনা সহরের অধিবাসী হাজারীলাল নামক এক ব্যক্তি ১৯২৫-২৬ সালে কলিকাতায় অবস্থান কালে অনুশীলন সমিতির

সাথে যুক্ত হয়। ১৯২৮ সালে সে পাটনায় ফিরে আসে এবং H. S. R. A. র বিহার শাখার কর্মী হয়। ক্রমে সে দলের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। ঐ সময়ে সমগ্র H. S. R. A. র কর্তৃত্ব ন্যস্ত ছিল আত্মগোপনকারী চন্দ্রশেখর আজাদের উপরে। হাজারীলালের সাথে চন্দ্রশেখরের যোগাযোগ স্থাপিত হয়—পরে চন্দ্রশেখরের বিশ্বস্ত সহকারী হিসাবে দিল্লী, আগ্রা, কাশী, লক্ষ্ণৌ-আম্বালা প্রভৃতি এলাকার H. S. R. A. ইউনিটগুলির সাথে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এলাহাবাদের আলফ্রেড পার্কে ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৩১ পুলিশের সাথে বীরত্বপূর্ণ সম্মুখযুদ্ধে চন্দ্রশেখর নিহত হন। সেদিনও হাজারীলাল চন্দ্রশেখরের সাথে ঐ পার্কে উপস্থিত ছিল।[৫৮] ১৯৩১ এর ২২শে জুন লক্ষ্ণৌ সহরে এক বস্ত্র ব্যবসায়ীর উপর আক্রমণের এক ঘটনায় হাজারীলাল এবং তার সাথে সুরথনাথ নামে অপর একজন বিপ্লবী গ্রেপ্তার হয়। ঐ ঘটনার উপরে যে মোকর্দ্দমা স্থাপিত হয়েছিল, সেই মোকদ্দমায় হাজারীলালের প্রতি চৌদ্দ বৎসরের ও সুরথনাথের প্রতি দশ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। এই দণ্ডভোগকালে হাজারীলালের চরিত্রভ্রংশ ঘটে এবং সে এক দীর্ঘ স্বীকারোক্তির মাধ্যমে H, S, R. A. র অনেক গোপন খবর পুলিশকে জানিয়ে দেয়। ইতঃপূর্বে রামললিত নামে পাটনা সহরের একজন ছাত্র সন্দেহজনক ভাবে নিহত হয়েছিল। হাজারীলাল তার স্বীকারোক্তিতে জানায় যে রামললিত পুলিশের গুপ্তচর—এইরূপ সন্দেহ জম্মানোর ফলে সে নিজে এবং সুরথনাথ চৌবে ও কানাই মিশির রামললিতকে হত্যা করে।

রামললিতের হত্যার ঘটনার সাথে তার পূর্ববর্তী আট মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত চারটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা এবং ১৯৩০ এর ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত "মহারাজগঞ্জ সশস্ত্র ডাকাতির

ঘটনা জুড়ে দিয়ে পুলিশ পাটনা ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা রচনা করে। ঐ মোকর্দ্দমায় হাজারীলাল রাজসাক্ষী হিসাবে সাক্ষ্য দেয় এবং দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার রাজসাক্ষী কুখ্যাত ফণী ঘোষও* সরকার পক্ষের সাক্ষী হিসাবে সাক্ষ্য দেয়। এই মোকর্দ্দমায় দায়রা আদালতে সুরজনাথ চৌবের প্রতি ফাঁসীর আদেশ হয়। আপীলে পাটনা হাইকোর্ট ফাঁসীর বদলে তাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করেন। সুতরাং সুরজনাথের পূর্বের মোকর্দ্দমায় দশ বছর কারাদণ্ড ও পরবর্তী ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার অপর আসামী কানাই মিশিরের প্রতিও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড প্রযুক্ত হয় এবং অপর দুইজন আসামীর প্রতি প্রদত্ত হয় সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

গয়া ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা

গয়া ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার পটভূমি সম্পর্কে সরকারী বিবরণীতে বলা হয়েছে—"A more disturbing feature was the use of the Province as a sanctuary by the Bengalees anxious to avoid the special measures in force in their own Province. The coalfields at Jharia were a favourite resort for this purpose. At the same time, it was known that Bengalees were in touch with terrorists of Bihar and this received startling confirmation when Pravat Chakrabarty

* ফণী ঘোষের বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তিদানের জন্য H. S.R.A র তরুণকর্মী বৈকুণ্ঠ সুকুল ১৯৩২ এর ৯ই নভেম্বর তাকে হত্যা করে। ১৪ই মে, ১৯৩৪ গয়া জেলে বৈকুণ্ঠ ফাঁসীমঞ্চে আত্মদান করে।

was arrested by the Calcutta Police in 1933. A list of addresses in cypher recovered from him included the names of 18 persons in Bihar the majority of whom were already known though their connection had not been fully realised," ৫৯

আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার নায়ক প্রভাত চক্রবর্তী যে অন্তরীনাবাস থেকে পলায়ন করে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করে H. S R. A. সংগঠনকে শক্তিশালী করবার কাজে রত ছিলেন —সে কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

সরকারী বিবরণীতে বলা হয়েছে যে কয়েকজন ধৃত বিপ্লবীর স্বীকারোক্তি থেকে মাল মসলা সংগ্রহ করে গয়া ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা স্থাপন করা হয়।

১৯২৯ সালে গয়া সহরে "যুবক সঙ" নামে একটি সংস্থা স্থাপিত হয়। এই সংস্থার নেতা ছিলেন —শ্যামাচরণ বার্থোয়ার, শত্রুঘ্ন শরণ সিং ও বিশ্বনাথ প্রসাদ। তখন দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার আসামীদের পক্ষ সমর্থনের জন্য এবং আত্ম-গোপনকারী বিপ্লবী চন্দ্রশেখর প্রভৃতির খরচ চালানোর জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন হচ্ছিল। গয়ার কর্মীরা কয়েকটি ক্ষেত্রে অর্থ লুণ্ঠনের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। ১৯৩০ সালের ১১ই মে ডালটনগঞ্জে পাঁচ ছয় জন বিপ্লবী একজন ডাকবাহকের (mail runner) হেফাজৎ থেকে কিছু নগদ টাকা ও কিছু কারেন্সীনোট ছিনিয়ে নেন। এটা যে বৈপ্লবিক কার্য্য তা কর্তৃপক্ষ প্রথমে বুঝতে পারেন নাই। ১৯৩০ সালের ১লা আগষ্ট ডালটনগঞ্জেই আর একটি ডাক লুঠের ঘটনা ঘটে। কোন একটা স্বীকারোক্তির মধ্যে ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে এই খবর সরকারের গোচরে আসে যে পূর্বোক্ত দুটি ঘটনাই বিপ্লবী-দলের কার্য্য। ১৯৩০ এর ১৬ সেপ্টেম্বর প্রমথনাথ মুখার্জি

ডালটনগঞ্জে জনৈক দারোগার রিভলভার ছিনিয়ে নিয়ে তাঁকে গুলী করবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সেফ্‌টীক্যাচ আলগা করবার কৌশল না জানা থাকায় তাঁর উদ্যম ব্যর্থ হয়। প্রমথনাথ ধৃত হন এবং ঐ ব্যাপারে তিনি তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এর কিছু পরে H. S. R A. নামাঙ্কিত বৈপ্লবিক ইস্তাহার ট্রেনের কামরায় বিলি করা হয়। ১৯৩০ এর ৭ই অক্টোবর প্রচুর পরিমাণ বিস্ফোরক পদার্থ, আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ ইত্যাদি সহ শ্যামাচরণ বারাণসীতে ধরা পড়েন। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত তাঁর বৈপ্লবিক পরিচয় বারাণসীর পুলিশের গোচরে আসে নি। ফলে বারাণসীর আদালত শুধু জরিমানা করে তাঁকে ছেড়ে দেন। ১৯৩২ সালে H. R. A. নামাঙ্কিত বৈপ্লবিক লাল ইস্তাহার গয়া সহরে প্রচারিত হয়। ইতঃমধ্যে পুলিশ অবগত হয় যে গয়ার বিপ্লবীরা কলকাতায় যাতায়াত করছে এবং কলকাতার বিপ্লবীদের সাথে (অর্থাৎ অনুশীলন সমিতির ধৃতাবশিষ্ট কর্মীদের সাথে) ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেছে। ১৯৩৩ এর ১৫ই মার্চ একটি গুলীভর্তি রিভলভারসহ বারাণসীতে গ্রেপ্তার হয় বিশ্বনাথ। তার কাছে বোমা প্রস্তুতের তিন কপি ফর্মুলাও পাওয়া যায়।

এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা একত্রিত করে পুলিশ ১৯৩৩ সালের প্রথমভাগে গয়া ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা খাড়া করে। ১৭ জন আসামীর বিরুদ্ধে ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ষড়যন্ত্রের (conspiracy to wage war against the king) অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২১ ক ধারামতে মোকর্দ্দমা রুজু হয়। সরকারপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণের শেষ পর্য্যায়ে আসামীদের মধ্যে ১৩ জন দরখাস্ত দিয়ে স্বীকার করে যে তারা ১২১ ক ধারার অপরাধ করেছে। শ্যামাচরণ বার্থোয়ার, বিশ্বনাথ প্রসাদ ও ডাঃ কেশোচাঁদ অপরাধ স্বীকার না করায় তাঁদের প্রত্যেককে সাত বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। শত্রুঘ্ন শরণ সিংকে

পূর্ব থেকে সংশোধিত ফৌজদারী আইনে গ্রেপ্তার করে জেলে রাখা হয়েছিল। তাঁর প্রতি পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। অন্যেরা অপরাধ স্বীকার করায় তাদের হয় এক বছর থেকে চার বছরের কারাদণ্ড।

১৯০৭ সাল থেকে সহিংস বিপ্লব প্রয়াসের কর্মধারার সাথে যুক্ত ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমাগুলির ইতিহাস যতটা সংগ্রহ করতে পেরেছি তা যথাসম্ভব সংক্ষেপে পাঠকদের সমক্ষে উপস্থিত করলাম। হয়ত অনুসন্ধান করলে আরও দু'চারটা ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার কথা জানা যাবে। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে এই সব মোকর্দ্দমার বিবরণ সংগ্রহ করা সহজ নয়। পুরাতন সরকারী কাগজপত্র অনেক নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সরকার যে সব ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমাকে গুরুত্বহীন মনে করেছেন সেগুলির বিশেষ কোন বিবরণ সরকারী রিপোর্টে লিপিবদ্ধ হয় নাই। গুরুত্বহীন মোকর্দ্দমাগুলি সম্পর্কে কোন নথিপত্র জাতীয় মহাফেজখানাতেও রক্ষিত হয় নাই। সেইজন্য যাবতীয় বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার বিবরণ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে এমন কথা বলা যায় না।

ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমাগুলি প্রকৃতপক্ষে বৈপ্লবিক সংগ্রামধারার দর্পণ। ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা অনুষ্ঠিত বীরত্বপূর্ণ ও দুঃসাহসিক কার্য্যের মধ্য দিয়ে বিপ্লবীর চরিত্রের, ত্যাগ, বীর্য্য ও সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য। কিন্তু বৈপ্লবিক সংগঠনের চরিত্রকে জানবার পক্ষে এই ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমাগুলি দর্পণের কাজ করে। এগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

যে দু'চারটি বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার বিবরণ অনবধানতা-বশতঃ গ্রন্থ মধ্যে লিপিবদ্ধ হয় নাই, সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই পরিশিষ্টে প্রদত্ত হল।

সাতারা ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা

১৯১০ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশের সাতারা জেলায় একটি বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা হয়। সিডিসন কমিটির মতে সাতারার বৈপ্লবিক সংস্থা বিনায়ক সাভারকারের অভিনব ভারত সমিতির একটি শাখা ছিল। এদের কার্য্যপ্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ সিডিসন কমিটির রিপোর্টে নাই। শুধু বলা হয়েছে—এটা নাসিক ষড়যন্ত্রের মত আর একটি ষড়যন্ত্র। এই মোকর্দ্দমায় মাত্র তিনজন আসামী ছিলেন। প্রধান আসামীর নাম ডাঃ ভি. ভি. অ্যাথ্‌লে। ইনি মহারাষ্ট্রীয়। অ্যাথ্‌লে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে পাঠরত থাকার সময়ে অনুশীলন সমিতির শ্রদ্ধেয় নেতা নলিনী কিশোর গুহের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবের প্রেরণা লাভ করেন। ১৯১০ সালে সাতারায় গিয়ে ক্ষুদ্র একটি বৈপ্লবিক সংস্থা গড়ে তোলেন এবং ঐ ১৯১০ সালেই গ্রেপ্তার হন। বিভিন্ন ধারায় তাঁর ১৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। তাঁর সাথে আর যে দুইজন আসামী হয়েছিলেন তাঁদের একজনের বাড়ী ছিল অযোধ্যা, অপরজনের কোলাপুর। এই দুই জনেরও দীর্ঘ মেয়াদী কারাদণ্ড হয়।

খ

টিনেভেলী ষড়যন্ত্র মোকদ্দ'মা

১৯১১ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের টিনেভেলী জেলার দায়রা আদালতে এই মোকর্দ্দমার বিচার হয়। শ্যামজীকৃষ্ণ বর্মা লণ্ডনে ইণ্ডিয়া হাউস নামে এক আবাসিক হোস্টেল স্থাপন করেন, লণ্ডন প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের স্বল্পমূল্যে আহার ও বাসস্থান সরবরাহের উদ্দেশ্যে। প্রকৃতপক্ষে ইণ্ডিয়া হাউস ভারতের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবী তৈয়ারী করবার কেন্দ্র ছিল। শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মার প্রয়াস ছিল এই যে প্রতিভাবান ভারতবাসীদেরকে এই হোস্টেলে রেখে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত করা—যাতে তারা দেশে ফিরে গিয়ে বিপ্লবী দল সংগঠন করতে পারে। টিনেভেলীর V. V. S. Ayer ও বিনায়ক সাভারকর একই সময়ে ইণ্ডিয়া হাউসে ছিলেন এবং সাভারকরের প্রেরণায় আয়ার বিপ্লবী দলে যোগদান করে। শংকর কৃষ্ণ আয়ার ও নীলকান্ত ব্রহ্মচারী ওরফে নীলকান্ত আয়ার মাদ্রাজে বিপ্লবীদল গড়ে তোলেন। শংকর কৃষ্ণ আয়ারের ভগ্নিপতি বাঞ্চি আয়ারও এই সংগঠনের একজন প্রধান সংগঠক ছিলেন। তাঁরা 'যুগান্তর' পত্রিকার অনুকরণে গোপন পত্রিকা প্রকাশের দ্বারা বিপ্লবের উত্তেজনা সৃষ্টি করতেন। টিনেভেলী ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার প্রধান আসামী ছিলেন নীলকান্ত ব্রহ্মচারী। বাঞ্চি আয়ার, শংকর কৃষ্ণ আয়ার ও V. V. S. Ayer — এই মোকদ্দমায় আসামী ছিলেন। এঁদের পত্রিকা কোথা থেকে ছাপা হত সেটাও গোপন ছিল। পত্রিকায় লেখা থাকত— "ফিরিঙ্গি বিনাশ প্রেসে মুদ্রিত"। চিদম্বরম্ পিল্লাই গ্রেপ্তার হওয়ার পরদিন এঁদের পত্রিকায় যা প্রকাশিত হয়েছিল তার কতকাংশের ইংরাজী অনুবাদ সিডিসন কমিটির রিপোর্টে উদ্ধৃত হয়েছে; যথা—

"Hello Feringhee! cruel tiger! You have devoured two inoffensive Indians without any cause. You

have been transgressing your own laws"—ইত্যাদি। (উল্লেখযোগ্য যে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের "সন্ধ্যা" পত্রিকাতেও ইংরাজগণকে "ফিরিঙ্গি" শব্দের দ্বারা আখ্যাত করা হত। টিনেভেলী ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা সম্পর্কে সিডিসন কমিটির রিপোর্টের ১৫০ প্যারাগ্রাফে লেখা হয়েছে—

Evidence was given in the Tinnevelly conspiracy case that Vanchi (Ayer) had told one of the witnesses that the English rule was ruining the country, that it only could be removed if all white men were killed and suggested that Mr. Ash should be first killed as the head of the Tinnevelly district.

১৯১১ সালের ১৭ই জুন মাদ্রাজের মনীয়াচি জংসন রেল ষ্টেশনে রেলের কামরার মধ্যে বাঞ্চি আয়ার টিনেভেলীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে গুলী করে—২০ মিনিটের মধ্যে অ্যাশ্ মারা যায়। হত্যাকারী বাঞ্চি আয়ারও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যা করেন। পুলিশের বিবরণ অনুসারে শংকর কৃষ্ণ আয়ারও হত্যাকারীর সঙ্গে ছিল। কিন্তু সে পলায়নে সমর্থ হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে টিনেভেলী ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা স্থাপিত হয়। প্রধান আসামী নীলকান্ত আয়ার (ব্রহ্মচারী) আত্মগোপন করে। তাঁর গ্রেপ্তারের জন্য এক হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়। পরে নীলকান্ত স্বয়ং এসে ধরা দেন। নীলকান্ত, শংকর কৃষ্ণ, V. V. S. Ayer (বরগনেরী ভেঙ্কটেশ আয়ার) প্রভৃতি সহ ১৪ জন আসামীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা স্থাপিত হয়। একটি স্পেসাল ট্রাইব্যুনালের সমক্ষে মোকর্দ্দমার বিচার হয়। রায় ঘোষিত হয় ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯১২। ৫ জন খালাস পায়—৯ জনের সাজা হয়। এই নয় জনের মধ্যে পাঁচ জনের সম্পর্কে অন্যতম বিচারপতি শঙ্করণ নায়ার ভিন্ন অভিমত

জ্ঞাপন করেন কিন্তু ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছিল তিনজন শ্বেতাঙ্গ ও দুই-জন ভারতীয় বিচারক নিয়ে। সুতরাং অধিকাংশের মত অনুসারে নয় জনের সাজা হয়। নীলকণ্ঠ আয়ার (ব্রহ্মচারী) সাত বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। শংকরের হয় চার বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। মিঃ অ্যাশের হত্যার ব্যাপারে লিপ্ত থাকার অভিযোগ কারও বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয় না। সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের অভিযোগে আসামীদের সাজা হয়।

ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা

১৯১৪ সালে গোগালপুর ডাকাতি ও মাদারীপুর গ্রুপের দ্বারা অনুষ্ঠিত আরও কিছু কিছু বৈপ্লবিক কার্য্যকে জড়িয়ে ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা স্থাপিত হয়। খ্যাতনামা বিপ্লবী নেতা পূর্ণচন্দ্র দাস, কালিপ্রসাদ ব্যানার্জি ও তাঁদের সহকর্মীগণ এই মোকদ্দমায় আসামী ছিলেন। কিন্তু যেরূপ প্রমাণ উপস্থিত করলে আসামীদের সাজা হতে পারে সেরূপ প্রমাণ সংগ্রহ করতে অসমর্থ হয়ে সরকার শেষ পর্য্যন্ত মোকর্দ্দমাটি প্রত্যাহার করে নেন। প্রায় এক বছর হাজত বাসের পর আসামীগণ মুক্তি লাভ করে। পরে পূর্ণবাবুকে ১৯১৫ সালের ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করে তাঁকে চট্টগ্রামের নিকটবর্তী কক্সবাজারে আটক রাখা হয়। এই মোকদ্দমার অন্যতম আসামী বামণ চন্দ্র চক্রবর্তী মোকর্দ্দমার সম্ভাব্য সাক্ষী-গণের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করেছেন—এই অভিযোগে পৃথক মোকর্দ্দমায় তাঁর দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করলে সে আপীল ডিস্‌মিস্ হয় ও বিচারপতিগণ মন্তব্য করেন যে—"We have been informad by the learned Deputy Legal Remembrancer that the Faridpur conspiracy failed because of reluctance of witnesses to give evidence on behalf of the

prosecution. Mercy cannot be shown to persons who threaten the witnesses who have come forward to state what they knew. Assassinations and murders must be put down with a strong hand" ••

উত্তরবঙ্গ ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা

এই মোকর্দ্দমায় অভিযুক্ত ব্যাক্তিগণ যুগান্তর দলের অন্তর্ভুক্ত নর্থবেঙ্গল গ্রুপের লোক ছিলেন। ঘটনাস্থল বগুড়া (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত)। ১৯৩২ এর ১৫ই আগষ্ট একটি স্কুলের কিছু টাকা ডাকঘরে জমা দিতে যাওয়ার কালে সেই টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এই ক্ষুদ্র ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৪ জন বিপ্লবীকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৯২ ধারা ও অস্ত্র আইনের ১৯ ধারার সাথে দণ্ডবিধির ১২০বি ধারা জুড়ে দিয়ে ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমায় অভিযুক্ত করা হয়। বগুড়ার স্পেসাল ম্যাজিষ্ট্রেট এস. সি উপাধ্যায়ের আদালতে বিচার হয়, ম্যাজিষ্ট্রেট ১৯৩৩ এর ১৪ই সেপ্টেম্বর রায় ঘোষণা করেন। মোকর্দ্দমায় প্রাথমিক শুনানীর সময়ে পবিত্র দে দোষ স্বীকার করায় সে সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। অন্যান্য আসামীদের মধ্যে যামিনী মজুমদার দুই বৎসর, অমূল্য সাহা দেড় বৎসর, যামিনী রায়, পবিত্র রায় ও মাখন দত্ত প্রত্যেকে একবছর, শচী জোয়াদ্দার আট মাস, জ্ঞান সিদ্ধান্ত, ননী বিশ্বাস, রমনী সরকার ও ক্ষিতীশ ঘোষ এরা প্রত্যেকে ছয় মাস এবং চিত্ত সিং তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। শ্রীনাথ পাণ্ডা, কুঞ্জ মোহান্ত ও কুমারী শান্তি রায় এদের তিন জনকে আদালতের কার্য্য শেষ না হওয়া পর্যান্ত (till the rising of the Court) কারাদণ্ড দেওয়া হয়। মাধবেন্দু মোহান্ত নির্দোষ সাব্যস্তে মুক্তি পায়।

মান্দালয় ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা

ব্রহ্মদেশ ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত ছিল ভারতেরই একটি প্রদেশ। সুতরাং বিদেশী শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য বৈপ্লবিক প্রয়াস সেখানেও হয়েছে। বিশেষতঃ ব্রহ্মদেশে বাংলার বিপ্লবীদের তৎপরতাও অনেকদিন ধরে চলেছিল। বাংলা থেকে পলাতক বিপ্লবীরা অনেকেই ব্রহ্মদেশে লুকিয়ে থেকে গোপনে কাজ চালিয়েছেন। ব্রিটিশ সরকার অনেক সময়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত বাংলার বিপ্লবী নেতাদের বারাব মান্দালয়, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানের কারাগারে আটক রেখেছেন। তারফলেও বাংলার বিপ্লবীদের পক্ষে ব্রহ্মদেশে যোগাযোগ স্থাপন করা কতক পরিমাণে সুবিধাজনক হয়েছে।

মান্দালয় ষড়যন্ত্রের সাথে রাসবিহারী ও লালা হরদয়াল প্রভৃতির দ্বারা আয়োজিত ১৯১৫ সালের ভারতব্যাপী সশস্ত্র-অভ্যুত্থান-প্রয়াসের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। সিডিসন কমিটির রিপোর্টে বার্মার বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রকে "imported conspiracy" বলে বর্ণনা করে বলা হয়েছে—"Burma has not been altogether free from criminal conspiracy connected with the Indian revolutionary movement. It has been the scene of determined efforts to stir up mutiny among the military forces, and to overthrow the British Government. Such efforts have originated in America, have been concentrated in Bangkok, and thence, with the assistance of Germans, have been directed from Siamese frontier against Burma" ৩১

লালা হরদয়াল স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে বিলাতে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত থাকবার সময়ে পরাধীনতার বেদনায় অস্থির হয়ে ওঠেন এবং হঠাৎ পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে নিজ বাসভূমি পাঞ্জাবে চলে আসেন। তিনি অচিরেই পাঞ্জাবে একটি বিপ্লবী দল গড়ে তোলেন। তার প্রচেষ্টা শীঘ্রই সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করবার উদ্যোগ চলতে থাকে। লালা লাজপত রায়ের পরামর্শে তিনি ১৯০৮ সালে আমেরিকায় চলে যান। সেখানে গিয়ে 'গদর পার্টি' নামে এক বিপ্লবী দল গঠন করেন এবং 'গদর' নাম দিয়ে 'সন্ধ্যা' ও 'যুগান্তরের' অনুকরনে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। আমেরিকা প্রবাসী ভারতবাসীদেরকে ইংরেজ তাড়ানোর কাজে আগ্রহী করে তুলবার জন্য ঐ পত্রিকায় অগ্নিবর্ষী রচনা প্রকাশিত হত। হরদয়াল সানফ্রান্সিস্কোতে একটি কেন্দ্র স্থাপন করে আমেরিকাপ্রবাসী শিখ ও অন্যান্য ভারতীয়দেরকে সামরিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে তুলতে থাকেন। প্রথম মহাযুদ্ধ সুরু হওয়ার পর তাঁর চেষ্টায় দলে দলে এই সব সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বিপ্লবীরা ভারতে ফিরে আসতে থাকে রাসবিহারীর বসুর নেতৃত্বে সর্বভারতীয় সশস্ত্র বিদ্রোহে যোগদানের উদ্দেশ্যে। এদেরই কতকাংশ একই উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে পড়ে বার্মায় ও তার সীমান্তবর্তী শ্যামদেশে (বর্তমান নাম থাইল্যাণ্ড)। এরা বিটিশবাহিনীভুক্ত ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহের প্রচারণা করতে থাকে। সোহন লাল পাঠক, হাসান খাঁ, নারায়ণ সিং, শিবদয়াল কাপুর, হাসান জাদে ওরফে যোধ সিং প্রভৃতি ঐরূপ কাজে নেতৃত্ব দান করেন। বিদ্রোহের উত্তেজনাপূর্ণ অগ্নিবর্ষী রচনা-সম্বলিত গদর পত্রিকা গোপনে প্রচারিত হতে থাকে ব্রিটিশ বাহিনীভুক্ত ভারতীয় সেনাদলের মধ্যে।

সোহনলাল পাঠক ১৯১৫ সালের আগষ্ট মাসে ব্যাঙ্কক সীমান্ত দিয়ে বর্মায় প্রবেশ করেন। ১৪ই আগষ্ট বার্মা প্রদেশের মেমিওতে নিযুক্ত Mountain Battery র একদল সৈনিকের

সমক্ষে তিনি বিদ্রোহের প্ররোচনামূলক এক বক্তৃতা করেন। ঐ ব্যাটারীর জমাদার কৌশলে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ঐ সময় তাঁর কাছে তিনটি অটোমেটিক পিস্তল, ২৭০টি কার্তুজ ও বেশ কিছু আপত্তিকর কাগজপত্র পাওয়া যায়। তার মধ্যে ছিল হরদয়ালের লিখিত একটি রাজদ্রোহকর রচনা, এক কপি 'গদর' পত্রিকা, বোমা প্রস্তুতের ফর্মুলা ও জাহান-ই-ইস্‌লাম নামক পত্রিকার কয়েকটি কপি (পত্রিকাখানি একটি মুস্লিম বিপ্লবী সংস্থার মুখপত্র ছিল)। ইতঃপূর্বে গদরদলের সেক্রেটারী রামচন্দ্র পেশোয়ারী কর্তৃক সোহন লালকে লেখা এক পত্র সিঙ্গাপুরে অবস্থিত ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের হাতে আসে। এর পাঁচ দিন পরে মেইমোতে নারায়ণ সিং ধরা পড়েন। পুলিশী তদন্তের ফলে আরও অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও কাগজপত্র ধরা পড়ে এবং এই সব ঘটনা একত্রিত করে মান্দালয় ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা খাড়া করা হয় ১৯১৬ সালে। স্পেসাল টাইব্যুনালের বিচারে সোহন লাল এবং নারায়ণ সিং দুইজনেরই প্রাণদণ্ড হয়। অন্যান্য অনেকে কঠোর সাজা প্রাপ্ত হয়।

সোহন লাল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অবিস্মরণীয় সৈনিক। গ্রেপ্তারের সময়ে তিনি ইচ্ছা করলেই গ্রেপ্তারকারী জমাদারকে হত্যা করে নিজে পালিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু "দেশের ভাই" কে হত্যা করে স্বীয় মুক্তি অর্জনে তাঁর প্রবৃত্তি ছিল না। নলিনীকিশোর গুহ লিখেছেন—"সোহন লাল জেলে গিয়া কোন নিয়মই পালন করেন নাই। যে ইংরাজকেই মানি না, তার জেলের নিয়ম মানিব কেন? কর্তৃপক্ষ আসিলে দাঁড়াইতেন না, সেলাম করিতেন না, 'ক্ষমা চাহিলে ফাঁসীর পরিবর্তে মুক্তি পাইবে'—একথা ইংরেজ কর্তৃপক্ষ হইতে পুনঃপুনঃ বলা স্বত্বেও সোহন লাল ক্ষমা চান না। বলেন, 'ক্ষমা ভিক্ষা করা উচিত ইংরাজের। কারণ তাহারাই জুলম করিয়া আমাদের দেশকে অধীনে রাখিয়াছে।" ৬২

লক্ষ্ণৌ বড়বাঁকি ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা / গোরখপুর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা / ও আগ্রা ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা

উপরিলিখিত তিনটি ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমাই "ভারত ছাড়ো আন্দোলনের" সময়ে আর. এস. পি ও কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে সাজানো হয়। প্রথম মোকর্দ্দমায় যোগেশ চ্যাটার্জ্জি ছিলেন প্রধান আসামী। দ্বিতীয় মোকর্দ্দমায় বিখ্যাত সমাজবাদী কংগ্রেস নেতা শিবনলাল সাকসেনা ও তৃতীয় মোকর্দ্দমায় পণ্ডিত শ্রীরাম শর্মা প্রধান আসামী ছিলেন। "ভারত ছাড়ো আন্দোলনে" উত্তর প্রদেশে আর. এস. পি ও সি. এস. পির মুখ্য ভূমিকা ছিল। বালিয়া ও আজমগড় জেলায় জনসাধারণ পুলিশের সাথে লড়াই করে আন্দোলনকে প্রচণ্ডভাবে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এখানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন উত্তর প্রদেশের তৎকালীন আর. এস. পি নেতা ঝাড়খণ্ডে রায়।

অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ ১৯৩৭-৩৮ সালে বন্দী দশা থেকে মুক্তি লাভ করে বাইরে এসে মার্ক্সলেনিনবাদী চিন্তাধারা পুষ্ট মেহেনতী মানুষের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন এবং তৎপরে পুঁজিবাদের উচ্ছেদ সাধনার্থে সমাজবাদী বিপ্লব সংগঠনের উদ্দেশ্যে কাজ করতে থাকেন—একথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। বাইরে আসার পর তাঁরা অনুশীলন-গ্রূপ নামে অভিহিত স্বতন্ত্র সমাজবাদী গোষ্ঠী হিসাবে কাজ করতে থাকেন। কিন্তু "অনুশীলন সমিতি" তখনও নিষিদ্ধ সংস্থা হিসাবে ঘোষিত ছিল। সেইজন্য ভিন্ন নামে একটি সর্বভারতীয় সমাজবাদী দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৯৪০ সালে বিহার প্রদেশের রামগড়ে "আপোষবিরোধী সম্মেলন" উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অনুশীলন-পন্থীরা একত্রিত হন এবং সেখানেই তাঁরা বিপ্লবী

সমাজবাদী দল (R S.P.) নামে নূতন ও স্বতন্ত্র মার্ক্স-লেনিনবাদী দল গঠন করেন।*

পূর্বোক্ত তিনটি ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমার মধ্যে আগ্রা ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় সেসন আদালতে আসামীগণের দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড হয়। কিন্তু আপীলে হাইকোর্ট সকলের দণ্ডাদেশ নাকচ করে দেন। তখন গোরখপুর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমাটি সরকার প্রত্যাহার করে নেন।

লক্ষ্ণৌ বড়বাঁকি মোকদ্দমায় যোগেশবাবু ছাড়া অন্য আসামীদের মধ্যে ছিলেন ঝাড়খণ্ডে রায় ও সি. বি. শুক্ল।

দাতারাম নামক একজন দারোগাকে হত্যার চেষ্টা এবং উত্তরপ্রদেশে ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটনের চেষ্টা করা—এই ছিল ঐ মোকদ্দমায় আসামীগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ। বিচারে যোগেশবাবুসহ সকল আসামীরই সাত বছরের কারাদণ্ড হয়। মোকর্দ্দমার রায়ে যোগেশবাবুকে আর. এস. পি ও H.S R A র নেতা বলে বর্ণনা করা হয়। ঐ সময়ে যোগেশবাবু সর্বভারতীয় R S.P. র সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। উত্তর প্রদেশে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে আর. এস পি-র কর্মী রাজনারায়ণ মিশিরের ফাঁসী হয়, লক্ষ্ণৌ সেণ্ট্রাল জেলে। ফাঁসীর দিন যোগেশবাবুও লক্ষ্ণৌ জেলে বন্দী ছিলেন। লক্ষ্ণৌ বড়বাঁকি ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমায় সাজা হওয়ার কিছুকাল পূর্বে অন্য একটি মোকদ্দমায় এটোয়া জেলের মধ্যে গোপনে বিচার করে যোগেশবাবুকে দশ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। লক্ষ্ণৌ বড়বাঁকি মোকর্দ্দমার রায়ের বলে তার সাথে আরও সাত বছরের কারাদণ্ড যুক্ত হল।

---

* কি পরিপ্রেক্ষিতে অনুশীলন সমিতি কমিণ্টার্ণের সাথে যুক্ত না হয়ে স্বতন্ত্র সমাজবাদী গোষ্ঠী হিসাবে কাজ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তা জানতে হলে আগ্রহী পাঠক ডক্টর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য প্রণীত "Origins of R. S. P. I" পুস্তক পাঠ করতে পারেন।

কৈফিয়ৎ

কানপুর ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা (১৯২৪) ও মীরাট ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমা (১৯২৯)—এ দুটি মোকর্দ্দমার বিবরণ এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ভারতবর্ষকে বিদেশী শাসনমুক্ত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে জাতীয় বিপ্লবীগণ (National revolutionaries) যে সংগ্রাম করেছেন—অর্থাৎ ইংরাজ শাসকেরা যে সংগ্রামকে 'সন্ত্রাসবাদ' বলে চিহ্নিত করেছেন—শুধু তার সাথে সম্পর্কযুক্ত ষড়যন্ত্র মোকর্দ্দমাগুলির বিবরণ এই পুস্তকে সংকলিত হয়েছে। কানপুর ষড়যন্ত্র ও মীরাট ষড়যন্ত্র ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কিন্তু জাতীয় বিপ্লবীগণের সংগ্রামের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। ঐ দুটি মোকদ্দমা—বিশেষ করে মীরাট মোকদ্দমার বিবরণ নানা পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ভারতের সাম্যবাদী আন্দোলন নিয়ে যদি আমার আয়ুষ্কালের মধ্যে কিছু লেখার সুযোগ পাই তখন ঐ দুটি মোকর্দ্দমা অবশ্যই আলোচিত হবে।

চট্টগ্রাম বিদ্রোহীদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্পর্কিত মূল মোকর্দ্দমাতেও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ ছিল। কিন্তু চট্টগ্রামের up rising ও তার আনুসঙ্গিক ঘটনাগুলি একখানি পৃথক পুস্তকে বিধৃত হওয়ার যোগ্য। ঐ বৃহৎ ব্যাপার এই ক্ষুদ্র পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভবপর হল না। ঐ বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী কেহ কেহ ঐ বিদ্রোহের বিবরণ রেখেছেন। আমার লেখার চেয়ে সেগুলি অবশ্যই আরও প্রামাণিক বলে বিবেচিত হবে। কানপুর, মীরাট বা চট্টগ্রাম—এর কোনটিই আমার কাছে উপেক্ষণীয় নয়। কেউ যেন ভুল ধারণা না করেন।

ইতি

তারাপদ লাহিড়ী

সূত্র নির্দেশ

১. J, Campbel Ker : Political Violence in India 1917-1935 page 170

২. Sedition Committee Report, para 96

৩ Ibid, Appendix 1, para 5

৪. James Campbel Ker : Political Trouble in India 1907-1917. See index of names of revolutionaries, given in Chapter XII beginning from page 358

৫. Ibid, page 152

৬. Sedition Committee Report : para 130

৭. James Campbel Ker : Political trouble in India, 1907-1917, page 3:6

৮. ক্ষীরোদ কুমার দত্ত : ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি : ৭৫ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত উদ্ধৃতি

৯ Sedition Committee Report : para 121

১০ নলিনীকিশোর গুহ : বাংলায় বিপ্লববাদ, ৪র্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৩১-১৩৪

১১. Sedition Committee Report, para 121

১২. Ibid, para 138

১৩. James Campbel Ker : Political Trouble in India, 1907-1917, p. 338

১৪. Sedition Committee Report, para 122

১৫. নলিনীকিশোর গুহ : বাংলায় বিপ্লববাদ, ৪র্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৬৭

১৬. মতিলাল রায় : আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী, পৃষ্ঠা ১০৯

১৭. Terrorism in India, 1917-1936. Compiled by the Intelligence Bureau, Home Dept, Govt. of India Pub- Deep Publications, Delhi.

১৮. Forwarding letter by S. A. T. Rowlatt, Sedition Committee Report dated 15.4. 1918. addressed to the chief Secretary, Government of India

১৯. Sedition Committee Report, para 168

২০ Ibid

২১. Ibid, para 169

২২. Ibid, para 167

২৩. Ibid, para 170

২৪. ভবতোষ রায় (ed), পুলিনবিহারী দাসের আত্মজীবনী : পৃষ্ঠা ২৬৫-২৭১

২৫. H. W. Hale : Terrorism in India, 1909-1936. Compiled by Intelligence Bureau, Home Dept, Govt. of India, p. 16-17.

২৬. Overstreet and Windmiller : Communism in India : Perennial Press, Bombay, p. 54

২৭. Keshoram Sabarwal : A Reminiscence : in Rashbehari Basu and his struggle for Indian Independence. Ed-in-C- Radhanath Rath— p. 549

২৮. Overstreet and Windmiller : Communism in India : p. 27

২৯. চিন্মোহন সেহানবীশ : রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী : মনীষা : পৃ: ৩৬৫

৩০. যথাপূর্ব : পৃ: ৩৬৭

৩১. নলিনীকিশোর গুহ : বাংলায় বিপ্লববাদ, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ: ২২১

৩২. James Compbell Ker : Political Trouble in India—1907-1917 : p. 389.

৩৩. Jogesh Chandra Chatterjee : In Search of Freedom : pub- P. C. Chatterjee, 6 Tilak Road, Cal-29 : p. 220

৩৪. Ibid, p. 230

৩৫. Ibid, p. 329-330

৩৬. H. W. Hale : Terrorism in India—1917-1936, p 195

৩৭. Ibid, p. 196

৩৮. Ibid, p. 229

৩৯. Ibid, p. 309

৪০. Ibid, p. 321

৪১. Ibid, p. 397

৪১ক Ibid, p 66

৪১খ Ibid, p. 67

৪২. H. W Hale : Terrorism in India—1917-1936, p 73

৪৩. Ibid, p. 74

৪৪. নলিনী কিশোর গুহ : বাংলায় বিপ্লববাদ, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ: ৩২৮

৪৫. H. W Hale : Terrorism in India—1917-1936, p 75

৪৬ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ) : জেলে ত্রিশ বছর ও পাকভারত স্বাধীনতা সংগ্রাম : পৃ: ১৭৮ ১৭৯

৪৭. নলিনীকিশোর গুহ : বাংলায় বিপ্লববাদ, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ: ৩২৮

৪৮. B. M. Kaul : The Untold Story : p.

৪৯. H. W. Hale : Terrorism in India—1917-1936, p. 76

৫০. শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখার্জির সাথে সাক্ষাৎকার।

৫১. H. W. Hale : Terrorism in India—1917-1936, p. 77-78

৫২. Ibid, p. 200

৫২ক মনোরঞ্জন গুপ্ত : আমার সংক্ষিপ্ত জীবন কথা, পৃ: ৪৩

৫৩. যথাপূর্ব

৫৪. H. W. Hale : Terrorism in India—1917-1936, p. 35

৫৫ Ibid. p. 37

৫৬. মনোরঞ্জন গুপ্ত : আমার সংক্ষিপ্ত জীবন কথা, পৃ: ৪৬

৫৭. H. W. Hale : Terrorism in India—1917-1936 : p. 53

৫৮ Ibid, p 109

৫৯, Ibid, p 112-113

৬০. Sedition Committee Report, para 171 (C)

৬১. Ibid, para 155

৬২. নলিনীকিশোর গুহ : বাংলায় বিপ্লববাদ, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ: ২৮১

বর্ণানুক্রমিক নামসূচী

ধ

ন

ব

য

র

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	ছাপা হয়েছে	পড়তে হবে
৪	১৮	মিস্টার ও মিসেস কেনেডি	মিসেস ও মিস কেনেডি
৫	২২	বামোদা	বাসিন্দা
৭	১৩	কার্ড´সন	ফার্গু´সন
২৩	১৪	কারখানায়	কারখানায় প্রস্তুত
৩৭	৫	গৌহাটি কাইট	গৌহাটি ফাইট
ঐ	ঐ	কলতাবাজার কাইট	কলতাবাজার ফাইট
ঐ	৯	গৌহাটি কাইট	গৌহাটি ফাইট
৩৮	৭	কলতাবাজার কাইটে	কলতাবাজার ফাইটে
৪৩	২১	না তা	না হলে তা
৪৪	৩	সাক্ষ্যের দ্বারা হোক	সাক্ষ্যের দ্বারা সমর্থিত হোক
৫২	৯	উচ্চ ও মধ্যবিত্ত	উচ্চ-মধ্যবিত্ত
৫৩	৯	বিস্ময়বিমুক্ত	বিস্ময়বিমুগ্ধ
ঐ	১১	গড়ে তুলবার।	গড়ে তুলবার,
৬১	৩	প্রত্যাখ্যাত	প্রত্যাঘাত
৬২	২২	কারাদণ্ড	কারাদণ্ড মকুবের
৬৪	১	১৯১৯ এর	১৯১৫র
৬৭	২৫	সিঙ্গাপুর কোর্টজেলে	সিঙ্গাপুর ফোর্ট জেলে
৬৭	১৩	হোমিওপ্যাথি	হোমিওপ্যাথ্
৭২	১২	কাইটের	ফাইটের
৭৩	১৮	গ্রহণ এবং	গ্রহণ করেন এবং
৭৭	৯	limited states	united states
৭৮	৬	রবীন্দ্র কর	গোবিন্দ কর
ঐ	২১	বীরপুরীতে	বীচপুরীতে

পৃষ্ঠা	লাইন	ছাপা হয়েছে	পড়তে হবে
৮১	২৫	প্রবর্তন তাদের	প্রবর্তন করে তাদের
৯২	৮	ঘটনাগুলীর উল্লেখ	ঘটনাবলীর মধ্যে উল্লেখ
১০৭	১০	কমিশন	কর্মীগণ
১১১	১৫	চলুন সিং	চন্নন সিং
১১২	৪	পরাম শ কলকাতায়	পরামর্শে ভগৎ সিং কলকাতায়
১৩২	৯	সোসাল ট্রাইব্যুনাল	স্পেসাল ট্রাইব্যুনাল
১৫২	১	নির্দিষ্ট দিনে সবুজ	নির্দিষ্ট দিনে পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত ও ক্ষীরোদ দত্ত সবুজ
১৫৮	১২	জবাব দেন।	জবাব দেন না।
১৬১	৭	জেলে যাবে	জেনে যাবে
ঐ	ঐ	পালিয়েছে এই ভেবে।	পালিয়েছে।
১৬৮	১৬	সন্তোষ চক্রবর্তী	সন্তোষ চ্যাটার্জি
১৬৯	১৬	got	yet
১৭০	৬	boards	bounds
১৮০	২৩	না উক্ত বন্দী	উক্ত বন্দী
১৮৪	১৫	রক্ষণাবেক্ষণের	রক্তমোক্ষণের
১৯২	১৩	সুরথনাথ	সুরথনাথ
ঐ	১৫	ঐ	ঐ
ঐ	২২	ঐ	ঐ
১৯৪	১৩	যুবক সঙ	যুবক সংঘ
১৯৫	১০	H. R. A	H. S. R. A